বাংলা

দ্বিতীয় পত্র

কোর্স কোড : SSC 2601

সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম

(এস এস সি প্রোগ্রাম)

ওপেন স্কুল

h¡wm¡-cn E¾j š² ¢hn¢hcÉ¡mu

বাংলা

দ্বিতীয় পত্র

কোর্স কোড : SSC 2601

সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম
(এস এস সি প্রোগ্রাম)

ওপেন স্কুল

h¡wm¡-cn E¾j š² ¢hn¢hcÉ¡mu

বাংলা

দ্বিতীয় পত্র

কোর্স কোড : SSC 2601

সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম
(এস এস সি প্রোগ্রাম)

রচনা
আহমদ কবির
মোহাম্মদ আনসারুজ্জামান
ড. দিলারা হাফিজ
ফজলি সুলতানা
জাফর তালুকদার

সম্পাদনা ও রচনাশৈলী নির্দেশনা
মোহাম্মদ আনসারুজ্জামান

কোর্স সমন্বয়কারী
মোঃ চেঙ্গীশ খান
মেহেরীন মুনজারীন রত্না

ওপেন স্কুল

h¡wm¡-cn E¾j š² ¢hn¢hcÉ¡mu

বাংলা দ্বিতীয় পত্র

কোর্স কোড : SSC 2601

সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম

(এসএসসি প্রোগ্রাম)

রচনা

আহমদ কবির

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মোহাম্মদ আনসারুজ্জামান

অধ্যাপক (অবসরপ্রাপ্ত), ওপেন স্কুল, বাউবি

ড. দিলারা হাফিজ

অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ, মিরপুর সরকারী বাঙলা কলেজ

ফজলি সুলতানা

অধ্যাপক (অবসরপ্রাপ্ত), বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

জাফর তালুকদার

সম্পাদনা ও রচনাশৈলী নির্দেশনা

মোহাম্মদ আনসারুজ্জামান

অধ্যাপক (অবসরপ্রাপ্ত), ওপেন স্কুল, বাউবি

কোর্স সমন্বয়কারী

ড. মোঃ চেঙ্গীশ খান

সহকারী অধ্যাপক, ওপেন স্কুল, বাউবি

মেহেরীন মুনজারীন রত্না

প্রভাষক, ওপেন স্কুল, বাউবি

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

ডীন, ওপেন স্কুল, বাউবি

ওপেন স্কুল

h¡wm¡-cn E¾j š² ¢hn¢hcÉ¡mu

বাংলা

দ্বিতীয় পত্র

কোর্স কোড : SSC 2601

এস এস সি প্রোগ্রাম

প্রকাশ কাল : ২০০১

পুনর্মুদ্রণ : ২০০২, ২০০৩, ২০০৪, ২০০৫, ২০০৬, ২০০৭, ২০০৮, ২০০৯, ২০১০

পুনর্মুদ্রণ : ২০১১

প্রচ্ছদ

কাজী সাইফুদ্দীন আব্বাস

প্রচ্ছদ গ্রাফিক্স

আব্দুল মালেক

কম্পিউটার কম্পোজ

মোঃ মামুন মিঞা

Ó বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ISBN 984-34-3106-6

প্রকাশনায়

প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিতরণ বিভাগ

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

গাজীপুর - ১৭০৫

মুদ্রণ

মৌসুমী অফসেট প্রেস

৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভাষা	১
বাংলা ব্যাকরণ	৮
ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান	১০
সন্ধি	১৪
দ্বিরুক্ত শব্দ	৩০
বচন	৩৮
পদাশ্রিত নির্দেশক	৪৫
সমাস	৪৮
উপসর্গ	৭২
ধাতু	৮৪
প্রত্যয়	৮৯
শব্দের শ্রেণীবিভাগ	১০১
পদ-প্রকরণ	১০৪
বাক্য প্রকরণ	১২৭
বাগধারার ব্যবহার	১৩১
বাক্য সংক্ষেপণ	১৩৫
বিরাম চিহ্ন	১৩৮
ভাব-সম্প্রসারণ ও সারাংশ	১৪৭
পত্র লিখন	১৫৩
প্রবন্ধ রচনা	১৬৬
অনুবাদ	১৭৬

ভাষা

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

* ভাষার সংজ্ঞা লিখতে পারবেন।
* ভাষার বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত করতে পারবেন।
* ভাষার রূপ-বৈচিত্র্যের বর্ণনা দিতে পারবেন।

ভূমিকা

একটা গল্প বলি। সেদিন দুপুরে আমি একটা বই পড়ার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু কিছুতেই মনসংযোগ করতে পারছি না। কারণ আমার ঘরে একদল ছেলে-মেয়ে হৈচৈ করছিল আর দুষ্টুমি করছিল। এরা অনেক দিন পরে একত্র হয়েছে বলে দুষ্টুমি, মারামারি, কান্নাকাটি সবই একসঙ্গে ও জোরেশোরে চলছিল। এরা মানে, রুমি, সুমি, অমি, এষা, অরূপ, কল্লোল, মিতু। এই দুপুরে আমার ঘরটাকেই তারা দখল করে নিয়েছে বলা যায়। এমন সময় জানালার কাছ থেকে সুমি চেঁচিয়ে উঠল, "হাতি, হাতি, হাতি"! মুহূর্তের মধ্যে কাণ্ড ঘটে গেল। সবাই হুড়মুড় করে জানালার কাছে এসে চেঁচাতে লাগল "হাতি, হাতি, হাতি"! তারপরে সবাই একছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। আমি বুঝলাম, ওরা রাস্তায় সবাই চলে গেল হাতি দেখতে।

ঘটনাটি খুবই ছোঁট। কিন্তু লক্ষ্য করুন এর মধ্যে অনেক কিছু বিবেচ্য বিষয় আছে যা আমরা অনেক সময়ই খেয়াল করি না। যেমন- সুমি যখন বলল, "হাতি, হাতি, হাতি" - তখন সবাই জানালার কাছে ছুটে গেল কেন? আবার রাস্তায়ই ছুটে গেল কেন? এগুলোর সহজ উত্তর - হাতি দেখতে। সেই বিরাট জন্তুটা, যার লম্বা একটা শুড় আছে, কুঁতকুঁতে দুটো চোখ, থামের মত চারটে পা, সেই হাতিকে দেখে কে না মজা পায়! কিন্তু 'হাতি' শব্দটি উচ্চরণ করতেই সবাই বুঝল কি করে, ঐ বিরাট জন্তুটির কথা বলা হচ্ছে! বুঝতে পেরেছি এ জন্য যে শব্দটি উচ্চারণ করা হল, তার অর্থ আমাদের জানা আছে এবং তার একটি চিত্র ও আমাদের মনে গাঁথা আছে। তাই 'হাতি' বলতেই দুষ্টুর দল বুঝতে পেরেছে। যদি এমন হতো 'হাতি' শব্দটি আমাদের জানা নেই - তাহলে এমন ঘটনাটি ঘটত না। ধরা যাক, যদি ফরাসি ভাষায় হাতিকে বোঝাতে যে শব্দ বা ধ্বনি ব্যবহার হয়, সেটি উচ্চারণ করলে আমরা যারা ফরাসি ভাষা জানিনা তাদের ঐ শব্দটি শুনলেও কোন চাঞ্চল্য দেখা যেত না বা বোধে কোন প্রতিচ্ছবি ধরা পড়ত না। তাহলে এখানে একটি জিনিস বোঝা যাচ্ছে যে শব্দ বা ধ্বনি তা যদি হয় অর্থসম্পন্ন ও তা যদি আমাদের জানা থাকে তবেই আমি যা বলছি অর্থাৎ আমার ভাবনাকে অন্যের কাছে পৌঁছে দিতে পারি। এখানে সুমি 'হাতি' শব্দটি উচ্চারণ করে তার মনের আনন্দ ও উৎসাহকে অন্যদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। অন্যের কাছে মনের ভাব ও ভাবনাকে পৌঁছে দেওয়ার কাজটি ভাষার।

আপনারা লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়ই আমরা ধ্বনি উচ্চারণ করি কণ্ঠ দিয়ে। কণ্ঠধ্বনি সৃষ্টি করতে লাগে মুখগহ্বর, কণ্ঠ, জিহ্বা, তালু, দাঁত, ওষ্ঠ, নাক ইত্যাদি। এগুলোকে বলে বাক-প্রত্যঙ্গ। ফুসফুস তাড়িত বায়ু যখন বাকযন্ত্রের সাহায্যে বেরিয়ে আসে তখনই ধ্বনি বা আওয়াজের সৃষ্টি হয়। ফুসফুস যেহেতু বায়ু তাড়িত করে এজন্য ফুসফুসও একটি বাক-প্রত্যঙ্গ। তাহলে এখানে যা জানা গেল তা হচ্ছে ধ্বনি বা শব্দ বাক-প্রত্যঙ্গের সাহায্যে উচ্চারণ করে মানুষে-মানুষে ভাবের আদান-প্রদান হয়। এতে মানুষে মানুষে সংযোগ গড়ে ওঠে যা সমাজ তৈরিতে মানুষকে সাহায্য করেছে। সমাজ গঠনের মূল উপাদান তাই ভাষা। মানুষ অন্যভাবেও যেমন- ইশারা, ইঙ্গিত দিয়েও মনের ভাব অন্যকে জানাতে পারে। এগুলো ভাষা নয় এবং এগুলো ভাষার মত কখনও কার্যকর হতে পারে না।

উপরের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এবার আমরা ভাষার একটি সংজ্ঞা তৈরি করতে পারি।

মনের ভাবনাকে অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য মানুষ যখন বাক-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে উচ্চারিত অর্থগ্রাহ্য ধ্বনি সমষ্টি সৃষ্টি করে, তখন তাকে ভাষা বলে।

পৃথিবীর অঞ্চলভেদে নানান ভাষা। সংস্কৃতি, নৃতাত্ত্বিক, ভৌগলিক কারণে ভিন্ন ভিন্ন ভাষার উদ্ভব হয়েছে। প্রাচীনকালে যে ভাষা ছিল আজ হয়তো নেই - অথবা থাকলেও বিবর্তিত রূপে আছে। আধুনিক কালে পৃথিবীর প্রধান ভাষাগুলো হচ্ছে- ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, চীনা, জাপানি, আরবি, ফারসি, হিন্দি, বাংলা ইত্যাদি। পৃথিবীতে প্রায় আড়াই হাজার ভাষা প্রচলিত আছে। বাংলাদেশ, ভারতের পশ্চিম বঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম, উড়িষ্যা, বিহারের কিছু অংশ, মিয়ানমারের আরাকান অঞ্চলের অধিবাসীরা বাংলা ভাষায় কথা বলে। তাছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ থেকে আগত অভিবাসীরা বাংলা ভাষায় কথা বলেন ও বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চা করেন। বর্তমানে সব মিলিয়ে প্রায় পঁচিশ কোটি লোক বাংলা ভাষায় কথা বলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১

ভাষার সংজ্ঞা লিখুন

---।

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓)চিহ্ন দিন।

১। কোনটি বাকযন্ত্র?

ক. হাত　　খ. কান

গ. জিভ　　ঘ. চিবুক

২। কোনটি আধুনিক ভাষা?

ক. সংস্কৃত　　খ. ফরাসি

গ. প্রাকৃত　　ঘ. আলবেনীয়

৩। বর্তমান বিশ্বে কত কোটি লোক বাংলা ভাষায় কথা বলেন?

ক. প্রায় এক কোটি লোক　　খ. প্রায় তের কোটি লোক

গ. প্রায় বিশ কোটি লোক　　ঘ. প্রায় পঁচিশ কোটি লোক

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

উত্তর

১। গ　২। খ　৩। ঘ

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

* আঞ্চলিক, চলিত ও সাধুরীতির পার্থক্য সনাক্ত করতে পারবেন।
* আঞ্চলিক, চলিত ও সাধুরীতির সংজ্ঞা লিখতে পারবেন।

ভূমিকা

আমরা যারা বাংলাদেশের মানুষ, তারা সবাই বাংলা ভাষায় কথা বলি। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। কিন্তু আপনি খেয়াল করেছেন বোধহয়, আমরা সবাই কিন্তু একইরকম ভাষা (বাংলা ভাষা) ব্যবহার করি না। একেক অঞ্চলের মানুষ একেক ভাবে কথা বলেন। পাবনার মানুষ যে ভাবে কথা বলেন, চট্টগ্রামের মানুষ সেভাবে বলেন না। তবে সবগুলোই বাংলা ভাষা। কিন্তু অঞ্চল ভেদে ভাষা আলাদা। অঞ্চলের ভাষাকে বলে আঞ্চলিক ভাষা। আঞ্চলিক ভাষাকে উপভাষাও বলে।

কোন অঞ্চলের সাধারণ মানুষ যে ভাষায় কথা বলেন, তাকে বলা হয় আঞ্চলিক ভাষা বা উপভাষা।

বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের কথ্য ভাষায় প্রচুর অমিল থাকার জন্য ভাবের আদান-প্রদান বা সহজে কথা বলা প্রায় সম্ভব নয়। এ অসুবিধা কাটিয়ে উঠার জন্য শিক্ষিত ও শিষ্ট সমাজ নিজেদের মধ্যে কথোপকথন ও ভাবের আদান-প্রদানের জন্য সবার কাছে গ্রহণযোগ্য একটি ভাষা ব্যবহার করেন। এ ভাষাকে মান ভাষা বলে। কোন উপভাষাকে কেন্দ্র করে মানভাষা গড়ে উঠতে পারে অথবা একাধিক উপভাষাকে কেন্দ্র করেও গড়ে উঠতে পারে।

ভাষার দুটি রূপ : একটি মৌখিক, অন্যটি লিখিত। বাংলা ভাষায় মৌখিক রূপ দুটি- একটি আঞ্চলিক, অন্যটি মৌখিক মান ভাষা বা আদর্শ চলিত ভাষা।

লিখিত বাংলা ভাষার রূপ দুটি। একটি সাধুরীতি ও অন্যটি চলিত মানরীতি বা আদর্শ চলিত রীতি।

সাধু ও চলিত রীতির পার্থক্য

সাধুরীতি

ক. বাংলা সাধু গদ্যরীতির কাঠামো নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত।

খ. এ রীতির গাম্ভীর্য ও আভিজাত্য আছে।

গ. সংস্কৃত শব্দের বহুল প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

ঘ. সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের দীর্ঘায়িত রূপ ব্যবহৃত হয়।

আদর্শ চলিতরীতি

ক. তুলনামূলকভাবে চটুল ও দ্রুত পরিবর্তনশীল।
খ. ভাষা সহজবোধ্য।
গ. কৃত্রিমতাবর্জিত।
ঘ. সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য নেই।
ঙ. সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ

সাধুরীতি

বিশ্বের বিচিত্র সৃষ্টির মধ্যে গ্রন্থাগারও একটি। মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমন্ত শিশুটির মত চুপ করিয়া থাকিত তবে সে নীরব মহাশব্দের সহিত এই পুস্তকাগারের তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে। প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর অগ্নি-ফল অক্ষরের শৃঙ্খলে, কাল চামড়ার কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চলিতরীতি

আঃ কি আমার। হলদে ফুল ভরা বিচুটিলতা মাথার উপরে দুলছে, বাতাস লেগে শুকনো বাবলার পাতা ঝরঝর করে বুকের ওপর ঝরে পড়ছে। দুর্গা-টুনটুনি পাখি একেবারে কানের কাছে কেওড়ার ডালে বসে কুচকুচ করছে। বড় দুঃখ হল সঙ্গে কোন বই আনিনি।

— বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ২

শূন্যস্থান পূরণ করুন

১। সাধুভাষায় সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ ---------- হয়।

২। চলিত ভাষায় সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ ---------- হয়।

৩। কোন অঞ্চলের মানুষ যে ভাষায় কথা বলেন, তাকে ---------- ভাষা বলা হয়।

৪। সাধু ভাষার ---------- ও ---------- আছে।

৫। চলিত ভাষা ---------- ।

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

উত্তর

১। দীর্ঘায়িত ২। সংক্ষিপ্ত ৩। আঞ্চলিক ৪। গাম্ভীর্য, আভিজাত্য ৫। কৃত্রিমতাবর্জিত

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

* বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার সম্পর্কে একটি বর্ণনা লিখতে পারবেন।
* বাংলা ভাষায় কত প্রকার শব্দ ব্যবহার হয়, তা লিখতে পারবেন।
* বাংলা ভাষার শব্দের উৎপত্তি সনাক্ত করতে পারবেন।

বাংলা ভাষার শব্দ

শব্দ ভাষার মৌলিক উপাদান। মনের ভাব প্রকাশের জন্য আমরা শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে ব্যবহার করি। যেমন– আমার একটি কলম আছে। এখানে আমার কলম, একটি - এগুলো সবই শব্দ। শব্দগুলো আসলে একেকটি ভাবের প্রতীক।

সভ্যতা, সাহিত্য, সংস্কৃতি যত বিকশিত হয়, একই সঙ্গে ভাষাও বিকশিত হয়। সভ্যতা ও শিক্ষা-দীক্ষা বিকাশের সঙ্গে নতুন ভাব ও ভাবনা প্রকাশের জন্য নতুন শব্দের প্রয়োজন হয়, বিদেশীদের সংস্পর্শে এলে ভাষায় বৈচিত্র্যপূর্ণ শব্দের সমাবেশ ঘটে। এতে ভাষার সমৃদ্ধি হয়।

মধ্যযুগে মুসলিম শাসনের ফলে বহু তুর্কি, আরবি, ফারসি শব্দ বাংলা ভাষায় চলে এসেছে। এরপরে আসে ইংরেজরা। তাদের শাসনামলে প্রচুর ইংরেজি শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে। এসব বিদেশী শব্দ এখন বাংলা ভাষার নিজস্ব সম্পদ। বাংলা ভাষায় এখন পর্যন্ত যে শব্দভাণ্ডার গড়ে উঠেছে, উৎপত্তি অনুসারে পণ্ডিতেরা সেগুলোকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছেন। ভাগগুলো এরকম—

১. তৎসম শব্দ;

২. অর্ধ তৎসম শব্দ;

৩. তদ্ভব শব্দ;

৪. দেশী শব্দ;

৫. বিদেশী শব্দ;

তৎসম শব্দ

যে সব সংস্কৃত শব্দ অবিকৃতভাবে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয় সেগুলোকে তৎসম শব্দ বলে।

তৎসম একটি পারিভাষিক শব্দ। তৎসম শব্দের অর্থ (তৎ = তার ও সম = সমান) তার সমান অর্থাৎ সংস্কৃতের সমান।

উদাহরণ : চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, মনুষ্য, হস্ত ইত্যাদি।

সংস্কৃত যে সব শব্দ অবিকৃতভাবে বাংলা ভাষায় ব্যবহার হয় সেগুলোকে তৎসম শব্দ বলে।

অর্ধ তৎসম শব্দ

যে সমস্ত তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ লোকমুখে কিছুটা বিকৃত হয়ে বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে সেগুলোকে অর্ধ তৎসম শব্দ বলে। যেমন- মিষ্টি, জোছনা, রাত্তির, ছেরাদ্দ, কুচ্ছিত ইত্যাদি। এগুলো মূল বা সংস্কৃত রূপ হচ্ছে- মিষ্ট, জ্যোৎস্না, রাত্রি, শ্রাদ্ধ, কুৎসিত।

যে সব তৎসম বা সংস্কৃত শব্দকিছুটা বিকৃত হয়ে বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে সেগুলোকে অর্ধ তৎসম শব্দ বলে।

তদ্ভব শব্দ

যে সমস্ত সংস্কৃত শব্দ প্রাকৃত ভাষার মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত হয়ে বাংলা ভাষায় এসেছে সেগুলোকে তদ্ভব শব্দ বলে। যেমন হাত (সংস্কৃত হস্ত>প্রাকৃত হত্থ> বাংলা হাত) কান (সংস্কৃত কর্ণ > প্রাকৃত কন্ন> বাংলা কান), মাথা (সংস্কৃত মস্তক> প্রাকৃত মত্থঅ> বাংলা মাথা) ইত্যাদি।

তদ্ভব একটি পারিভাষিক শব্দ। এর অর্থ তৎ (তা) থেকে ভব (উৎপন্ন) অর্থাৎ সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন।

যে সমস্ত শব্দ সংস্কৃত ভাষা থেকে প্রাকৃত ভাষার মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষায় এসেছে সেগুলোকে তদ্ভব শব্দ বলে।

দেশী শব্দ

প্রাচীনকালে এদেশের অধিবাসী ছিলেন অনার্য, দ্রাবিড়, কোল প্রভৃতি জাতি। তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির কিছু শব্দ বাংলা ভাষায় রক্ষিত হয়েছে। এগুলোকে দেশী শব্দ বলা হয়। অনেক সময় এসব শব্দের মূল নির্ণয় করা যায় না।

দেশী শব্দের উদাহরণ- কুড়ি, পেট, চুলা, কুলা, গজ, টাপর, ডিঙ্গা, ঢেঁকি ইত্যাদি।

যে সব শব্দ অনার্য, কোল, দ্রাবিড় প্রভৃতি ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় এসেছে সেগুলোকে দেশী শব্দ বলে।

বিদেশী শব্দ

বিদেশী ভাষা থেকে যে সব শব্দ বাংলা ভাষায় এসেছে সেগুলোকে বিদেশী শব্দ বলে। রাজনীতি, ধর্ম, সংস্কৃতি, বাণিজ্য প্রভৃতি কারণে বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে বাংলা ভাষায় বহু বিদেশী শব্দের প্রবেশ ঘটেছে।

বিদেশী ভাষা থেকে যে সব শব্দ বাংলা ভাষায় এসেছে সেগুলোকে বিদেশী শব্দ বলে।

বিদেশী শব্দের উদাহরণ :

আরবি – আল্লাহ, ঈমান, ওযু, কোরান, তওবা, কিতাব, মহকুমা, মুনসেফ, আতর, ইমাম, পয়গম্বর, ফেরেশতা, তারিখ, দফতর, দস্তখত, বান্দা, বেগম ইত্যাদি।

ফারসি – খোদা, গুনাহ, অন্দর, আওয়াজ, আইন, আদব, আবহাওয়া, কাগজ, কামান, কিসমিস, কারখানা, খবর, দলিল, দোয়াত ইত্যাদি।

ইংরেজি – টেবিল, চেয়ার, অফিস, কলেজ, ক্রিকেট, ক্যাপ্টেন, ট্রেন, ডাক্তার, পিন, পুলিশ, হাসাপাতাল ইত্যাদি।

পর্তুগিজ – আনারস, আলপিন, গুদাম, চাবি, বালতি, কেদারা, জানালা, পেরেক, আলকাতরা ইত্যাদি।

ফরাসি – কার্তুজ, কুপন, রেস্তোরা, তোয়ালে ইত্যাদি।

ওলন্দাজ –ইস্কাপন, তুরুপ, টেক্কা ইত্যাদি।

চীনা – লিচু, এলাচি, চা, চিনি ইত্যাদি।

জাপানি – হরিকিরি, প্যাগোডা, রিক্সা, সাম্পান ইত্যাদি।

তুর্কি – আলখাল্লা, উজবুক, উর্দি, কাঁচি, কুলী, খাতুন, গালিচা, দারোগা, বিবি ইত্যাদি।

গুজরাটি – খদ্দর, জয়ন্তী, হরতাল ইত্যাদি।

বর্মী – চুঙ্গ, লুঙ্গি, ফুঙ্গি ইত্যাদি।

মহারাষ্ট্র – বর্গী ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৩

১। সত্য হলে স এবং মিথ্যা হলে মি লিখুন

ক. বাংলাভাষার শব্দসম্ভার তিন প্রকার।

খ. তৎসম শব্দের অর্থ অসংস্কৃত শব্দ।

গ. চেয়ার একটি ইংরেজি শব্দ।

ঘ. বেশকিছু আরবি ও ফারসি শব্দ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়।

ঙ. 'কুড়ি' একটি দেশী শব্দ।

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন

ক. যে সব সংস্কৃত শব্দ বাংলা ভাষায় অবিকৃতভাবে ব্যবহৃত হয় সেগুলোকে ------ শব্দ বলে।

খ. সংস্কৃত- হস্ত> প্রাকৃত হত্থ > বাংলা ----------।

গ. বাংলা ভাষার শব্দ ------ প্রকার।

ঘ. বিদেশীদের সংস্পর্শে এলে ভাষায় ----- শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটে।

ঙ. খাতুন একটি ------ শব্দ।

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

১। ক. মি খ. মি গ. স ঘ. স ঙ. স

২। ক. তৎসম খ. হাত গ. পাঁচ ঘ. বিদেশী ঙ. তুর্কি

বাংলা ব্যাকরণ

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

* ব্যাকরণের একটি সংজ্ঞা লিখতে পারবেন।
* বাংলা ভাষার ব্যাকরণের একটি সংজ্ঞা রচনা করতে পারবেন।
* বাংলা ব্যাকরণের বিভাগগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিখতে পারবেন।

ব্যাকরণ শব্দের অর্থ বিশেষভাবে বিশ্লেষণ

শব বা মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করে যেমন মানব দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বৈশিষ্ট্য, পরস্পরের যোগাযোগ ও কার্যপ্রণালী সম্পর্কে বিশেষভাবে জানা যায় তেমনি ভাষার বিশ্লেষণ করে ভাষার নানা উপকরণ, উপাদান, বৈশিষ্ট্য, পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যবহার প্রণালী ইত্যাদি জানা যায়। এজন্য ব্যাকরণের সংজ্ঞা নিম্নরূপভাবে রচনা করা যায়।

যে শাস্ত্রে বা বিদ্যায় ভাষার রূপ, প্রকৃতি ও অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বিশেষভাবে আলোচিত হয় তাই ব্যাকরণ।

বাংলা একটি ভাষা। বাংলা ভাষারও নিজস্ব নিয়ম ও পদ্ধতি আছে। তাই বাংলা ভাষার ব্যাকরণ বলতে আমরা বুঝব–

যে শাস্ত্রে বা বিদ্যায় বাংলা ভাষার রূপ, প্রকৃতি ও অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বিশেষভাবে আলোচিত হয় তাকেই বলে বাংলা ব্যাকরণ।

আমরা ব্যাকরণ পড়ব কেন? এর উত্তরে বলা যায় ভাষার রূপ, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা সম্পর্কে জানা থাকলে ভাষাকে সার্থক, সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করা যায়। এজন্যই আমাদের ব্যাকরণ পড়া ও জানা দরকার। ব্যাকরণে আলোচ্য বিষয় কি? প্রত্যেক ভাষার তিনটি মৌলিক অংশ থাকে। সেগুলো হচ্ছে- ১. ধ্বনি, ২. শব্দ ৩. বাক্য। সব ভাষার মত বাংলা ভাষার ব্যাকরণেও এই তিনটিই প্রধান আলোচ্য বিষয়। এগুলোকে আমরা বলি ১. ধ্বনিতত্ত্ব, ২. শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব ৩. বাক্যতত্ত্ব বা পদক্রম।

ধ্বনিতত্ত্ব

মানুষের বাক-প্রত্যঙ্গ অর্থাৎ মুখহ্বির, জিহ্বা, তালু, দাঁত, ঠোঁট ইত্যাদির সাহায্যে উৎপাদিত অর্থবোধক আওয়াজকে ধ্বনি বলে। ধ্বনির মৌলিক অংশ বা একক (Unit) কে ধ্বনি একক বলে।

বাক-প্রত্যঙ্গ দ্বারা উৎপাদিত ধ্বনি এককের জন্য প্রত্যেক ভাষারই একটি প্রতীক বা চিহ্ন (Symbol) আছে। বাংলায় এ প্রতীক বা চিহ্নকে বলা হয় বর্ণ। যেমন- কলম। এখানে তিনটি ধ্বনি আছে এবং এ তিনটি ধ্বনি প্রকাশ করা হয়েছে যথাক্রম ক, ল, ম প্রতীক বা বর্ণ দিয়ে। ধ্বনির উচ্চারণ প্রণালী, উচ্চারণের স্থান, ধ্বনি প্রতীক বা বর্ণের বিন্যাস, ধ্বনি সংযোগ বা সন্ধিতে ধ্বনির পরিবর্তন, লোপ, ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান ইত্যাদি বাংলা ব্যাকরণের ধ্বনিতত্ত্ব বিভাগের আলোচ্য বিষয়।

রূপতত্ত্ব

শব্দ বাক্যের ক্ষুদ্রতম একক। এক বা একের বেশি ধ্বনি দিয়ে গঠিত হয় শব্দ।

বাক্যে ব্যবহৃত পদ বা শব্দের রূপ, গঠন প্রভৃতি ব্যাকরণের যে অংশে আলোচিত হয় তাকে রূপতত্ত্ব বলে। শব্দ, শব্দের ব্যুৎপত্তি, শব্দের গঠন, বচন, লিঙ্গ, ক্রিয়ামূল বা ধাতুরূপ ইত্যাদি রূপতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়।

বাক্যতত্ত্ব

পদসমূহের সঠিক বিন্যাস হলে একটি বাক্য সৃষ্টি হয়। বাক্যের গঠন প্রণালী, পদের ব্যবহার ও ক্রম এবং বাক্য সম্পর্কিত সকল আলোচনা বাক্যতত্ত্ব শাখার অন্তর্ভুক্ত। বাক্যতত্ত্বকে পদক্রমও বলা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১

১। সত্য হলে স এবং মিথ্যা হলে মি লিখুন।

ক. ব্যাকরণ পাঠের কোন প্রয়োজন নেই।

খ. 'বাক্যতত্ত্ব' অংশে বাক্যের আলোচনা থাকে।

গ. ব্যাকরণ শব্দের অর্থ বিশেষভাবে বিশ্লেষণ।

ঘ. 'হাত' একটি বাক-প্রত্যঙ্গ।

ঙ. ব্যাকরণ পাঠ করে আমরা ভাষার অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলাকে জানতে পারি।

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

১। ক. মি খ. স গ. স ঘ. মি ঙ. স

ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

* ণ-ত্ব বিধান কাকে বলে লিখতে পারবেন।
* ণ-ত্ব বিধানের নিয়মগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান

বাংলা ভাষায় দন্ত্য ন ও মূর্ধন্য ণ-এর উচ্চারণগত কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় এর পার্থক্য ছিল। আমরা জানি বাংলা ভাষায় অবিকৃত বহু সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করা হয়। এ সংস্কৃত শব্দগুলোতে সংস্কৃতের মত দন্ত ন ও মূর্ধন্য-ণ ব্যবহার করা হয়। তৎসম বা সংস্কৃত শব্দে যে নিয়মকে অনুসরণ করে মূর্ধন্য ণ-এর ব্যবহার হয় তাকেই ণ-ত্ব বিধান বলে।

তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ ছাড়া বাংলাভাষার শব্দসম্ভারের অন্য কোন শব্দে মূর্ধন্য ণ লেখার নিয়ম নেই।

তৎসম বা সংস্কৃত শব্দে ণ-এর ব্যবহারের নিয়মকে ণ-ত্ব বিধান বলে।

ণ-ব্যবহারের নিয়ম

১. ট বর্গীয় ধ্বনির আগের দন্ত্য ন সব সময় মূর্ধন্য ণ হয়। যেমন ঘণ্টা, লুণ্ঠন, কাণ্ড ইত্যাদি।

২. ঋ, র, ষ এর পরে মূর্ধন্য ণ-হয়। যেমন- ঋণ, তৃণ, বর্ণ, ভাষণ ইত্যাদি।

৩. ঋ, র, ষ এর পরে স্বরধ্বনি, য, ব, হ এবং ক ও প বর্গীয় ধ্বনি থাকলে পরবর্তী দন্ত্য ন মূর্ধন্য ণ হয়। যেমন- হরিণ (র এর পরে ই তারপরে ণ), অর্পণ (র+প+অ+ণ), লক্ষণ (ক্+ষ্+অ+ণ), কৃপণ (ঋ কারের পরে প্, পরে ণ) ইত্যাদি।

৪. সমাসবদ্ধ শব্দে দুইপদেরই অর্থের প্রাধান্য থাকলে ণ-ত্ব বিধান খাটে না। যেমন- ত্রিনয়ন, সর্বনাম, দুর্নীতি ইত্যাদি।

৫. ত বর্গের আগে কখনও মূর্ধন্য ণ হয় না- দন্তন্য ন হয়। যেমন-অন্ত, গ্রন্থ, ক্রন্দন ইত্যাদি।

৬. কিছু শব্দে সবসময়ই ণ হয়।

যেসব শব্দে সব সময়ই মূর্ধন্য ণ হয়–

মাণিক্য, গণ, বাণিজ্য, লবণ, মণ, বেণু, বীণা, কঙ্কণ, কণিকা, কল্যাণ, শোণিত, মণি, গুণ, পুণ্য, অনূ, বিপণী, ক্ষণিকা, লাবণ্য, বাণী, গৌণ, কোণ, ভাণ, পণ।

৭. কিছু শব্দে সবসময়ই ন দন্ত্য হয় মূর্ধন্য ণ হয় না।

যেসব শব্দে সবসময়ই দন্ত্য ন হয়–

কর্তন, ক্রন্দন, বন্ধন ইত্যাদি।

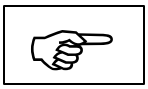

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। 'ণ'-ত্ব বিধান' এর অর্থ কি?

ক. ন ব্যবহারের নিয়ম
খ. ণ ব্যবহারের নিয়ম
গ. সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম
ঘ. ণ-এর অপব্যবহার

২। ণ-ত্ব বিধান কোন শব্দের জন্য প্রযোজ্য?

ক. বাংলা শব্দ
খ. বিদেশী শব্দ
গ. সংস্কৃত শব্দ
ঘ. আরবি শব্দ

৩। ণ-ত্ব বিধান মতে ঋ, র, ষ এর পরে যুক্ত হয়-

ক. ন
খ. ণ
গ. ন অথবা ণ
ঘ. কোন নিয়ম নেই

৪। কোন বর্গের আগে কখনও ণ হয় না?

ক. ট বর্গ
খ. প বর্গ
গ. ব বর্গ
ঘ. ত বর্গ

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

১। খ ২। গ ৩। খ ৪। ঘ

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

* ষ-ত্ব বিধান কাকে বলে লিখতে পারবেন।
* ষ-ত্ব বিধানের নিয়মগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

সংস্কৃত ভাষায় মূর্ধন্য ষ এর ব্যবহার আছে। সেজন্য বাংলা ভাষায় যে সব অবিকৃত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করা হয় সেগুলোতে মূর্ধন্য ষ ব্যবহারের নিয়ম প্রচলিত আছে। যে বিধান বা নিয়ম অনুসারে অবিকৃত সংস্কৃত শব্দে মূর্ধন্য ষ-এর ব্যবহার করা হয় তাকেই ষ-ত্ব বিধান বলে।

বাংলা ভাষায় মূর্ধন্য ষ এর বিশেষ উচ্চারণ নেই। খাঁটি বাংলা শব্দ ও বিদেশী শব্দের বানানে মূর্ধন্য ষ লেখার প্রয়োজন নেই।

সংস্কৃত শব্দে মূর্ধন্য ষ এর ব্যবহারের নিয়মকে ষ-ত্ব বিধান বলে।

খাঁটি বাংলা শব্দ ও বিদেশী শব্দের বানানে মূর্ধন্য ষ লেখার প্রয়োজন নেই।

ষ-ব্যবহারের নিয়ম-

১. অ, আ, ছাড়া অন্য স্বরধ্বনি এবং ক ও র এর পর মূর্ধন্য ষ হয়। যেমন- ভবিষ্যৎ, মুমূর্ষু, বিষয়, সুষমা ইত্যাদি।

২. ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত উপসর্গের পর কতকগুলো ধাতুতে মূর্ধন্য ষ হয়। যেমন- অভি-সেক>অভিষেক, সুপ্ত>সু=সুষুপ্ত, অনু-সঙ্গ>অনুষঙ্গ, প্রতি- সেধক>প্রতিষেধক, অনু-স্থান>অনুষ্ঠান ইত্যাদি।

৩. ঋ-কার ও র এর পর মূর্ধন্য ষ হয়। যেমন- কৃষক, তৃষ্ণা, বর্ষা, উৎকৃষ্ট, বর্ষা, বৃষ্টি, দৃষ্টি, বর্ষণ ইত্যাদি।

৪. ট ও ঠ এর পর মূর্ধন্য ষ হয়। যেমন- কষ্ট, কাষ্ঠ, সুষ্ঠু, নষ্ট ইত্যাদি।

৫. কিছু শব্দে সবসময়ই মূর্ধন্য ষ হয়।

যেসব শব্দে সব সময়ই মূর্ধন্য ষ হয়–

আষাঢ়, ঊষা, ঊষর, আভাষ অভিলাষ, ঈষৎ, ঈর্ষা, কষায়, কোষ, পাষণ্ড, পাষাণ, ভাষা, ভাষণ, মানুষ, সরিষা, ঔষধ, ওষধি, ঘোষনা, পৌষ, কলুষ, শোষণ, ষড়যন্ত্র, সুষম ইত্যাদি।

৬. সংস্কৃত সাৎ প্রত্যয়যুক্ত শব্দে মূর্ধন্য ষ হয় না। যেমন- ধূলিসাৎ, ভূমিসাৎ ইত্যাদি।

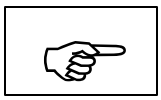

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। ষ-ত্ব বিধান দ্বারা জানা যায়

ক. দেশী শব্দে মূর্ধন্য ষ-এর ব্যবহার
খ. বিদেশী শব্দে মূর্ধন্য ষ-এর ব্যবহার
গ. মূর্ধন্য ষ-এর ব্যবহার
ঘ. সংস্কৃত শব্দে মূর্ধন্য ষ-এর ব্যবহার

২। ঋ ও র এর পর বসে

ক. তালব্য-শ
খ. দন্ত্য-স
গ. মূর্ধন্য-ষ
ঘ. যে কোন স-ধ্বনি

৩। "ষ-ত্ব বিধান" এর অর্থ কি?

ক. মূর্ধন্য ষ ব্যবহারের নিয়ম
খ. বাংলা ব্যাকরণের নিয়ম
গ. অধিকার সম্পর্কিত
ঘ. মূর্ধন্য ষ-এর অনিয়ম

৪। ট ও ঠ এর পরে বসে

ক. তালব্য - শ
খ. দন্ত্য - স
গ. মূর্ধন্য - ষ
ঘ. যে কোন একটি স-ধ্বনি

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

উত্তর

১। ঘ ২। গ ৩। ক ৪। গ

সন্ধি

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

* সন্ধির একটি সংজ্ঞা লিখতে পারবেন।
* সন্ধির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটি ব্যাখ্যা তৈরি করতে পারবেন।

সন্ধি শব্দের অর্থ মিলন। আমরা যখন কথা বলি তখন অনেক সময় পাশাপাশি শব্দের দুটি ধ্বনি অনেক সময় মিলিত হয়ে যায় বা আংশিকভাবে মিলিত হয়। এই মিলনের নামই সন্ধি। যেমন- বিদ্যা+আলয়=বিদ্যালয় বা হিম+আলয় = হিমালয়। প্রথম শব্দটিতে বিদ্যা শব্দের আ ও আলয় শব্দের আ পরস্পর যুক্ত হয়ে একটি আ এ পরিণত হয়েছে ও বিদ্যালয় শব্দটি গঠন করেছে। পরের শব্দটিতে হিম এর অ ও আলয় এর আ যুক্ত হয়ে আর ধ্বনি সৃষ্টি করেছে ও হিমালয় শব্দটি গঠন করেছে।

এখন আমরা বলতে পারি-

পাশাপাশি দুটি শব্দের ধ্বনির মিলনকে সন্ধি বলে।

সন্ধির উদ্দেশ্য দুটি। ক. শব্দের উচ্চারণকে সহজ করা ও খ. শ্রুতিমধুর করা।
যেখানে সন্ধির ফলে ধ্বনিমাধুর্য সৃষ্টি হয় না সেখানে সন্ধি করা বিধেয় নয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. সন্ধির সংজ্ঞা লিখুন।

উত্তর ----------

২. সন্ধির প্রয়োজনীয়তা কি?

উত্তর ----------

৩. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

ক. সন্ধি শব্দের অর্থ কি?

ক. চুক্তি　　খ. ঐক্য
গ. সম্মিলন　　ঘ. মিলন

খ. সন্ধির উদ্দেশ্য কি?

ক. উচ্চারণ দীর্ঘ করা　　খ. উচ্চারণ সহজ করা
গ. উচ্চারণ সহজ ও শ্রুতি মধুর করা　　ঘ. মাধুর্য সৃষ্টি করা

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

উত্তর

ক. ৪　খ. ৩

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

* বাংলা সন্ধি কত প্রকার ও কি কি বর্ণনা করতে পারবেন।
* বাংলা সন্ধির উদাহরণ দিতে পারবেন।

বাংলা শব্দের সন্ধি

বাংলা শব্দের সন্ধি দুরকমের : স্বরসন্ধি ও ব্যঞ্জন সন্ধি

স্বরসন্ধি

স্বরধ্বনির সাথে স্বরধ্বনি মিলিত হয়ে যে সন্ধি হয় তাকে স্বরসন্ধি বলে। যেমন- শতেক

শত+এক = শতেক

অ+এ = এ

এখানে অ লোপ পেয়েছে।

স্বরসন্ধি = স্বরধ্বনি + স্বরধ্বনি

স্বরধ্বনি লোপের কিছু উদাহরণ ঃ

ক. অ+এ = (অ লুপ্ত., শত+এক = শতেক, বার+এক = বারেক, কত+এক = কতেক।
অ+এ = অ (এ লুপ্ত), ভাল+এর = ভালর, বড়+এর = বড়র।

খ. আ+আ = আ (একটি আ লুপ্ত), শাঁখা+আরি = শাঁখারি, রূপা+আলি = রূপালি, সোনা+আলি = সোনালি।

গ. আ+উক= উ (আ লুপ্ত), মিথ্যা+উক = মিথ্যুক, হিংসা+উক = হিংসুক, নিন্দা+উক = নিন্দুক।

ব্যঞ্জন সন্ধি

স্বর ও ব্যঞ্জন অথবা ব্যঞ্জন অথবা স্বর মিলিত হয়ে যে সন্ধি হয় তাকে ব্যঞ্জন সন্ধি বলে।

১. প্রথম ধ্বনি অঘোষএবং পরের ধ্বনি ঘোষ হলে, দুয়ে মিলে ঘোষ ধ্বনির দ্বিত্ব হয়।
যেমন- তত + দিন = তদ্দিন ইত্যাদি।

২. র ধ্বনির পরে অন্য ব্যঞ্জন ধ্বনি থাকলে র্ লুপ্ত হয়ে পরবর্তী ধ্বনির দ্বিত্ব হয়।
যেমন- চার + দিন = চাদ্দিন, চার + শ = চাশ্‌শ, চার + টি = চাট্টি ইত্যাদি।

৩. চ বর্গীয় ধ্বনির আগে যদি ত বর্গীয় ধ্বনি থাকে তাহলে ত বর্গীয় ধ্বনি লোপ হয় এবং চ বর্গীয় ধ্বনির দ্বিত্ব হয়।
যেমন- নাত + জামাই =নাজ্জামাই, বদ + জাত = বজ্জাত ইত্যাদি।

৪. ত্ এর পর 'স' থাকলে উভয়ে মিলে চ্ছ হয়।
যেমন- উৎ + সন্ন = উচ্ছন্ন, বৎ + সর = বচ্ছর, কুৎ + সিত = কুচ্ছিত ইত্যাদি।

৫। চ ও ত এর পরে 'শ' থাকলে চ ও ত এর স্থলে শ হয়।

যেমন- পাঁচ + শ = পাঁশশ, সাত + শ = সাশশ ইত্যাদি।

৬। হসন্ত ধ্বনির সাথে স্বরধ্বনি যুক্ত হলে স্বরের লোপ হয় না।

যেমন- বোন +আই = বোনাই, চুন + আরি = চুনারি, তিল + এক = তিলেক, বার + এক = বারেক, ঘাট + এর = ঘাটের ইত্যাদি।

৭। প্রথমে স্বরধ্বনি পরে ব্যঞ্জন ধ্বনি থাকলে সন্ধির সময় স্বরধ্বনিটির লোপ হয়।

যেমন- কাঁচা + কলা = কাঁচকলা, ঘোড়া + দৌড় = ঘোড়দৌড়, নাতি + বৌ = নাতবৌ ইত্যাদি।

খাঁটি বাংলা শব্দে বিসর্গের ব্যবহার না থাকায় খাঁটি বাংলায় বিসর্গ সন্ধি নেই।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। বাংলা শব্দের সন্ধি কত প্রকার?

ক. এক প্রকার
খ. দুই প্রকার
গ. চার প্রকার
ঘ. বহু প্রকার

২। স্বরধ্বনি সংগে স্বরধ্বনি মিলিত হলে তাকে কি সন্ধি বলে?

ক. স্বরধ্বনি সন্ধি
খ. স্বরসন্ধি
গ. ব্যঞ্জন সন্ধি
ঘ. মিশ্রসন্ধি

৩। আ এর পর আ থাকলে উভয়ে মিলে কি হয়?

ক. অ
খ. ও
গ. আ
ঘ. ই

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

উত্তর

১। খ ২। খ ৩। গ

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

* তৎসম সন্ধি কত প্রকার বলতে পারবেন।
* তৎসম স্বরসন্ধির নিয়মগুলো উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সংস্কৃত শব্দের সন্ধি

বাংলা ভাষায় বহু সংস্কৃত শব্দ অবিকৃতভাবে ব্যবহার করা হয়। এসব শব্দের সন্ধি সংস্কৃত ভাষার নিয়মেই হয়ে থাকে।

সংস্কৃত সন্ধি তিন প্রকার

যথা- স্বরসন্ধি, ব্যঞ্জন সন্ধি ও বিসর্গ সন্ধি।

স্বরসন্ধি

স্বরধ্বনির সংগে স্বরধ্বনির মিলনের নাম স্বর সন্ধি।

১. অ-কার কিংবা আ-কারের পর অ-কার কিংবা আ-কার থাকলে উভয়ে মিলে আকার হয়। আ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন-

অ + অ = আ

নর + অধম = নরাধম, হিম + অচল = হিমাচল, হিত + অহিত = হিতাহিত, প্রাণ + অধিক = প্রাণাধিক ইত্যাদি।

অ + আ = আ

হিম + আল = হিমালয়, দেব + আলয় = দেবালয়, সিংহ + আসন = সিংহাসন ইত্যাদি।

আ + অ = আ

যথা + অর্থ = যথার্থ, আশা + অতীত = আশাতীত, মহা + অর্ঘ = মহার্ঘ ইত্যাদি।

আ + আ = আ

বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয়, কারা + আগার = কারাগার, মহা + আশয় = মহাশয় ইত্যাদি।

২. অ-কার কিংবা আ-কারের পর ই-কার কিংবা ঈ-কার থাকলে উভয়ে মিলে এ-কার হয়। এ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন -

অ + ই = এ

শুভ + ইচ্ছা = শুভেচ্ছা, স্ব + ইচ্ছা = স্বেচ্ছা

আ + ই = এ

যথা + ইচ্ছা= যথেচ্ছা

অ +ঈ = এ

পরম + ঈশ = পরমেশ

আ + ঈ = এ

মহা + ঈশ = মহেশ

৩. অ-কার কিংবা আ-কারের পর উ-কার কিংবা ঊ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ও-কার হয়। ও-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত হয়।

অ + উ = ও

সূর্য + উদয় = সূর্যোদয়, নীল + উৎপল = নীলোৎপল

আ + উ = ও

যথা + উচিত = যথোচিত, মহা + উৎসব = মহোৎসব

অ + ঊ = ও

গৃহ + ঊর্ধ্ব = গৃহোর্ধ্ব, গঙ্গা + ঊর্মি = গঙ্গোর্মি

৪. অ-কার কিংবা আ-কারের পর ঋ-কার থাকলে উভয়ে মিলে অর্ হয় এবং অর্ রেফ (´) রূপে পরবর্তী বর্ণে যুক্ত হয়।

অ + ঋ = অর্

সপ্ত = ঋষি = সপ্তর্ষি

আ + ঋ = অর

মহা + ঋষি = মহর্ষি

৫. অ-কার কিংবা আ-কারের পরঋ-কার থাকলে উভয়ে মিলে আর হয় এবং আর রেফ (´) রূপে পরবর্তী বর্ণে যুক্ত হয়।

অ + ঋ = আর

শীত + ঋত = শীতার্ত, ভয় + ঋত = ভয়ার্ত

আ + ঋ = আর

তৃষ্ণা +ঋত = তৃষ্ণার্ত, ক্ষুধা + ঋত = ক্ষুধার্ত

৬. অ-কর কিংবা আ-কারের পর এ-কার কিংবা ঐ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঐ-কার হয়।

অ + এ = ঐ

জন + এক = জনৈক

অ + ঐ = ঐ

মত+ ঐক্য = মতৈক্য

আ + ঐ = ঐ

মহা + ঐশ্বর্য = মহৈশ্বর্য

৭. অ-কার কিংবা আ-কারের পর ও-কার কিংবা ঔ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঔ-কার হয়। ঔ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে যুক্ত হয়।

অ + ও = ঔ

বন + ওষধি=বনৌষধি

আ + ও = ঔ

মহা + ওষধি = মহৌষদি

অ + ঔ = ঔ

পরম+ ঔষধ = পরমৌষধ

আ + ঔ = ঔ

মহা + ঔষধ = মহৌষধ

৮. ই-কার কিংবা ঈ-কারের পর ই-কার কিংবা ঈ-কার থাকলে উভয়ে মিলে দীর্ঘ ঈ-কার হয়। দীর্ঘ ঈ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়।

ই + ই = ঈ

অতি + ইত = অতীত, অতি +ইব = অতীব

ই + ঈ = ঈ

পরি+ ঈক্ষা = পরীক্ষা

ঈ + ই = ঈ

সতী + ইন্দ্র = সতীন্দ্র

ঈ + ঈ = ঈ

সতী + ঈশ =সতীশ

৯. ই-কার কিংবা দীর্ঘ ঈ-কারের পর ই ও ঈ ছাড়া অন্য স্বর থাকলে ই বা ঈ-'য' হয়। য-ফলা পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়।

ঈ + অ = য্ + অ

অতি + অন্ত = অত্যন্ত, প্রতি + অহ = প্রত্যহ, অতি + অধিক = অত্যধিক

ই + আ = য্ + আ

ইতি+ আদি = ইত্যাদি

প্রতি + আশা = প্রত্যাশা

ই + উ = য্ + উ

অতি + উক্তি = অত্যুক্তি, প্রতি + উপকার = প্রত্যুপকার

ই + ঊ = য্ + ঊ

প্রতি + ঊষ = প্রত্যুষ

ই + এ = য্ + এ

প্রতি + এক = প্রত্যেক

১০. উ-কার কিংবা ঊ-কারের পর উ-কার কিংবা ঊ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঊ কার হয়। ঊ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত হয়।

উ + উ = ঊ

মরু + উদ্যান = মরূদ্যান

উ+ ঊ = ঊ

বহু + ঊর্ধ্ব = বহূর্ধ্ব

১১. উ-কার কিংবা ঊ-কারের পর উ-কার ও ঊ-কার ছাড়া অন্য স্বর থাকলে উ বা ঊ ব্ (ব-ফলা) হয়। লেখার সময় ব-ফলা পূর্ববর্তী বর্ণের সাথে যুক্ত হয়।

উ +অ = ব + অ

সু + অল্প = স্বল্প

উ + আ = ব+ আ

সু + আগত = স্বাগত

উ + ই = ব + ই

অনু + ইত = অন্বিত

উ + ঈ = ব + ঈ

তনু + ঈ = তন্বী

উ + এ = ব + এ

অনু +এষণ = অন্বেষণ

১২. ঋ কারের পর ঋ ছাড়া অন্য কোন স্বরবর্ণ থাকলে ঋ-কার স্থানে র-ফলা হয় এবং পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত হয়।

ঋ + আ =র

পিতৃ + আলয় = পিত্রালয়, মাতৃ + আদেশ = মাত্রাদেশ

১৩. শব্দের মধ্যে এ-কারের পর স্বরবর্ণ থাকলে এ-কারের স্থানে 'অয়' হয় এবং পরের স্বর তাতে যুক্ত হয়।

এ + অ = অয়

নে + অন = নয়ন, বে + অন = বয়ন

এ + অ = আয়

শে + আন = শয়ান

ঐ-কারের পর স্বরবর্ণ থাকলে ঐ-কারের স্থানে 'আয়' হয় এবং তাতে পরের স্বর যুক্ত হয়।

ঐ + অ = আয়

নৈ + অক = নায়ক, গৈ + অক = গায়ক

শব্দের মধ্যে ও-কারের পর স্বরবর্ণ থাকলে ও-কারের স্থানে 'অব' হয় এবং পরের স্বর তাতে যুক্ত হয়।

ও + অ = অব

ভো + অন = ভবন, পো + অন = পবন, লো + অন = লবণ

শব্দের মধ্যে ঔ-কারের পর স্বরবর্ণ থাকলে ঔ-কারের স্থানে 'আর' হয় এবং পরের স্বর তাতে যুক্ত হয়।

ঔ + অ = আব

পৌ + অক = পাবক, নৌ + ইক = নাবিক, ভৌ + উক = ভাবুক

১৪. যে সন্ধিগুলো কোন নিয়ম অনুসারে হয়নি সেগুলোকে নিপাতনে সিদ্ধ বলে।

যেমন-

কুল + অটা =কুলটা, প্র + উঢ় = প্রৌঢ়, মার্ত + অণ্ড = মার্তণ্ড, গো + অক্ষ = গবাক্ষ, অন্য + অন্য = অন্যান্য।

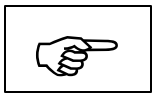

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১. তৎসম সন্ধি কত প্রকার?
ক. পাঁচ প্রকার | খ. চার প্রকার
গ. তিন প্রকার | ঘ. দুই প্রকার

২. ই-কারের সঙ্গে ই-কারের যুক্ত হলে হয়-
ক. ও-কার | খ. ই-কার
গ. ঈ-কার | ঘ. উ-কার

৩. শীতার্ত শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ করলে হয়-
ক. শিত + আর্ত | খ. শীত + ঋত
গ. শীতা + আর্ত | ঘ. শীতল + আর্ত

৪. সন্ধি বিচ্ছেদ করুন :

ক. কথামৃত =	+	খ. মহাশয় =	+
গ. রাজর্ষি =	+	ঘ. ক্ষুধার্ত =	+
ঙ. জনৈক =	+	চ. মহৌষধ =	+
ছ. তন্বী =	+	জ. ভাবুক =	+

৫. সন্ধি করুন

ক. গো + এষণা =		খ. নৌ + ইক =	
গ. অনু + ইত =		ঘ. রবি + ইন্দ্র =	
ঙ. মহা + ঋষি =		চ. যথা + ইচ্ছা =	

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

উত্তর

১. গ　　২. গ　　৩. খ

৪. ক. কথা + অমৃত　খ. মহা + আশয়　গ. রাজা + ঋষি
ঘ. ক্ষুধা + ঋত　ঙ. জন + এক　চ. মহা + ঔষধ
ছ. তনু + ঈ　জ. ভাব + উক

৫. ক. গবেষণা　খ. নাবিক　গ.অন্বিত
গ. অন্বিত　ঘ. রবীন্দ্র　ঘ. মহর্ষি　ঙ. যথেচ্ছা

পাঠ ৪

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

* তৎসম ব্যঞ্জন সন্ধির নিয়মগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।
* ব্যঞ্জন সন্ধির অন্তর্গত তৎসম শব্দগুলোর সন্ধিবিচ্ছেদ ও সন্ধি করতে পারবেন।

ব্যঞ্জন সন্ধি

ব্যঞ্জনে ও স্বরে, স্বরে ও ব্যঞ্জনে, অথবা ব্যঞ্জনে ও ব্যঞ্জনে যে সন্ধি হয় তাকে ব্যঞ্জন সন্ধি বলে।

১. ব্যঞ্জন ধ্বনি+স্বরধ্বনি

২. স্বরধ্বনি+ব্যঞ্জন ধ্বনি

৩. ব্যঞ্জন ধ্বনি+ব্যঞ্জন ধ্বনি

১. ব্যঞ্জন ধ্বনি + স্বরধ্বনি

পরে স্বরবর্ণ থাকলে পূর্বে অবস্থিত অঘোষ বর্ণ 'ক, চ, ট, ৎ, প' যথাক্রমে ঘোষবর্ণ 'গ, জ, ড(ড়), দ, ব' তে পরিণত হয়।

ক + অ = গ

দিক্ + অন্ত = দিগন্ত

চ + অ = জ

ণিচ + অন্ত = ণিজন্ত

ত্ + অ = দ

তৎ + অবধি = তদবধি; কৃৎ + অন্ত = কৃদন্ত

২. স্বরধ্বনি + ব্যঞ্জন ধ্বনি

স্বরধ্বনির পর অঘোষ মহাপ্রাণ তালব্য ব্যঞ্জন ধ্বনি (ছ) থাকলে উক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনিটি চ্ছ হয়।

অ + ছ = অচ্ছ

এক + ছত্র = একচ্ছত্র; মুখ + ছবি = মুখচ্ছবি

আ + ছ = আচ্ছ

কথা + ছলে = কথাচ্ছলে, আ + ছন্ন = আচ্ছন্ন

ই + ছ = ইচ্ছ

পরি + ছদ = পরিচ্ছদ; পরি + ছেদ = পরিচ্ছেদ

৩. ব্যঞ্জন ধ্বনি + ব্যঞ্জন ধ্বনি

অঘোষ অল্পপ্রাণ কিংবা ঘোষ অল্পপ্রাণ দন্ত্য ধ্বনি (ত ও দ)-এর পর অঘোষ অল্পপ্রাণ কিংবা অঘোষ মহাপ্রাণ তালব্য ধ্বনি (চ ও ছ) থাকলে, অঘোষ অল্পপ্রাণ ও ঘোষ অল্পপ্রাণ দন্ত্য ধ্বনি (ত ও দ) স্থানে অঘোষ অল্পপ্রাণ তালব্য ধ্বনি (চ) উচ্চারণ করা হয়।

ত্+ চ = চ্চ

সৎ + চিন্তা = সচ্চিন্তা; শরৎ + চন্দ্র = শরচ্চন্দ্র; সৎ + চরিত্র = সচ্চরিত্র

ত্ + ছ = চ্ছ

উৎ + ছেদ = উচ্ছেদ; উৎ + ছিন্ন = উচ্ছিন্ন

দ্ + ছ = চ্ছ

বিপদ + ছায়া = বিপচ্ছায়া

অঘোষ অল্পপ্রাণ কিংবা ঘোষ মহাপ্রাণ দন্ত্য ধ্বনি (ত ও দ)-এর পর ঘোষ অল্পপ্রাণ ও ঘোষ মহাপ্রাণ তালব্য ধ্বনি (জ, ঝ) থাকলে অঘোষ অল্পপ্রাণ ও ঘোষ অল্পপ্রাণ দন্ত্য ধ্বনি (ত, দ) এর স্থানে ঘোষ অল্পপ্রাণ তালব্য ধ্বনি (জ) যুক্ত হয়।

ত্ + জ = জ্জ

সৎ + জন = সজ্জন; তৎ + জন্য = তজ্জন্য

দ্ + জ = জ্জ

বিপদ + জনক = বিপজ্জনক, বদ + জাত = বজ্জাব

ত + ঝ = জ্ঝ

কুৎ + ঝটিকা = কুজ্ঝাটিকা

অঘোষ অল্পপ্রাণ কিংবা ঘোষ অল্পপ্রাণ দন্ত্য ধ্বনি (ত, দ)-এর পর পশ্চাৎ দন্তমূলীয় অঘোষ শিশ ধ্বনি (শ) থাকলে অঘোষ অল্পপ্রাণ ও ঘোষ অল্পপ্রাণ দন্ত্য ধ্বনি (ত, দ) এর স্থানে অঘোষ অল্পপ্রাণ তালব্য ধ্বনি (চ) এবং পশ্চাৎ দন্তমূলীয় অঘোষ শিশ ধ্বনি (শ)-এর স্থানে অঘোষ মহাপ্রাণ তালব্য ধ্বনি (ছ) উচ্চারিত হয়।

ত্ + শ = চ্ + ছ = চ্ছ

উৎ + শ্বাস = উচ্ছ্বাস; চলৎ + শক্তি = চলচ্ছক্তি; উৎ + শৃঙ্খল = উচ্ছৃঙ্খল

দ্ + শ = চ্ + ছ = চ্ছ

আপদ + শান্তি = আপচ্ছান্তি

অঘোষ অল্পপ্রাণ কিংবা ঘোষ অল্পপ্রাণ দন্ত্য ধ্বনি (ত, দ)-এর পর ঘোষ অল্পপ্রাণ মূর্ধন্য ব্যঞ্জন (ড়) থাকলে অঘোষ অল্পপ্রাণ কিংবা ঘোষ অল্পপ্রাণ দন্ত্য ধ্বনি (ত, দ) স্থানে ঘোষ অল্পপ্রাণ মূর্ধন্য ধ্বনি হয়।

ত্ + ড = ড্ড

উৎ + ডীন = উড্ডীন

অঘোষ অল্পপ্রাণ কিংবা ঘোষ অল্পপ্রাণ দন্ত্য ধ্বনি (ত, দ)-এর পর ঘোষ কণ্ঠ উষ্ম ধ্বনি (হ) থাকলে অঘোষ অল্পপ্রাণ ও ঘোষ অল্পপ্রাণ দন্ত্য ধ্বনি (ত, দ)-এর স্থানে ঘোষ অল্পপ্রাণ দন্ত্যধ্বনি (দ) এবং ঘোষ কণ্ঠ উষ্ম ধ্বনি (হ) এর স্থানে ঘোষ মহাপ্রাণ দন্ত্য ধ্বনি (ধ) হয়।

ত্ +হ = দ্ + ধ = দ্ধ

উৎ + হার = উদ্ধার; উৎ + হত = উদ্ধত

দ্ + হ = দ্ + ধ = দ্ধ

পদ + হতি = পদ্ধতি; তদ + হিত = তদ্ধিত

অঘোষ অল্পপ্রাণ কিংবা ঘোষ অল্পপ্রাণ দন্ত ধ্বনি (ত, দ)-এর পর ঘোষ পার্শ্বিক ধ্বনি (ল) থাকলে অঘোষ অল্পপ্রাণ এবং ঘোষ অল্পপ্রাণ দন্ত্য ধ্বনি (ত, দ)-এর স্থানে ঘোষ পার্শ্বিক ধ্বনি (ল) উচ্চারিত হয়।

ত্ + ল = ল্ল

উৎ + লাস = উল্লাস; উৎ + লেখ = উল্লেখ

ব্যঞ্জন ধ্বনিসমূহের যে কোন বর্গের অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনির পর যে কোন বর্গের ঘোষ অল্পপ্রাণ ও ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি কিংবা ঘোষ অল্পপ্রাণ তালব্য ধ্বনি (য>জ), ঘোষ অল্পপ্রাণ ওষ্ঠাধ্বনি (র) ঘোষ কম্পনজাত দন্ত্যমূলীয় ধ্বনি (র) কিংবা ঘোষ অল্পপ্রাণ ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন ধ্বনি (ব) থাকলে প্রথম অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি ঘোষ অল্পপ্রাণ উচ্চারিত হয়।

ক্ + দ্ = গ্ + দ

বাক্ + দান = বাগদান; দিক্ + বিজয় = দিগ্বিজয়

ট্ + য = ড্ + য

ষট + যন্ত্র = ষড়যন্ত্র

ত + ঘ = দ্ + ঘ

উৎ + ঘাটন = উদঘাট

ত্ + য = দ্ + য

উৎ + যোগ = উদ্যোগ

ত্ + ব = দ + ব

উৎ + বন্ধন = উদ্বন্ধন

ত্ + ব = দ + র

তৎ + রূপ = তদ্রূপ

বর্গীয় নাসিক্য ধ্বনি অর্থাৎ কণ্ঠ্য ,তালব্য, মূর্ধন্য, দন্ত্য ও ওষ্ঠ নাসিক্য ধ্বনি (ঙ, ঞ, ণ, ন, ম) পরে থাকলে পূর্ববর্তী অঘোষ অল্পপ্রাণ স্পর্শ ব্যঞ্জন ধ্বনি একই বর্গীয় ঘোষ স্পর্শ ধ্বনি কিংবা নাসিক্য ধ্বনি হয়।

ক্ + ন = গ/ঙ + ন

দিক্ + নির্ণয় = দিগনির্ণয় বা দিঙনির্ণয়

ত্ + ম = দ/ন + য

তৎ + মধ্যে = তদমধ্যে বা তন্মধ্যে

বর্গীয় ওষ্ঠ্য নাসিক্য ধ্বনি (ম)-এর পর যে কোন বর্গীয় ধ্বনি থাকলে, ওষ্ঠ্য নাসিক্য ম ধ্বনিটি একই বর্গের নাসিক্য ধ্বনি হয়।

ম + ক = ঙ + ক

শম + কা = শঙ্কা

ম + চ = ঞ + চ

সম + চয় = সঞ্চয়

ন্ + ত = ন + ত

সম + তাপ = সন্তাপ

আধুনিক বাংলায় ওষ্ঠ্য নাসিক্য ধ্বনি (ম) স্থানে প্রায়ই ওষ্ঠ্য নাসিক্য ঙ না হয়ে অনুস্বার (ং) হয়।

সম + গত = সংগত, অহম + কার = অহংকার, সম + ঘ = সংঘ, সম + খ্যা = সংখ্যা, সম + গতি = সংগীত, সম + ঘাত = সংঘাত।

বর্গীয় ওষ্ঠ্য নাসিক্য ধ্বনি (ম)-এর পর অন্তঃস্থ ধ্বনি (য, র, ল, ব) কিংবা উষ্ম ধ্বনি (শ, ষ, স, হ) থাকলে ওষ্ঠ্য নাসিক্যধ্বনি (ম) স্থানে অনুস্বার (ং) হয়।

সম + যম = সংযম, সম + রক্ষণ = সংরক্ষণ, সম + লাপ = সংলাপ, সম + শয় = সংশয়, সম + সার = সংসার, সম + যোগ = সংযোগ, সম + বাদ = সংবাদ, সম্ + হার = সংহার, বারম + বার = বারংবার, কিম + বা = কিংবা, সম +বরন = সংবরণ।

অঘোষ অল্পপ্রাণ ও ঘোষ অল্পপ্রাণ তালব্য ধ্বনি (চ, জ)-এর পরে নাসিক্য ধ্বনি তালব্য হয়।

চ + ন = চ + ঞ

যাচ্ + না = যাঞ্চা

জ + ন = জ + ঞ

যজ + ন = যজ্ঞ; রাজ + নী = রাজ্ঞী

ঘোষ অল্পপ্রাণ ও ঘোষ মহাপ্রাণ দন্ত্য ধ্বনি (দ, ধ)-এর পরে অঘোষ অল্পপ্রাণ ও অঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি (ক, চ, ট, ত, প, খ, ছ, ঠ, থ, ফ) থাকলে ঘোষ অল্পপ্রাণ ও ঘোষ মহাপ্রাণ দন্ত্য ধ্বনি (দ, ধ)-এর স্থানে অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি হয়।

দ + ত = ত + ত

তদ্ + কাল= তৎকাল

ঘোষ অল্পপ্রাণ ও ঘোষ মহাপ্রাণ দন্ত্য ধ্বনি (দ, ধ)-এর পরে অঘোষ দন্ত্য শিশ ধ্বনি (স) থাকলে অল্পপ্রাণ ও ঘোষ মহাপ্রাণ দন্ত্য ধ্বনির (দ্, ধ) স্থানে অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি উচ্চারিত হয়।

বিপদ + সংকুল = বিপৎসংকুল; তদ + সম = তৎসম

মূর্ধন্য শিশ ধ্বনি (ষ) এর পরে অঘোষ অল্পপ্রাণ ও অঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি (ত, থ) থাকলে, সেখানে যথাক্রমে ট ও ঠ হয়।

কৃষ + তি = কৃষ্টি, ষষ + থ = ষষ্ঠ

বিশেষ নিয়মে সাধিত কিছু সন্ধির উদাহরণ

উৎ+ স্থান = উত্থান, সম + কৃত = সংস্কৃত, সম + কার = সংস্কার, পরি + কার = পরিষ্কার

নিপাতনে সিদ্ধ কিছু সন্ধির উদাহরণ

আ + চর্য = আশ্চর্য, বন + পতি = বনস্পতি, তৎ + কর = তস্কর, মনস + ইষা = মনীষা, দিব + লোক = দ্যুলোক,

গো + পদ = গোষ্পদ, বৃহ+ পতি = বৃহস্পতি, পর + পর = পরস্পর, ষট + দশ = ষোড়শ, এক + দশ = একাদশ।

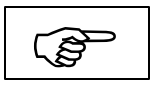

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৪

১. সন্ধি করুন ঃ

ক) বাক + ঈশ		খ) বাক্ + আড়ম্বর	
গ. সৎ + উপায়		ঘ. উৎ +হত	
ঙ. তরু + ছায়া		চ. পদ্ + হতি	
ছ. সৎ + জন		জ. উৎ + লাস	

২. সন্ধি বিচ্ছেদ করুন

ক. উদ্যোগ=	+	খ.দিগ্বিজয় =	+
গ. সঞ্চয় =	+	ঘ. শঙ্কা	+
ঙ. সংবাদ =	+	চ. কিংবা =	+
ছ. সম্রাট =	+	জ. রাজ্ঞী =	+
ঝ. তৎপর =	+	ঞ. সংস্কার =	+
ট. আশ্চর্য =	+	ঠ. ষোড়শ =	+

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

উত্তর

১. ক. বাগীশ খ. বাগাড়ম্বর, গ. সদুপা ঘ. উদ্ধত
ঙ. তরুচ্ছায়া চ. পদ্ধতি ছ. সজ্জন জ. উল্লাস

২. ক. উৎ + যোগ খ. দিক্ + বিজয় গ. সম + চয় ঘ. শম্ + কা ঙ. সম্ + বাদ
চ. কিম + বা ছ. সম + রাট জ. রাজ + নী ঝ. তদ + পর ঞ. সম + কার
ট. আ + চর্য ঠ. ষট + দশ

পাঠ ৫

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

* তৎসম বিসর্গ সন্ধির নিয়মগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।
* বিসর্গ সন্ধির অন্তর্গত তৎসম শব্দগুলোর সন্ধিবিচ্ছেদ ও সন্ধি করতে পারবেন।

বিসর্গ সন্ধি

পদের শেষ র্ ও স্ অনেক সময় অঘোষ উষ্ম ধ্বনি অর্থাৎ অঘোষ হ ধ্বনি হিসেবে উচ্চারণ করা হয় এবং লেখার সময় বিসর্গ (ঃ) লেখা হয়। প্রকৃতপক্ষে বিসর্গ র ও স এর সংক্ষিপ্ত রূপ। র, স এবং : ব্যঞ্জন বর্ণমালার অন্তর্গত। তাই বিসর্গ : সন্ধিকে ব্যঞ্জন সন্ধির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বিসর্গ সন্ধি দু-প্রকার :

১. র্-জাত বিসর্গ সন্ধি ২. স-জাত বিসর্গ সন্ধি

র - জাত বিসর্গ

র্ স্থানে যে বিসর্গ হয় তাকে র-জাত বিসর্গ বলে। যেমন- অন্তর → অন্তঃ, প্রাতর → প্রাতঃ, পুনর → পুনঃ

স-জাত বিসর্গ

স্ স্থানে যে বিসর্গ তয় তাকে স-জাত বিসর্গ বলে। যেমন- নমস→ নমঃ, পুরস→ পুরঃ, শিরস→ শিরঃ

বিসর্গ অর্থাৎ র্ ও স্-এর সাথে স্বরধ্বনি কিংবা ব্যঞ্জনধ্বনির যে সন্ধি হয় তাকে বিসর্গ সন্ধি বলে। বিসর্গ সন্ধি বিসর্গ ও স্বর এবং বিসর্গ ও ব্যঞ্জন - এ দুভাবে সাধিত হয়।

বিসর্গ সন্ধি : ১. বিসর্গ + স্বর; ২. বিসর্গ + ব্যঞ্জন

বিসর্গ ও স্বরের সন্ধি

১. অ-ধ্বনির পরে যদি বিসর্গ থাকে এবং পরে আবার অ-ধ্বনি থাকে তবে অ + র + অ - এ তিনে মিলে ও-কার হয়। যেমন- ততঃ + অধিক = ততোধিক; মনঃ + অভিলাষ = মনোভিলাষ।

কোন কোন ক্ষেত্রে ও-কারের পরে একটি 'হ' উচ্চারিত হয়। যেমন- মনঃ + অভিলাষ = মনোভিলাষ বা মনোহভিলাষ; ততঃ + অধিক = ততোধিক বা ততোহধিক।

বিসর্গ ও ব্যঞ্জনের সন্ধি

১. অ-কারের স-জাত বিসর্গ ও তারপর ঘোষ অল্পপ্রাণ ও ঘোষ মহাপ্রাণ ব্যঞ্জন ধ্বনি, নাসিক্য ধ্বনি কিংবা অন্তস্থ য, অন্তস্থ ব, র, ল, হ থাকলে অ-কার ও স-জাত বিসর্গ মিলে ও-কার হয়। যেমন-

তিরঃ + ধান = তিরোধান

মনঃ + রমা = মনোরমা

মনঃ + যোগ = মনোযোগ

মনঃ + হর = মনোহর

তপঃ + বন = তপোবন

২. অ-কারের পর র্-জাত বিসর্গের পর উপরিউক্ত ধ্বনিসমূহের কোনটি থাকলে বিসর্গ স্থানে 'র' হয়। যেমন-

অন্তঃ + গত = অন্তর্গত

অন্তঃ + ধান = অন্তর্ধান

পুনঃ+ আয় = পুনরায়

পুনঃ + উক্ত = পুনরুক্ত

৩. অ, আ ছাড়াঅন্য স্বরের পর বিসর্গ থাকলে এবং তার সঙ্গে অ, আ বর্গীয় ঘোষ অল্পপ্রাণ ও ঘোষ মহাপ্রাণ নাসিক্য ধ্বনি কিংবা য, র, ল, হ এর সন্ধি হলে বিসর্গ স্থানে 'র' হয়। যেমন-

নিঃ + আকার = নিরাকার

আশীঃ + বাদ = আশীর্বাদ

দুঃ + যোগ = দুর্যোগ

ব্যতিক্রম

ই ও উ ধ্বনির পরের বিসর্গের সঙ্গে 'র' এর সন্ধি হলে বিসর্গের লোপ হয় এবং বিসর্গের পূর্ববর্তী হ্রস্বস্বর দীর্ঘ হয়। যেমন-

নিঃ + রব = নীরব

নিঃ + রস =নীরস

৪. বিসর্গের পর অঘোষ অল্পপ্রাণ কিংবা মহাপ্রাণ তালব্য ব্যঞ্জনের স্থানে তালব্য শিশ ধ্বনি হয়। অঘোষ অল্পপ্রাণ কিংবা অঘোষ মহাপাণ মূর্ধন্য ব্যঞ্জনের স্থলে মূর্ধন্য শিশ ধ্বনি হয়। অঘোষ অল্পপ্রাণ কিংবা অঘোষ মহাপ্রাণ দন্ত্য ব্যঞ্জনের স্থানে শিশ ধ্বনি হয়। যেমন-

ঃ + চ/ছ = শ

নিঃ + চয় = নিশ্চয়; শিঃ + ছেদ = শিরচ্ছেদ

ঃ + ট/ঠ = ষ

ধনুঃ + টঙ্কার = ধনুষ্টঙ্কার; নিঃ + ঠুর = নিষ্ঠুর

ঃ + ত/থ = স

দুঃ+ তর = দুস্তর; দুঃ + থ = দুস্থ

৫. বিশেষ ক্ষেত্রে সন্ধির নিয়ম নেই। যেমন-

প্রাতঃ + কাল = প্রাঃকাল

মনঃ + কষ্ট = মনঃকষ্ট

শির + পীড়া = শিরঃপীড়া

৬. যুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনি স্ত, স্থ, কিংবা স্প পরে থাকলে পূর্ববর্তী বিসর্গ অবিকৃত থাকে অথবা লোপ পায়। যেমন-

নিঃ + স্তব্ধ = নিঃস্তব্ধ কিংবা নিস্তব্ধ

দুঃ + থ = দুঃস্থ কিংবা দুস্থ

নিঃ + স্পন্দ = নিঃস্পন্দ কিংবা নিস্পন্দ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১. বিসর্গ সন্ধি কত প্রকার?
   ক. এক প্রকার　　খ. চার প্রকার
   গ. অনেক প্রকার　　ঘ. দুই প্রকার

২. র এর স্থানে বিসর্গ হলে তাকে বলে-
   ক. স-জাত বিসর্গ　　খ. অ-জাত বিসর্গ
   গ. র-জাত বিসর্গ　　ঘ. ম-জাত বিসর্গ

৩. অ+ ঃ + অ মিলে কি হয়?
   ক. অ　　খ. আ
   গ. ও　　ঘ. ই

৪. সন্ধি করুন :

ক. ততঃ + অধিক		খ. মনঃ + রম	
গ. অন্তঃ + ধান		ঘ. পুনঃ + বার	
ঙ. দুঃ + যোগ		চ. নিঃ + লোভ	
ছ. মনঃ + কষ্ট		জ. নিঃ + স্তব্ধ	

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

উত্তর

১. ঘ　　২. গ　　৩. গ

৪. ক. ততোধিক　　খ. মনোরম　　গ. অন্তর্ধান
   ঘ. পুনর্বার　　ঙ. দুর্যোগ　　চ. নির্লোভ
   ছ. মনঃকষ্ট　　জ.নিঃস্তব্ধ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন :

১. সন্ধি বলতে কি বুঝায়? বাংলা ভাষায় সন্ধির প্রয়োজনীয়তা কি? উদাহরণসহ লিখুন।

২. সন্ধি কত প্রকার ও কি কি? উদাহরণসহ লিখুন।

৩. খাঁটি বাংলা ও তৎসম সন্ধির পার্থক্য কি? উদাহরণসহ বুঝিয়ে লিখুন।

৪. সন্ধি বিচ্ছেদ করুন :

বারেক, নিন্দুক, হিতাহিত, স্বেচ্ছা, সূর্যোদয়, ক্ষুধার্ত, মতৈক্য, অত্যধিক, অন্বেষণ, গায়ক, লবণ, দিগন্ত, পরিচ্ছদ, উচ্ছেদ, উদ্ধার, ষড়যন্ত্র, সঞ্চয়, সংযোগ, ষোড়শ, কিংবা, মনোযোগ, নিরাকার, নিষ্ঠুর।

৫. সন্ধি করুন :

মহ + ঔষধ; ইতি + আদি; পরি + ঈক্ষা; মরু + উদ্যান; সু + আগত; ভো + অন; সৎ + চিন্তা; উৎ + লেখ; উৎ + যোগ; শম +কা; রাজ + নী; ষষ + থ; বন + পতি; মনঃ + হর; অন্তঃ+ গত; মনঃ + কষ্ট।

পাঠটি পড়ে উত্তরগুলো নিজে নিজে লিখুন

দ্বিরুক্ত শব্দ

ভূমিকা

দ্বিরুক্ত শব্দের অর্থ দুবার বলা হয়েছে এমন। বাংলা ভাষায় দ্বিরুক্ত শব্দের মাধ্যমে নতুন শব্দ তৈরি হয়। অর্থাৎ একই শব্দকে পর পর দুবার ব্যবহারের মাধ্যমে সেই শব্দটিরই নতুন অর্থ হয়। কখনও শব্দের নতুন অর্থের ব্যাপকতা এবং প্রসারতাও বৃদ্ধি পায়। এই কারণে দ্বিরুক্ত শব্দ নতুন শব্দ গঠনের একটি বিশিষ্ট প্রক্রিয়া। দ্বিরুক্ত শব্দগুলো বাংলা ভাষার শব্দ ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। সে কারণে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ সম্পর্কে জানতে হলে দ্বিরুক্ত শব্দ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা অত্যন্ত প্রয়োজন।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

১. দ্বিরুক্ত শব্দ বা শব্দদ্বৈত কাকে বলে তা বলতে ও লিখতে পারবেন।

২. বাংলা ভাষায় দ্বিরুক্ত শব্দের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

৩. দ্বিরুক্ত শব্দ কত প্রকার তা লিখতে পারবেন।

বাংলা ভাষায় এমন কিছু শব্দ রয়েছে যেগুলো একবার ব্যবহার করলে যে অর্থ প্রকাশ করে, দুবার ব্যবহারের মাধ্যমে সেই শব্দটিই কখনও নতুন অর্থ কখনও বা সম্প্রসারিত অর্থ প্রকাশ করে। ফলে শব্দটির ব্যাপকতা এবং প্রগাঢ়তা প্রকাশ পায়। এই শব্দকেই দ্বিরুক্ত শব্দ বা শব্দদ্বৈত বলে।

সংজ্ঞা : দ্বিরুক্ত শব্দের আভিধানিক অর্থ- দুবার বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কোন শব্দ বা পদের পরপর দুবার প্রয়োগ বা পুনরাবৃত্তিকেই দ্বিরুক্ত শব্দ বলে।

যেমন- আমার শীত লাগছে। এই বাক্যটিতে যথার্থ শীত লাগা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু যদি বলা হয়, 'আমার শীতশীত লাগছে, তখন শীত নয় তবে শীতের ভাব অনুভূত হচ্ছে- এই অর্থটিই প্রকাশ পায়।

বাংলা ভাষায় বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয়, সমাপিকা ক্রিয়া; এক কথায় সকল প্রকার পদেরই দ্বিরুক্ত প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। যেমন- বস্তা-বস্তা, পর পর, চোখে চোখে, হেসে হেসে, হায়হায়, খাও খাও ইত্যাদি।

দ্বিরুক্ত শব্দগুলো শব্দের বিশেষ অর্থ, সম্প্রসারিত অর্থ, নতুন অর্থ, অনেক সময় মনের ভাব, শূন্যতাবোধ, স্তব্ধতা এমন কি নিঃশব্দতাকে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখে। অর্থাৎ অর্থের ব্যাপকতা, গভীরতা, পুনরাবৃত্তি, অসম্পূর্ণতা, অনিশ্চয়তা, তৎক্ষণাৎ, বাহুল্য ইত্যাদি প্রকাশের ক্ষেত্রে দ্বিরুক্ত শব্দের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। দ্বিরুক্ত শব্দ একদিকে যেমন আমাদের মনের বিশেষভাবকে প্রকাশ করতে সাহায্য করে, অন্যদিকে বাক্যের অর্থগৌরব ও ধ্বনিমাধুর্য বৃদ্ধি করে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় কেউ চলে যাওয়ায় বাড়ি কতখানি শূন্য লাগছে তা বোঝাবার জন্যে "তুমি চলে যাওয়ায় বাড়িটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে।"

ঠিক একইভাবে, ঘরে ঘরে, হাড়ে হাড়ে, হাসতে হাসতে গলায় গলায়, ঝুরি ঝুরি, মুঠোমুঠো, প্রতিটি শব্দই দুবার ব্যবহারের ফলে নতুন অর্থ প্রকাশ করেছে। বাংলা ভাষায় তিন প্রকার দ্বিরুক্ত শব্দ আছে। যেমন-

(১) শব্দের দ্বিরুক্তি, (২) পদের দ্বিরুক্তি, (৩) অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। দ্বিরুক্ত শব্দ কাকে বলে?

ক. অর্থহীন শব্দ　　খ. ভিন্ন অর্থ প্রকাশক শব্দ

গ. দুবার বলা হয়েছে এমন　　ঘ. নতুন শব্দ

২। জ্বর জ্বর অর্থ বলতে বোঝায়–

ক. জ্বরের ভাব　　খ.খুব জ্বর

গ. অল্প জ্বর　　ঘ. জ্বর

৩। 'সকাল সকাল' বলতে বোঝায়-

ক. অর্থ নেই　　খ. সকালে

গ. দুপুরের আগে　　ঘ. তাড়াতাড়ি

৪। 'চোখে চোখে' রাখা এখানে চোখে চোখে অর্থ হল–

ক. চোখ　　খ. দুই চোখ

গ. অর্থহীন শব্দ　　ঘ. সতর্ক দৃষ্টি রাখা

৫। দ্বিরুক্ত শব্দ কত প্রকার?

ক. দুই　　খ. তিন

গ. চার　　ঘ. ছয়

৬। দুটো বাক্যে 'হাত' শব্দটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে লিখুন।

ক. রহিমের হাতে বই ছিল।　　খ. রহিম হাতে হাতে ফল পেল।

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

উত্তরমালা

১। গ　২। ক　৩। ঘ　৪। ঘ　৫। খ　৬। ক. হাত অর্থে ৬। খ. তৎক্ষণাৎ

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

১. শব্দের দ্বিরুক্তি কাকে বলে তা লিখতে পারবেন।

২. শব্দের দ্বিরুক্তি গঠনের প্রক্রিয়া লিখতে পারবেন।

৩. শব্দের দ্বিরুক্তি কিভাবে বাক্যে প্রয়োগ করা যায় তা লিখতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সংজ্ঞা : একই শব্দ দুবার ব্যবহার করার পর শব্দ দুটো অবিকৃত থেকে গেলে তাকে শব্দের দ্বিরুক্তি বলে।

যেমন- ঘনঘন, লাল লাল, বড় বড়, বস্তা বস্তা, শীত শীত ইত্যাদি।

অনেক সময় একই শব্দ দুবার ব্যবহারের ফলে কোন অর্থ প্রকাশ করে নিচে তা দেখানো হল।

ক. বাহুল্য বোঝাতে :	বস্তা বস্তা চাল, ঝুড়ি ঝুড়ি আম, হাঁড়ি হাঁড়ি সন্দেশ ইত্যাদি।
খ. অল্পতা বোঝাতে	জ্বরজ্বর ভাব, শীতশীত বোধ, হাসি হাসি মুখ, কবি কবি ভাব।
গ. তাড়াতাড়ি বোঝাতে	সকাল সকাল আসবে, হাতে হাতে ফল পাওয়া ।
ঘ. ধারাবাহিকতা বোঝাতে	দিন দিন ভাল হওয়া, বছর বছর পাস করা, মাস মাস মাইনে দেয়া।
ঙ. বহুবচন অর্থে	লাল লাল ফুল, ছোট ছোট ঘর, নতুন নতুন নাম।
চ. গুণ বোঝাতে	গরম গরম ভাত, মিষ্টি মিষ্টি কথা।

দ্বিরুক্ত শব্দ বিভিন্ন পদ্ধতিতে করা যায়

১. একই শব্দ দুবার ব্যবহার করে। ঘর ঘর, বড় বড়, ঘন ঘন ইত্যাদি।

২. সমার্থক শব্দ যোগে : একই অর্থবাচক দুটি ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে। যেমন- মাথা-মুণ্ড, খোঁজ-খবর, ভাবনা-চিন্তা, ধন-দৌলত ইত্যাদি।

এই জাতীয় দ্বিরুক্ত শব্দের ব্যবহারে অর্থের ব্যাপকতা বোঝায়। যেমন আলাদাভাবে বিপদ কিংবা আপদ বলতে সে অর্থ প্রকাশ করে, যুক্ত শব্দে অর্থের ভিন্নরূপ প্রকাশ পায়। সমষ্টিগতভাবে আপদ-বিপদ বলতে নানা প্রকার দুর্যোগের সম্ভাবনার ইঙ্গিত প্রকাশ পায়।

৩. অনেক সময় দ্বিরুক্ত শব্দ জোড়ার দ্বিতীয় শব্দটির সামান্য পরিবর্তন করা হয়। যেমন- ডাকাডাকি, বকাবকি, ফিটফাট, মিটমাট, নাদুস-নুদুস ইত্যাদি।

৪. অনেক সময় বিপরীত অর্থবোধক দুটো শব্দযোগেও দ্বিরুক্ত শব্দ হয়। যেমন- দেনা-পাওনা, লেন-দেন, রাজা-প্রজা, আসা-যাওয়া ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. নৈর্বিত্তিক প্রশ্নোত্তর :

সঠিক উত্তরে পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১. 'রাগ রাগ' শব্দের অর্থ -

ক. অনেক রাগ খ. অল্প রাগ গ. রাগের ভাব, ঘ. রাগ নয়

২. 'ঘন ঘন' শব্দের অর্থ -

ক. বারবার খ. অনেক গ. জমাট মেঘ ঘ. শব্দ

৩. কোনটি সমার্থক শব্দযোগে গঠিত দিরুক্ত শব্দ?

ঘর ঘর খ. লাল লাল গ. মাথা-মুণ্ডু ঘ. দেনা-পাওনা

৪. কোন দ্বিরুক্ত শব্দটি বাহুল্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

ক. হাসি হাসি মুখ খ. দিন দিন গ. মুঠো মুঠো ঘ. হাতে হাতে

৫. বিপরীত অর্থবোধক শব্দযোগে কোন দ্বিরুক্ত শব্দটি গঠিত?

ক. রাজা-প্রজা খ. ভাবনা-চিন্তা গ. ডাকাডাকি ঘ. চোর চোর

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. শব্দের দ্বিরুক্ত কাকে বলে? উদাহরণসহ লিখুন।

নিচের শব্দগুলো বাক্যে প্রয়োগ করুন :

২. কড়াকড়া, ঘড়িঘড়ি, লড়াই-লড়াই, চোর-চোর, টাট্‌কা-টাটকা, তাজাতাজা, রাগরাগ, বোঝা বোঝা, কবি কবি।

৩. দুটো পৃথক বাক্যে ব্যবহৃত রেখাযুক্ত শব্দের অর্থ পার্থক্য নির্দেশ করুন।

ক. ঘরটি একেবারে ফাঁকা।

খ. তুমি চলে যাবার পর ঘরটি ফাঁকা ফাঁকা লাগছে।

গ. সকাল বেলা সূর্য ওঠে।

ঘ. সকাল সকাল বাড়ি ফিরবে।

চ. উপরে উঠতে কষ্ট হয়।

ছ. উপরে উপরে ভাল আসলে পাকা বদমাশ।

জ. লাল ফুল আন।

ঝ. লাল লাল ফুল আনবে।

৪. নিচের শব্দগুলোর বাক্য রচনা করে অর্থের পার্থক্য নির্দেশ করুন -

মনে মনে মনে	তলে তলে তলে	পড় পড় পড়	কাল কাল কাল	বছর বছর বছর	দিন দিন দিন	ভাসা ভাসা ভাসা

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

উত্তর

১. গ ২. ক ৩. ক খালি, খ শূন্যতা, গ প্রভাত, ঘ. তাড়াতাড়ি, ঙ. উচ্চতায়, চ. বাইরে, ছ. লাল রঙের, জ. অনেকগুলো লাল ফুল
৪. গ, ৫. গ ৬. ক

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

* পদের দ্বিরুক্তি কাকে বলে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
* পদের দ্বিরুক্তি ব্যবহারের ফলে একই পদ কেমন করে নানা অর্থ প্রকাশ করে তা বলতে ও লিখতে পারবেন।

সংজ্ঞা : একই বিভক্তি যুক্ত পদের দুবার ব্যবহারকে পদের দ্বিরুক্তি বা পদাত্মক দ্বিরুক্তি বলে।

বাংলা ভাষায় সকল পদেরই দ্বিরুক্ত প্রয়োগ হয়ে থাকে। অনেক সময় বিশেষ্য এবং বিশেষণ পদের দ্বিরুক্ত প্রয়োগের ফলে বহুবচনের অর্থ প্রকাশ করে।

১। বিশেষ্য পদের দ্বিরুক্তি (দ্রুততা অর্থে) সঙ্গে সঙ্গে, রাতে রাতে, হাতে হাতে ইত্যাদি।

ক. দীর্ঘকালীনতাবাচক : চলতে চলতে, হেসে হেসে, ঘন্টায় ঘন্টায়, কথায় কথায় ইত্যাদি।

খ. সংযোগ বাচক শব্দ বোঝাতে : বুকে বুকে, পাথরে পাথরে, কাঠে কাঠে ইত্যাদি।

গ. সর্বদা লেগে থাকারভাব বোঝাতে : কাছে কাছে, পাশে পাশে, পিছনে পিছনে, পায় পায় ইত্যাদি।

২। **বিশেষণ পদের দ্বিরুক্তি**

সংখ্যা স্বল্পতা বোঝাতে - ভিজে ভিজে, কাঁদো কাঁদো

৩। **সর্বনাম পদের দ্বিরুক্তি**

বহুবচন বোঝাতে : কাকে কাকে, কেউ কেউ, যে যে, কে কে ইত্যাদি।

৪। **ক্রিয়াপদের দ্বিরুক্তি**

ক. সময়ের স্বল্পতা : দেখতে দেখতে, বলতে বলতে, উঠতে উঠতে, চলতে চলতে।

খ. পুনঃপুনঃ অর্থে : বসে বসে, খেতে খেতে, ডেকে ডেকে।

গ. আগ্রহ অর্থে : বল বল, চলুন চলুন, আসুন আসুন।

ঘ. বিশেষণ অর্থে : মরে মরে অবস্থা, যাবে যাবে ভাব।

ঙ. সম্ভাবনা অর্থে : করি করি, আসে আসে, আসবে আসবে।

৫। **অব্যয় পদের দ্বিরুক্তি** সাধারণত দুভাবে হয়

১. একই পদের দুবার ব্যবহারের মাধ্যমে। যেমন– নেচে নেচে, ভয়ে ভয়ে, জনে জনে, মাঠে মাঠে, ধীরে ধীরে

২. একটি পদ সামান্য পরিবর্তনের মাধ্যমে। যেমন– হাতে নাতে, মাঠে-ঘাটে, আকাশে-বাতাসে, জোরে-সোরে, আশে-পাশে, ধনে-জনে ইত্যাদি।

দ্বিরুক্ত শব্দগুলো অনেক সময় বিশিষ্ট অর্থে বাগধারা রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন-

চোরে চোরে মাসতুতো ভাই; হাড়ে হাড়ে, গলায় গলায়, বাঘে-মোষে, বাছাবাছা, চোখে-চোখে ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. নৈর্বিত্তিক প্রশ্নোত্তর :

সঠিক উত্তরে পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১. লোকটি হাড়ে হাড়ে শয়তান।

ক. বদমাশ খ. বেশি শয়তান গ. হাড়ের মাঝে শয়তানি ঘ. চোর

২. থেকে থেকে জ্বর আসে।

ক. বারবার খ. সব সময় ঘ. একটু পরপর ঘ. একদিন পর

৩. চোরটি হাতে নাতে ধরা পড়েছে।

ক. সঙ্গে সঙ্গে খ. হাতে ধরা গ. একটু পর ঘ. কোন অর্থ নেই

খ. রচনামূলক প্রশ্ন :

১. পদের দ্বিরুক্তি কাকে বলে? উদাহরণসহ লিখুন।

২. নিচের শব্দগুলো বাক্যে প্রয়োগ করুন -

চোখে চোখে, নেচে নেচে, হাড়ে হাড়ে, ফাঁকে-ফাঁকে, মুখে মুখে, হেসে হেসে।

বাক্যে ব্যবহৃত নিম্নরেখ শব্দটির সঠিক অর্থে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন -

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

উত্তর

১. খ, ২. গ ৩. ক

পাঠ ৪

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

* ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্ত শব্দ কাকে বলে লিখতে ও বলতে পারবেন।
* ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্ত শব্দগুলো বাক্যে প্রয়োগ করতে পারবেন।
* বাংলা ভাষায় ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্ত শব্দের প্রয়োজনীয়তা লিখতে পারবেন।

সংজ্ঞা

বাংলা ভাষায় এমন বহু দ্বিরুক্ত শব্দ আছে যা কোন বাস্তব ধ্বনির অনুকারী বা নিছক কোন ধ্বনির কাল্পনিক অনুকরণ করে। এই জাতীয় শব্দকে ধ্বন্যাত্মক শব্দ বলে। এমন একই ধ্বন্যাত্মক শব্দের দুবার প্রয়োগের নামই ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তি বা ধ্বনির দ্বিরুক্তি।

এই ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্ত শব্দগুলো বাংলা ভাষার ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, 'সে সকল শব্দ ভাষা হইতে বাদ দিলে বঙ্গভাষার বর্ণনাশক্তি নিতান্তই পঙ্গু হইয়া পড়ে।" এ ধরনের শব্দগুলো অনেক সময় মনের ভাব প্রকাশ করতে সাহায্য করে। যেমন বলা যায়, তালটা পড়ে টিপ্ আওয়াজ করল।

এখানে তাল পড়ার শব্দকে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু যখন বলা হয়, "আমার বুক টিপ্‌টিপ্ করছে।" এখানে 'টিপ্ টিপ্ কোন শব্দ নয় মনের আশঙ্কাকে ব্যক্ত করেছে। এভাবে ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্ত শব্দগুলোর দ্বারা আমরা সব রকমের শূন্যতা, নিঃশব্দতা, স্তব্ধতা, তীব্রতা, বাতাসের শব্দ, কোন কোন রঙের বর্ণনাও করতে পারি। যেমন, টকটক শব্দটি কোন কঠিন পদার্থের কিছু ঠোকার আওয়াজ বোঝায়। কিন্তু যখন বলি, টকটকে লাল শাড়ি, এখানে লাল রঙটি এমন কড়া যে আমাদের চোখের দৃষ্টিতে আঘাত করে। ঠিক এমনি ধবধবে সাদা, কুচকুচে কালো ইত্যাদি।

ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্ত শব্দ বিভিন্নভাবে হতে পারে

১। **মানুষের বিভিন্ন ধ্বনির অনুকরণের সাহায্যে :** ভেউ ভেউ করে কাঁদা, ট্যাট্যা করে কাঁদা, হা হা করে হাসা, ঠাঠা করে হাসা ইত্যাদি।

২। **জীব-জন্তুর ধ্বনিকে অনুকরণ করে :** মিউ মিউ (বিড়ালের ডাক), ঘেউ ঘেউ (কুকুরের ডাক), গুনগুন (মৌমাছির ডাক) ইত্যাদি।

৩। **কোন বস্তুর ধ্বনির অনুকরণে :** ঝমঝম (বৃষ্টির শব্দ), চুকচুক (দুধ খাবার শব্দ) মড়মড় (গাছ ভেঙে পড়ার শব্দ) ইত্যাদি।

৪। **অনুভূতিজাত কাল্পনিক ধ্বনির শব্দ :** চিকচিক, ঝিকমিক, কুটকুট, ম্যাজম্যাজ, ঘিনঘিন, ঘ্যানঘ্যান, সুড়সুড়, চিনচিন, ছমছম ইত্যাদি।

ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্ত শব্দগুলো অনেক সময় বিভিন্নপদ রূপেও ব্যবহৃত হয়।

বিশেষ্য রূপে : পানির কলের টিপ্‌টিপানি আমাকে পাগল করে দেবে। এমনি, বকবকানি, ঝমঝমানি, ছটফটানি।

বিশেষণ রূপে : ঢুলু ঢুলু চোখে বসে আছে। শিশুটি টলমল করে হাটছে।

ক্রিয়ারূপে : মেয়েরা কলকলিয়ে কথা বলে উঠল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৪

ক. নৈর্বিত্তিক প্রশ্নোত্তর :

সঠিক উত্তরে পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১. ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্ত শব্দ কোনটি?
ক. লাললাল জ্বর জ্বর গ. কাকে কাকে ঘ. শন্ শন্

২. কোনটি মানুষের ধ্বনির অনুকার?
ক. মিউ মিউ খ. কা কা গ. হা হা ঘ. ভন ভন

৩. কোনটি 'বিশেষণবাচক' শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. ঘেউ ঘেউ খ. বকবকানি গ. কুহ কুহ ঘ. ছল ছল

৪. কোনটি শূন্যতা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. শাঁ শাঁ খ. ঝাঁ ঝাঁ গ. মট মট ঘ. খাঁ খাঁ

খ. রচনামূলক প্রশ্ন :

১. ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্ত শব্দ কাকে বলে?

২. নিচের ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্ত শব্দগুলোকে বাক্যে প্রয়োগ দেখান :

ঝমঝম, মিন্‌মিন, দপ্‌দপ, শাঁশাঁ, শোঁ শোঁ, ঝন্‌ঝন্, কুট্‌কুট্, খাঁখাঁ, মট্‌মট্, ফিক্ ফিক্, ফট্‌ফট্।

উত্তর

১. ঘ, ২. গ ৩. ঘ ৪. ঘ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন :

১. দ্বিরুক্তি কাকে বলে? বাংলা ভাষায় দ্বিরুক্ত শব্দের প্রয়োজনীয়তা উদহারণ সহ লিখুন।
২. বাংলা ভাষায় দ্বিরুক্ত শব্দ কত প্রকার উদাহরণ সহ লিখুন।
৩. শব্দের দ্বিরুক্তি ও পদের দ্বিরুক্তির পার্থক্য দেখিয়ে উভয়ের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।
৪. অর্থ লিখে বাক্য রচনা করুন:
কানে কানে, গলায় গলায়, হাড়ে হাড়ে, শীত শীত, ধূ ধূ, কবি কবি, ছল ছল।
৫. 'ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলো বাংলা ভাষার অমূল্য সম্পদ আলোচনা করে' উদহারণ দিয়ে উক্তিটির পক্ষে যুক্তি দেখান।
৬. পাশে দেয়া উপযুক্ত দ্বিরুক্ত শব্দের সাহায্যে শূন্যস্থান পূরণ করুন :

ক. আমার গা ---------- করছে।
খ. ---------- আর ভাল লাগে না।
গ. ছেলেটির সবসময় ---------- ভাব।
ঘ. ---------- তোমাকেই খুঁজছিলাম।
ঙ. ছেলেটির ---------- স্বভাব অসহ্য লাগে।
চ. সব সময় মেয়েটির ---------- ভাল লাগে না।
ছ. ছেলেটি ---------- সন্দেশ খেয়ে ফেলল।
জ. ---------- শহীদ মিনার ভরে আছে।

ছম ছম, কবি কবি, মনে-মনে, প্যান-প্যানানি, বক-বকানি, মিন মিনে, থালা-থালা, ফুলে ফুলে।

পাঠটি পড়ে উত্তরগুলো নিজে নিজে লিখুন।

৬. ক. ছমছম, খ. বকবকানি, গ. কবি কবি, ঘ. মনে মনে, ঙ. মিনমিনে, চ. প্যানপ্যানানি, ছ. থালা থালা, জ. ফুলে ফুলে।

বচন

ভূমিকা

বচন ব্যাকরণের একটি পারিভাষিক শব্দ। বচনের অর্থ সংখ্যা সম্পর্কিত ধারণা। বচন ব্যাকরণের রূপতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনার ভেতরে পড়ে। তাই ভাষার সঠিক প্রয়োগ সম্পর্কে জানতে হলে বচনের ব্যবহার সম্পর্কিত আলোচনা প্রয়োজন।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

* বচনের সংজ্ঞা জানতে ও লিখতে পারবেন।
* বচন কত প্রকার ও কি কি তা লিখতে ও বলতে পারবেন।

সংজ্ঞা :

যার দ্বারা ব্যক্তি, বস্তু, গুণ ইত্যাদির সংখ্যা নির্দেশ করা যায় তাকে বচন বলে। সুতরাং যার সংখ্যা হয়, গোনা যায় কেবল তারই বচন হয়, যার গণনা বা সংখ্যা হয় না তার বেলায় বচন ভেদের প্রশ্নই আসে না।

যেমন- মেয়ে-মেয়েরা, গরু-গরুগুলি, টেবিল-টেবিলগুলি।

কিন্তু পানি, দুধ, তেল ইত্যাদির বচন হয় না। কারণ পানিকে একটি পানি বা দুটি পানি বলা যায় না।

বাংলা ভাষায় বচন দুপ্রকার : একবচন ও বহুবচন। বাংলায় দ্বিবচন নেই। কোন কোন ভাষায় তিনটি বচন পাওয়া যায়। যেমন- সংস্কৃত, প্রাচীন গ্রীক, আরবি ও সাঁওতালি ভাষায় তিনটি বচনের রূপ পাওয়া যায়। কিন্তু আধুনিক ভাষায় সাধারণত দুটি বচনই ব্যবহৃত হয়।

বাংলা ভাষায় কেবল বিশেষ্য ও সর্বনাম পদেরই বচনভেদ আছে। অন্যান্য পদের বচন হয় না। যেমন-

ক. আমার ছোটভাই স্কুলে পড়ে। (একবচন)

↓ ↓

সর্বনাম বিশেষ্য

খ. আমাদের ছোট ভাইয়েরা স্কুলে পড়ে। (বহুবচন)

↓ ↓

সর্বনাম বিশেষ্য

দুটো বাক্যে দেখা যাচ্ছে বচনভেদে সর্বনাম এবং বিশেষ্য পদের রূপ পরিবর্তিত হয়েছে। যেমন- আমার (একবচন), আমাদের (বহুবচন), ছোটভাই (একবচন), ছোট ভাইয়েরা (বহুবচন), কিন্তু বিশেষণ পদ 'ছোট এবং ক্রিয়াপদ 'পড়ে'র রূপ একই আছে।

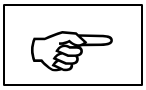

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। বচন বলতে কি বোঝায়?

ক. যা শব্দ চিনতে সাহায্য করে
খ. যা পদ চিনতে সাহায্য করে
গ. যা লিঙ্গ চিনতে সাহায্য করে
ঘ. যা সংখ্যা বুঝতে সাহায্য করে

২। বাংলা ভাষায় কোন কোন পদের বচনভেদ আছে?

ক. বিশেষ্য ও সর্বনামের
খ. বিশেষ্য ও বিশেষণের
গ. অব্যয় ও ক্রিয়ার
ঘ. বিশেষণ ও ক্রিয়ার

৩। বাংলা ভাষায় 'বচন' কত প্রকার?

ক. চার প্রকার
খ. দু প্রকার
গ. তিন প্রকার
ছ. ছয় প্রকার

৪। কোন কেন ভাষায় তিন প্রকার বচন আছে?

ক. প্রাচীন গ্রীক, সংস্কৃত, আরবি ও সাঁওতাল
খ. কোন ভাষায় নেই
গ. সাঁওতাল, জার্মান, ফরাসি
ঘ. বাংলা, ইংরেজি, আরবি

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

উত্তরমালা

১. ঘ ২. ক ৩. খ ৪. ক

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

* একবচন কাকে বলে তা বলতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
* কি কি উপায়ে একবচন গঠিত হয় তা লিখতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

যে শব্দের সাহায্যে কোন ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীর একটিমাত্র সংখ্যা বোঝায় তাকে একবচন বলে।

যেমন- মেয়ে, মেয়েটি, আমি, তুমি, পাখি, পাখিটি, ফুল, কবিতা ইত্যাদি।

বাংলায় একবচনের জন্য বিশেষ কোন প্রত্যয় বা বিভক্তি নেই। শব্দের মূল রূপটিকেই একবচন বোঝায়। তবে মাঝে মাঝে বিশেষ্যের পর টা, টি, খানা, খানি, গাছা, গাছি, গাছ ইত্যাদি প্রত্যয় বাচক শব্দ যুক্ত হয়ে একবচন বোঝানো হয়। যেমন- একটি পাখি, পাখিটি, আমটি, একগাছাচুড়ি, চুড়িটি, গাছটি, বইখানা, লাঠিগাছা, মালাগাছি ইত্যাদি।

উপরের উদাহরণে দেখা গেছে কখনো কখনো বিশেষ্য শব্দের পূর্বে এক, একজন, একটি বসে এক বচনের অর্থ প্রকাশ করেছে। আবার যদি বিশেষ্য শব্দের পর টা, টি, খানা ইত্যাদি যোগ করা হয় তাহলে সেটি নির্দিষ্ট একটি জিনিস বা ব্যক্তিকে বোঝায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. একবচন কাকে বলে? উদাহরণ সহ লিখুন।

২. নিচের শব্দগুলোকে একবচন রূপে বাক্যে প্রকাশ করুন।

বালক, পাখি, মেয়ে, বাঘ, গাছ, চুড়ি, লোক।

৩. এক বচনে কোন সংখ্যা নির্দেশ করে?

ক. দুই খ. তিন গ. এক ঘ. চার

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

উত্তর

২। বালক = একটি বালক ফুটবল খেলছে।

মেয়ে = মেয়েটি টেবিল টেনিস খেলছে।

পাখি = একটি পাখি উড়ে গেল।

বাঘ = আমি সুন্দরবনে বেড়াতে গিয়ে একটি বাঘ দেখেছি।

গাছ = বাসার সামনে একটি গাছ আছে।

চুড়ি = চুড়িগাছি ভেঙে গেল।

লোক = একজন লোক বাঁশি বাজাচ্ছে।

৩। গ

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

* বহুবচনের সংজ্ঞা লিখতে পারবেন।
* কোন কোন জিনিসের বহুবচন হয় না তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
* বালংা ভাশায় কি কি উপায়ে বহুবচন গঠিত হয় তা লিখতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সংজ্ঞা

যে শব্দের সাহায্যে অধিক ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীর সংখ্যা বোঝা যায় তাকে বহুবচন বলে। যেমন-

ছেলেরা বল খেলছে।

মেয়েরা ক্রিকেট খেলছে।

গরুগুলি ঘাস খাচ্ছে।

চেয়ারগুলো ভাঙা। ইত্যাদি।

আমরা প্রথম পাঠেই পড়েছি যে সমস্ত বস্তু গননা করা যায় বা সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা যায় তারই বচন হয়। কিন্তু যা গণনার বিষয় নয় তার বচন হয় না। তাই দুধ, জল, তেল, আটা, ময়দা, চিনি এসবের বচন হয় না। এসব জিনিসকে পরিমাপ করা যায়।

এক লিটার দুধ আনতে হবে।

আধ লিটার পানি আন।

দুই কেজি আটা কিনতে হবে। কিংবা বলা যায় একগ্লাস দুধ খাও, এক বালতি পানি আন। কখনো একটি দুধ, একটি লবন, একটি আটা, একটি জল বলা যায় না। কিনতে গেলে এসব পরিমাপ করে কিনতে হয়। তাই এসবের বহুবচন হয় না।

যদি বলা হয় বাজারের সব ঘিয়ে ভেজাল আছে। এবাক্যে সব ঘি বলতে সব ব্যাণ্ডের ঘি (বাজারের বা দোকানের) কে বোঝায়। এখানে সব ঘিয়ের বহুবচন নয়।

বাংলা ভাষায় বহুবচন প্রকাশের বিভিন্ন উপায়

১. শব্দের শেষে বিভক্তি বা প্রত্যয় যোগ করে। যেমন রা, এরা, দিগকে, দেরকে, দিগের প্রভৃতি বিভক্তি বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের সাথে যোগ করে বহুবচন গঠিত হয়।

যেমন- মেয়েরা, মায়েরা, ছাত্রদের, ছাত্রীরা, ভোটারদের, আমাদের, তোমাদের, তাদের ইত্যাদি।

২. বহুত্ববাচক বা সমষ্টিবাচক শব্দ বিশেষণরূপে বিশেষ্য পদের পূর্বে বসে বহুবচন হয়। যেমন- সব, সকল, সমস্ত ইত্যাদি সমষ্টিবাচক শব্দ বসিয়ে নিচে বহুবচনের উদাহরণ দেয়া হল।

সব মানুষ খারাপ হয় না।

সকল ছাত্র পরীক্ষা পেছাবার বিপক্ষে।

সমস্ত বস্তি তুলে দিতে হবে।

৩. বিশেষ্যের পর সমষ্টিবাচক শব্দ যোগ করে। যেমন- মানুষগণ, ছাত্রদল, সম্পাদকমণ্ডলী ইত্যাদি।

৪. বিশেষ্যবাচক, বা বিশেষণবাচক শব্দটি পরপর দুবার ব্যবহার করে, অর্থ শব্দের দ্বিরুক্তির সাথে বহুবচন হয়। যেমন- ফুলে, ফুলে, পাতায় পাতায়, বস্তা বস্তা, দিন দিন ইত্যাদি।

৫. শব্দের একবচন রূপে বহুবচন। যেমন- পাগলে কিনা বলে ছাগলে কিনা খায়। এখানে পাগলে এবং ছাগলে দুটোতেই বহুবচনের রূপ প্রকাশ পেয়েছে।

উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলো নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হল

১. ক. বাংলায় প্রানিবাচক ও অপ্রানিবাচক শব্দের বহুবচন বোঝাতে গুলা, গুলো, গুলি ব্যবহার করা যায়। যেমন-

কুকুরগুলো, ছেলেগুলো, মেয়েগুলো, কাপড়গুলি, টেবিলগুলা ইত্যাদি।

খ. মান্যগণ্য ব্যক্তিদের নামবাচক শব্দের বেলায় গুলা, গুলি, গুলো প্রত্যয় ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু অশ্রদ্ধা বা বিদ্রুপ প্রকাশ করতে মাঝে মধ্যে প্রয়োগ করা হয়। যেমন-

কর্মকর্তাগুলো যেন ঘুষ খাবার জন্যই বসে আছে।

গ. জড় পদার্থের বহুবচন প্রকাশের ক্ষেত্রে সব সময়-গুলো, গুলি প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। যেমন-

চেয়ারগুলো, টেবিলগুলো, মোড়াগুলি, কখনো টেবিলরা চেয়াররা বলা হয় না।

২.ক. সমষ্টিবাচক শব্দ যুক্ত হয়ে যেমন বহুবচন হয়, তেমনি অনেক সময় সংখ্যাবাচক বিশেষণ বিশেষ্যপদের পূর্বে বসে বহুবচন গঠন করে। যেমন-

হাতের পাঁচ আঙ্গুল সমান নয়।

চারজন লোক এগিয়ে আসছে।

খ. অনেক সময় বহুত্ববাচক, সর্বনাম, বিশেষণ রূপে বিশেষ্যের আগে বসে বহুবচন গঠন করে। যেমন- এত, তত, কতক ইত্যাদি। যেমন-

কতক ছাত্র গাছ তলায় বসে আছে।

কতগুলো কলম।

অনেক জেলে মাছ ধরছে।

৩.ক সমষ্টিবাচক শব্দ, বিশেষ্যবাচক পদের পরে যুক্ত হয়ে বহুবচন হয়। কিন্তু এই সমষ্টিবাচক শব্দগুলো সবরকম বিশেষ্যবাচক শব্দের শেষে যুক্ত হয় না। এই সমষ্টিবাচক শব্দগুলো হল : গণ, দল, রাশি, বৃন্দ, কুল, পাল, পুঞ্জ, রাজি, রাশি, বর্গ, শ্রেণী, সমূহ, মহল, আবলী ইত্যাদি।

খ. সাধারণত প্রাণীবাচক শব্দে ব্যবহৃত হয়- গণ, কুল, পাল, মণ্ডলী, মহল, বর্গ ইত্যাদি সাধারনত সম্মানার্থে ব্যবহৃত হয় নিচে উদাহরণ দেয়া হল-

দেবগন, মনুষ্যগণ, অলিকুল, পক্ষিকুল, ছাগপাল, পতঙ্গপাল, পরিচালকমণ্ডলী, শিক্ষকমণ্ডলী, বন্ধুমহলে, শিক্ষকমহলে, সৈনিক মহলে, শ্রোতাবর্গ, নেতৃবর্গ ইত্যাদি।

গ. সাধারণ অপ্রানিবাচক শব্দে ব্যবহৃত হয়- আবলী, গুচ্ছ, জাল, দাম, রাজি, রাশি, মালা, শ্রেণী ইত্যাদি।

যেমন- দীপাবলী, রচনাবলী, ঘটনাবলী, অলকগুচ্ছ, পুষ্পগুচ্ছ, কেশজাল, শরজাল, কুসুমদাম, শৈবালদাম, আলোকমালা, রত্নরাজি, পুষ্পরাজি, তরুশ্রেণী ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

ঘ. উভয়বাচক শব্দে শ্রেণী, সমূহ, সকল যেমন- অশ্বশ্রেণী, তরুশ্রেণী, ছবিসকল, ছাত্রসকল, লোকসমূহ, গ্রামসমূহ, রাষ্ট্রসমূহ, বন্ধুসকল ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. নৈর্বিত্তিক প্রশ্ন :

সঠিক উত্তরের টিক (✓) চিহ্ন দিন

১. কোন বহুবচনটি সঠিক?

ক. আলোকমণ্ডলী খ. আলোকমালা

গ. সব আলোক ঘ. আলোকবৃন্দ

২. কোন বহুবচনবাচক শব্দগুলো কেবল প্রানিবাচক শব্দে ব্যবহৃত হয়?

ক. কুল, গণ, পাল খ. নিকর, দাম, গ্রাম

গ. দল, নিচয়, রাশি ঘ. সমূহ, দল, গুচ্ছ

৩. কোনটি অপ্রানিবাচক বহুবচনে ব্যবহৃত হয়?

ক. বৃন্দ খ. কুল

গ. বর্গ ঘ. গুচ্ছ

খ. রচনামূলক প্রশ্ন :

১. বহুবচন কাকে বলে উদাহরণসহ লিখুন।

২. প্রানিবাচক শব্দে যে সমষ্টিবাচক শব্দসমূহ যুক্ত হয়ে বহুবচন হয় এমন যে কোন পাঁচটি শব্দযোগে বাক্য রচনা করুন।

৩. বাংলা বহুবচনের নিয়ম অনুযায়ী নিচের শব্দগুলোর শুদ্ধরূপ লিখুন।

ক.শিক্ষকরাজি, খ. গরুমণ্ডলী, গ.বৃক্ষাবলী, ঘ. ফুলবৃন্দ, ঙ. বনসকল, চ. পাখিগণ, ছ. সুধিসমূহ।

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

উত্তর

১. খ ২. ক, ৩. ঘ ৪.ক শিক্ষকবৃন্দ খ. গুরুগুলি গ. বৃক্ষরাজি ঘ. ফুলরাজি ঙ. বনসমূহ চ. পাখিগুলি ছ. সুধিমণ্ডলী

১ ও ২নং প্রশ্নের উত্তর নিজেরা 'পাঠ-৩' পড়ে লিখুন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. নৈর্বিত্তিক প্রশ্ন :

সঠিক উত্তরে (✓) চিহ্ন দিন :

১. কোন বহুবচনটি কেবলউন্নত প্রাণীবাচক শব্দে ব্যবহৃত?

ক. কুল খ. জাল গ. গণ ঘ. সমূহ

২. কোনটি সঠিক?

ক. নক্ষত্রগণ খ. নক্ষত্রকুল গ. নক্ষত্রগুচ্ছ ঘ. নক্ষত্রমণ্ডলী

৩. শূন্যস্থান পূরণ করুন

ক. বাংলা ভাষায় বচন ----------।

খ. বহুবচনে ---------- সংখ্যা নির্দেশ করে।

গ. এক বচনে ---------- সংখ্যা বোঝায়।

ঘ. যা---------- বিষয় নয়, তার বচন হয় না।

৪. নিচের একবচনগুলোকে বহুবচন এবং বহুবচনকে এক বচনে পরিণত করুন।

আমি, তিনি, আপনি, তুমি, কে, যোদ্ধাবৃন্দ, পাখি, স্বজন, দিনগুলি

ক. রচনামূলক প্রশ্ন :

১. বচন কাকে বলে? বচন কত প্রকার ও কি কি? উদাহরণসহ লিখুন।

২. বাংলা ভাষায় কি কি উপায়ে একবচনকে বহুবচনে পরিণত করা যায় উদাহরণসহ লিখুন।

উত্তর

৩. ক. দুইপ্রকার, খ. একাধিক, গ. একটি ঘ. গণনার

৪.

একবচন	বহুবচন
আমি	আমরা
তিনি	তাঁরা
আপনি	আপনারা
তুমি	তোমরা
কে	কারা
যোদ্ধা	যোদ্ধাবৃন্ধ
পাখি	পাখিগুলো
স্বজন	স্বজনবর্গ
দিন	দিনদিন/দিনগুলো

১. গ, ২. ঘ

পদাশ্রিত নির্দেশক

ভূমিকা

পদাশ্রিত নির্দেশক বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত কতগুলো নির্দেশকবাচক চিহ্ন বা পদ। এটি বাংলা ব্যাকরণের রূপতত্ত্ব অংশে পড়ে। পদাশ্রিত নির্দেশকগুলো বচনভেদে বিভিন্ন রূপে পরিবর্তিত হয়। তাই ব্যাকরণে পদাশ্রিত নির্দেশক সম্পর্কে না জানলে অনেক সময় বাক্যে শব্দ ব্যবহার পরিপূর্ণ সঠিক হয় না। পদাশ্রিত নির্দেশকের গুরুত্ব তাই বাংলা ব্যাকরণে গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হয়।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

* পদাশ্রিত নির্দেশক সম্পর্কে একটি বিবরণ লিখতে পারবেন।

সংজ্ঞা :

বাংলা ভাষায় কতগুলো অব্যয় বা প্রত্যয়বাচক শব্দ আছে যেসব বিশেষ্য বা বিশেষণের পরে যুক্ত হয়ে এই শব্দগুলোকে নির্দিষ্ট করতে সাহায্য করে। এই ধরণের নির্দেশক শব্দ বা শব্দাংশকে পদাশ্রিত নির্দেশক বলে। বচনভেদে পদাশ্রিত নির্দেশকের ব্যবহারে পরিবর্তন আসে।

ক. সাধারণত একবচনে টা, টি, টে, খান, খানা, খানি, গাছ, গাছা, গাছি প্রভৃতি নির্দেশক প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়।

যেমন- বইটি, মেয়েটা, চিঠিখানা, কাপড়খানি, চুড়িগাছি, লাঠিগাছা, মালাগাছি ইত্যাদি।

খ. বহুবচনে সাধারণত গুলো, গুলো, গুলিন প্রভৃতি শব্দাংশ ব্যবহৃত হয়। যেমন - গরুগুলো, লোকগুলো ইত্যাদি।

গ. সংখ্যা বা পরিমাণের অল্পতা নির্দেশ করতে অনেক সময় টে, টুকু, টুকুন, টুক ইত্যাদি শব্দাংশের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন- চারটে ভাত, 'দুটো চাল দাও' (স্বল্প অর্থে), মুখটুকু, এতটুকুন ছেলে ইত্যাদি।

ঘ. পদাশ্রিত নির্দেশক যখন সংখ্যাবাচক পদের পরে বসে তখন অনির্দিষ্ট ভাব প্রকাশ পায়, কিন্তু বিশেষ্যের পরে বসলে সুনির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ পায়। যেমন-

যদি বলা হয় পাঁচখানা আম, এখানে যে কোন পাঁচটি আম হতে পারে, কিন্তু যদি বলা যায় আম পাঁচখানা তখন সুনির্দিষ্ট পাঁচটি আমকে বোঝায়।

পদাশ্রিত নির্দেশকের প্রয়োগ

১। একবচনে সাধারণত টা, টি, খানা, খানি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সংখ্যাবাচক এক বা এক যে আগে বসলে সংশ্লিষ্ট বস্তু, ব্যাক্তি বা প্রাণীকে নির্দিষ্টভাবে বোঝায়। যেমন- একটি বালক, একটি টেবিল, একটি পাখি, বললে যে কোন একটি বালক, টেবিল, বা পাখি হতে পারে। কিন্তু বিশেষ্য শব্দের পরে বসলে নির্দিষ্ট একজন বা একটি বস্তুকেই বোঝায়। যেমন - ছেলেটি খুব ভাল। মেয়েটি খুব সুন্দর, পাখিটি উড়ে গেল, কুকুরটা ডাকছে। টেবিলটা ভেঙে গেছে। প্রতিটি বাক্যে নির্দিষ্ট একটি ছেলে, একটি মেয়ে, একটি পাখি, একটি টেবিল বোঝাচ্ছে।

সাধারণত: অপ্রানিবাচক পদার্থের অখণ্ডতা বোঝাবার জন্যে টা, টি, যুক্ত হলেও উপরের উদাহরণে ব্যবহৃত আদর বা অনাদরের ভাব প্রকাশ করার জন্যেও টা, টি, র ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। কখনো তুচ্ছার্থে 'ট' শব্দার্থ ব্যবহৃত হয়। যেমন, মেয়েটি খুব মনোযোগী।

কিন্তু ছেলেটা একেবারে গোল্লায় গেছে। মানুষ ভিন্ন অন্য প্রানিবাচক শব্দে টা, টি-র ব্যবহার রয়েছে।

২। খান, খানা, খানি নির্দেশক প্রত্যয়গুলোর ব্যবহার সম্পর্কে কয়েকটি সাধারণ নিয়ম রয়েছে।

ক. 'জীব' সম্পর্কে এর ব্যবহার তেমন নেই, কিন্তু শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বেলায় এর ব্যবহারে বাধা নেই। যেমন - কেউ বালকখানা, ছাগলখানা, গরুখানি বলে না, কিন্তু দেহখানা, হাতখানি, পা খানা, ইত্যাদি বলা যায়।

খ. যে পদার্থ দেখা যায় না, ধরা যায়না সেসব ক্ষেত্রে খানা, খানির ব্যবহার নেই। যেমন -- আলোখানা, বাতাসখানা, রাসখানা এমন ব্যবহার কোথাও হয় না। কিন্তু ব্যতিক্রম রয়েছে। যেমন - মাঝে মধ্যে আমরা বলি; ভাবখানা যেন প্রধানমন্ত্রী; কিংবা লোকটির কথা বলার ধরনখানা ভাল নয়। মেয়েটার হাসিখানি কিন্তু চমৎকার ইত্যাদি ক্ষেত্রে খানা, খানি, খান প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়।

গ. যে সকল বস্তু তরল বা বিচ্ছিন্নভাবে থাকে, সেক্ষেত্রে এর ব্যবহার নেই। যেমন- তেলখানা, ধূলাখানি, জলখানা বলা যায় না।

ঘ. কিন্তু দৈর্ঘ্য প্রস্থ সম্বলিত বড় আয়তনবোধক শব্দকে চিহ্নিত করতে ব্যবহৃত হয়। যেমন- শাড়িখানা, গামছাখানি।

৩. ক. টু, টুকু, টুকুন, টুক এগুলো সাধারণত স্বল্পতাবাচক প্রত্যয়রূপে ব্যবহৃত হয়। সজীব পদার্থে এসব ব্যবহার হয় না। যেমন- কেউ গরুটুকু, কুকুর টুকুন, বিড়ালটুক বলে না। কিন্তু আদর করে কখনও বা আশ্চর্য হয়ে মানুষের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়।

খ. ক্ষুদ্র হলেও যে পদার্থের গঠন আছ সেক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় না। যেমন- 'দুলটুকু, নাকছাবিটুকু, ব্যবহার করা যায় না। কিন্তু সোনাটুকু বলা যায়।

গ. যে সমস্ত জিনিস টুকরো করলে বা বিচ্ছিন্ন করলেও তার বিশেষত্ব নষ্ট হয় না সে সমস্ত পদার্থের ক্ষেত্রে টুকু, টুকুন ব্যবহৃত হয়। যেমন- নদীতে থাকা অবস্থায় জল যেমন, এক ফোঁটা জলও জল, তেমনি কাগজ, কাপড় এসব টুকরো করলে, ছিঁড়ে ফেললেও আমরা কাগজ, কাপড়ই বলি, কারণ এদের বৈশিষ্ট্য একই থেকে যায়। তাই জলটুকু, দুধটুকুন, কাপড়টুকু, কাগজটুকু ইত্যাদি ক্ষেত্রে এই শব্দাংশ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু চেয়ারটুকু, সোফাটুকু বলা যাবে না।

ঘ. এই, ঐ, সেই, কত, এত, তত সর্বনামবাচক পদের সাথে ব্যবহৃত হয়ে ক্ষুদ্রার্থক সকল বিশেষ্যপদের বিশেষণ রূপে টুক, টুকুন, টুকু, ব্যবহৃত হয়। যেমন- "এই টুকু বাড়ি, ঐ টুকু গাড়ি, এতটুকু মানুষ।

ঙ. মাঝে অরুপ পদার্থেও এইসব পদাশ্রিত নির্দেশকের ব্যবহারে দেখা যায়। যেমন, "হাওয়াটুকু ভাল লাগছে।" "তার রাগটুকু দেখছো?" এই কৌশলটুকু না খাঁালেই ভাল হত। ইত্যাদি।

৪. ক. গাছ, গাছা, গাছি সাধারণত সরু বা চিকন এবং লম্বা জিনিসের ক্ষেত্রে এসব পদাশ্রিত নির্দেশকের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন- মালাগাছি, চুড়িগাছ, লাঠিগাছা, সুতোগাছি ইত্যাদি।

খ. সরু জিনিস লম্বায় ছোট হলে এসব নির্দেশক পদ ব্যবহৃত হয় না। যেমন- সুইগাছি, কাঁটা (উলের কাঁা) গাছা হয় না।

গ. জীববাচক পদার্থের এসব পদাশ্রিত নির্দেশকের ব্যবহার নেই। যেমন -সাপ, কেঁচো, লম্বা এবং সরু হলেও কেউ সাপগাছি, কেঁচোগাছা বলবে না।

৫. 'গোটা এক বচনবাচক শব্দটি আগে বসিয়ে খানা, খানি যোগ করে কোন জিনিসকে নির্দিষ্ট করা যায়। যেমন- গোটা আমখানা খেতে হবে কিন্তু।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১

ক. নৈর্বিত্তিক প্রশ্ন :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১। পদাশ্রিত নির্দেশক ব্যবহৃত হয়-

ক. প্রত্যয়ের মত　　খ. সমাসের মত

গ. বিভক্তির মত　　ঘ. বিশেষণের মত

২. গাছ, গাছা, গাছি পদাশ্রিত নির্দেশক ব্যবহৃত হয়

ক. সরু এবং লম্বা পদার্থের সাথে　　খ. সল্পার্থক পদার্থ বোঝাতে

গ. মোটা ও খাটো পদার্থের সাথে　　ঘ. তুচ্ছার্থক পদার্থে

৩. টা, টি, খানা গুলো

ক. বিশেষণ　　খ. পদাশ্রিত নির্দেশক

গ. সর্বনাম　　ঘ. উপসর্গ

খ. রচনামূলক প্রশ্ন :

১। পদাশ্রিত নির্দেশক বলতে কি বোঝেন? সংক্ষেপে উদাহরণসহ বুঝিয়ে দিন।

২। টা, টি, খানা, খানি, গাছা এই পদাশ্রিত নির্দেশকগুলো বাক্যে প্রয়োগ করে ব্যবহার বৈচিত্র্য নির্দেশ করুন।

৩। ডানপাশের শব্দগুলো থেকে উপযুক্ত শব্দ নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করুন :

ক. ফুলের মালা ---------- বিকোতে আসিয়াছি,

খ. ছাগল ----------র রঙ কালো।

গ. দুধ ---------- খেতে হবে।

ঘ. মেয়েটির মুখ ---------- ভারি সুন্দর।

ঙ. ভাব ---------- মোটেই ভাল নয়।

টুকু, খানি, খানা, গাছি, টা

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

উত্তরমালা

১। ক　২। খ.　৩। খ.

৩। ক. গাছি খ. টা, গ. টুকু ঘ. খানি ঙ. খানা

সমাস

ভূমিকা

বাংলা ভাষায় কয়েকটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শব্দ থেকে নতুন শব্দ তৈরি হয়। সমাস নতুন শব্দ গঠনের একটি প্রক্রিয়া। সমাসের মাধ্যমে নতুন শব্দ তৈরি হয়ে বাংলা ভাষাকে সুন্দর ও শ্রুতিমধুর করে তোলা হয়। সমাসের এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিস্তৃতভাবে জানার জন্য ব্যাকরণে এর আলোচনা প্রয়োজন।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

* সমাস কাকে বলে তা লিখতে পারবেন।
* বাংলা সাহিত্যে সমাসের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
* সমাস ও সন্ধির পার্থক্য লিখতে পারবেন।
* সমাস কত প্রকার তা বলতে ও লিখতে পারবেন।

সংজ্ঞা :

সমাস অর্থ সংক্ষেপ বা মিলন। অর্থের দিক থেকে পরস্পরের মধ্যে মিল বা সম্বন্ধ আছে এমন দুই বা দুইয়ের বেশি পদ মিলিত হয়ে যখন এক পদে পরিণত হয় তখন তাকে সমাস বলে। যেমন- রাজার কুমার = রাজকুমার। এখানে দুটিপদ রয়েছে। একটি রাজার অন্যটি কুমার। রাজার কুমার পদ দুটির যে অর্থ মিলিত পদ রাজ কুমারেরও একই অর্থ। দুটি পদ মিলে একপদ হওয়ায় অর্থের কোন পরিবর্তন হয়নি কিন্তু সংক্ষিপ্ত হয়েছে। অর্থাৎ সমাসে সেই পদগুলোকেই একপদে পরিণত করা যায়, যাদের মধ্যে অন্তনিহিত মিল রয়েছে। যেমন- মা মরেছে যার = মা-মরা।

সমাসের উদ্দেশ্য

বাংলা ভাষায় বাক্যে শব্দের ব্যবহার সংক্ষেপ করার জন্যই সমাসের সৃষ্টি। সমাসের ফলে শব্দ থেকে নতুন শব্দ তৈরি হয়। বক্তব্যের বিষয়টি সংক্ষেপ করে সুন্দর এবং সহজ করে বলা যায়। মনের অভিব্যক্তি সংক্ষেপে প্রকাশ করার একটি প্রক্রিয়া সমাস। সমাসের ব্যবহার বাংলা ভাষায় সংস্কৃত থেকে এসেছে। সাধুভাষায় সমাসবদ্ধ শব্দের ব্যবহার বেশি সেই তুলনায় চলিত ভাষায় সমাসবদ্ধ শব্দের ব্যবহার কম। প্রকৃতপক্ষে বলা যায় ভাষাকে সহজ, সুন্দর ও সাবলিল করে তুলতে সমাসের ব্যবহার অনস্বীকার্য। সমাস ভাষার শ্রুতিমাধুর্য বৃদ্ধি করে।

সমাসকে ভালভাবে বুঝতে হলে কতগুলো বিষয় জানা দরকার। নিচের ছকটি লক্ষ্য করুন।

সমস্যমান পদ
বিলাত হইতে ফেরত

১. যে মিলযুক্ত পদগুলো মিলে সমাস হয়, প্রত্যেকটি পদকে সমস্যমান পদ বলে। যেমন- বিলাত, হইতে, ফেরত এই প্রত্যেকটি পদকেই সমস্যমান পদ বলে।

২. বিলাত হইতে ফেরত- অর্থ বোঝাবার জন্যে সমস্তপদকে ভেঙে যখন একাধিক পদে প্রকাশ করা হয় তখন তাকে ব্যাস বাক্য বলে।

৩. সমাসযুক্ত পদের প্রথম অংশকে পূর্বপদ এবং পরবর্তী অংশকে পরপদ বলে। উপরের উদাহরণে 'বিলাত' পূর্বপদ এবং 'ফেরত' পরপদ।

৪. সমাস নিষ্পন্ন পদটির নাম সমস্ত পদ। উপরের উদাহরণে বিলাতফেরত হল সমস্তপদ।

সন্ধি ও সমাসের মধ্যে পার্থক্য

বাংলা ভাষায় সন্ধি এবং সমাস দুটোর সাহায্যেই নতুন শব্দ গঠিত হয়। কিন্তু দুটোর মধ্যে প্রক্রিয়াগত পার্থক্য রয়েছে। সন্ধিতে পাশাপাশি দুটি বর্ণের মিলন হয়। যেমন- বিদ্যা+আলয় = বিদ্যালয়।

এখানে আ+আ দুটি বর্ণমিলে একটি 'আ' বর্ণ পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়েছে।

কিন্তু সমাসের ক্ষেত্রে, বিদ্যার আলয় = বিদ্যালয়

এখানে বিদ্যা এবং আলয় দুটি ভিন্নপদ এক হয়ে পূর্বপদের 'র' বিভক্তি লোপ পেয়ে বিদ্যালয় হয়েছে।

বাংণা ভাষায সমাস প্রধানতঃ ছয় প্রকার। যথা-

১. দ্বন্দ্ব সমাস

২. তৎপুরুষ সমাস

৩. দ্বিগু সমাস

৪. কর্মধারয় সমাস

৫. অব্যয়ীভাব সমাস

৬. বহুব্রীহি সমাস

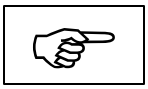

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। পরস্পর সম্বন্ধ একাধিক পদকে একপদে পরিণত করার নাম-

ক. সন্ধি　　খ. বচন

গ. সমাস　　ঘ. দ্বিরুক্ত শব্দ

২। সমাসের উদ্দেশ্য কি?

ক. পদের মিলন　　খ. সংক্ষেপে বেশি ভাব প্রকাশ করা

গ. শব্দকে অলঙ্কার বহুল করা　　ঘ. বাক্যকে দীর্ঘ করা

৩। সমস্যমান পদের প্রথম অংশকে বলে

ক. পরপদ　　খ. পূর্বপদ

গ. সমস্তপদ　　ঘ. ব্যাসবাক্য

৪। সমস্যমান পদের শেষাংশকে বলে

ক. বিভক্তি　　খ. পূর্বপদ

গ. বিগ্রহবাক্য　　ঘ. পরপদ

৫। সমাস কত প্রকার?

ক. দুই প্রকার　　খ. পাঁচ প্রকার

গ. ছয় প্রকার　　ঘ. সাত প্রকার

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

উত্তর

১. গ,　　২.খ,　　৩. খ,　　৪. ঘ　　৫. গ

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

* দ্বন্দ্ব সমাস কাকে বলে তা লিখতে পারবেন।
* দ্বন্দ্ব সমাস গঠনের নিয়ম ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
* দ্বন্দ্ব সমাস কত প্রকার তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সংজ্ঞাঃ

দ্বন্দ্ব শব্দের অর্থ জোড়া। যে সমাসে দুই বা ততোধিক পদ মিলে একপদ হয় এবং উভয়পদের অর্থই প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন- ভাই ও বোন = ভাইবোন। ফল ও মূল = ফলমূল। কাগজ ও পত্র = কাগজপত্র। কেনা ও বেচা = কেনাবেচা ইত্যাদি। দ্বন্দ্বসমাস পূর্বপদ এবং পরপদ ও আর ইত্যাদি সংযোজক অব্যয় দ্বারা যুক্ত হয়। উপরে উল্লেখিত প্রত্যেকটি উদাহরণে দুটো পদ 'ও' সংযোজক অব্যয় দ্বারা যুক্ত হয়েছে এবং পূর্বপদ এবং পরপদ সমানভাবে প্রাধান্য পেয়েছে।

দ্বন্দ্ব সমাসের কিছু নিয়ম :

১. দ্বন্দ্ব সমাস অল্পস্বর বিশিষ্ট এবং উচ্চারণে ও বানানে যে পদটি ছোট সেই পদটি সাধারণত শব্দের পূর্বে বসে। যেমন-

জমা ও খরচ = জমা খরচ

মুড়ি ও মুড়কি = মুড়িমুড়কি

লাভ ও লোকসান = লাভলোকসান

২. দ্বন্দ্ব সমাসে গৌরববোধক বা সম্মানিত পদ এবং স্ত্রীবাচক শব্দ পূর্বে বসে। যেমন-

দেব ও দ্বিজ = দেবদ্বিজ

মাতা ও পিতা = মাতাপিতা

গুরু ও শিষ্য = গুরুশিষ্য

রাজা ও প্রজা = রাজাপ্রজা

৩. দুটি সমান স্বর বিশিষ্ট পদের 'আ'কারান্ত শব্দ পূর্বে বসে। যেমন- খোকা ও খুকু = খোকা খুকু, গোলা ও গুলি = গোলাগুলি, কানা ও ঘুষা = কানাঘুষা।

৪. হসন্তযুক্ত শব্দ আগে বসে। যেমন-

নদ্ ও নদী = নদনদী

দাস্ ও দাসী = দাসদাসী

খাল্ ও বিল = খালবিল।

দ্বন্দ্ব সমাস কয়েক প্রকারের হতে পারে। যেমন–

১. মিলনার্থক শব্দ যোগে – ভাইবোন, মা-বাপ, জ্বিন-পরী, দীন-দুঃখী ইত্যাদি।

২. বিরোধার্থক শব্দ যোগে – চোর-পুলিশ, স্বর্গ-নরক, দা-কুমড়া, অহি-নকুল ইত্যাদি।

৩. বিপরীতার্থক শব্দের মিলনে – শত্রু-মিত্র, রাজা-প্রজা, সৎ-অসৎ, পাপ-পুণ্য, আয়-ব্যয়, জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি।

৪. সমার্থক শব্দের মিলনে – হাট-বাজার, ধন-দৌলত, রাজা-বাদশা, বই-পুস্তক ইত্যাদি।

৫. সংখ্যাবাচক শব্দের মিলনে – সাত-সতের, উনিশ-বিশ, নয়-ছয়, সাত-পাঁচ ইত্যাদি।

৬. অঙ্গবাচক শব্দের মিলনে – মাথা-মুণ্ডু, হাত-পা, নাক-মুখ, চোখ-কান, মুখ-চোখ ইত্যাদি।

৭. দুটো বিশেষ্য পদ যোগে – রাজা-রানী, ভাই-বোন, মা-বাবা ইত্যাদি।

৮. দুটো বিশেষণ পদের মিলনে – সত্য-মিথ্যা, উঁচু-নিচু, ভাল-মন্দ ইত্যাদি।

৯. দুটো সর্বনাম পদের মিলনে – যা-তা, যেমন-তেমন, যে-সে, যথা-তথা, যেখানে-সেখানে ইত্যাদি।

১০. দুটো ক্রিয়াপদের মিলনে – লেখাপড়া, চলা-ফেরা, আসা-যাওয়া ইত্যাদি।

অলুক দ্বন্দ্ব সমাস

যে দ্বন্দ্ব সমাসে পদের বিভক্তি লোপ পায় না তাকে অলুক দ্বন্দ্ব বলে। যেমন- দুধে ও ভাতে = দুধেভাতে, হাতে ও কলমে = হাতেকলমে, পথে ও ঘটে = পথে-ঘাটে ইত্যাদি।

বহুপদী দ্বন্দ্ব সমাস

দুইয়ের অধিক পদ মিলে যে দ্বন্দ্বসমাস হয় তাকে বহুপদী দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন- ইট, কাঠ ও পাথর = ইট-কাঠ-পাথর, সাহেব, বিবি ও গোলাম = সাহেব-বিবি-গোলাম, টাকা, আনা ও পাই = টাকা-আনা-পাই ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ২

শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. দ্বন্দ্ব সমাসে -------- অর্থের প্রাধান্য থাকে।

২. --------বিভক্তিলোপ পায় না।

৩. অল্পস্বর বিশিষ্ট শব্দ -------- বসে।

৪. সম্মানবাচক শব্দ -------- বসে।

৫. দুইয়ের অধিক পদ মিলে যে সমাস হয় তাকে --------।

সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১. বিপরীতার্থক শব্দের মিলনে কোন দ্বন্দ্বসমাসটি গঠিত?

ক. ভাই-বোন　　খ. ধন-দৌলত

গ. আয়-ব্যয়　　ঘ. দা-কুমড়া

২. কোনটি শুদ্ধ?

ক. প্রজারাজা　　খ. রাজা-প্রজা

গ. রাজার প্রজা　　ঘ. প্রজার রাজা

৩. কোন দ্বন্দ্ব সমাসটি দুটি বিশেষণ যোগে গঠিত?

ক ভালমন্দ　　খ. মাতাপিতা

গ. লেখাপড়া　　ঘ. চলাফেরা

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

উত্তর

শুন্যস্থান পুরন :

১. উভয়পদের　　২. অলুকদ্বন্দ্বে　　৩. পূর্বে　　৪. পূর্বে,

৫. বহুপদী দ্বন্দ্ব সমাস বলে।

সঠিক উত্তরের টিক চিহ্ন

১. গ,　২.খ, ৩. ক

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

* তৎপুরুষ সমাসের সংজ্ঞা লিখতে ও বলতে পারবেন।
* বিভিন্ন তৎপুরুষ সমাসের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

তৎপুরুষ একটি সমাসবদ্ধ শব্দ। এর ব্যাসবাক্য-তস্য পুরুষ।

সংজ্ঞা

যে সমাসে পূর্বপদের (দ্বিতীয়া থেকে সপ্তমী পর্যন্ত বিভক্তি থাকতে পারে) বিভক্তি লোপ পায় এবং পরপদের অর্থ প্রাধান্য পায়, তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে।

পূর্বপদে যে বিভক্তিটি লোপ পায় সে বিভক্তি অনুসারে তৎপুরুষ সমাসের নামকরণ করা হয়। যেমন-

১. চায়ের বাগান = চাবাগান

২. গাছে পাকা = গাছ পাকা

প্রথমে উদাহরণে ৬ষ্ঠী বিভক্তি লোপ পেয়েছে, তাই এটি ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস।

দ্বিতীয় উদাহরণে সপ্তমী বিভক্তি লোপ পাওয়ায় এটি সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস।

দুটি উদাহরণেই দেখা যাচ্ছে পূর্বপদ নয়, পরপদের অর্থই প্রাধান্য পেয়েছে।

তৎপুরুষ সমাস নয় প্রকার :

১. দ্বিতীয়া তৎপুরুষ,

২. তৃতীয়া তৎপুরুষ,

৩. চতুর্থী তৎপুরুষ,

৪. পঞ্চমী তৎপুরুষ,

৫. ষষ্ঠী তৎপুরুষ,

৬. সপ্তমী তৎপুরুষ,

৭. নঞ তৎপুরুষ,

৮. উপপদ তৎপুরুষ,

৯. অলুক তৎপুরুষ

১। **দ্বিতীয়া তৎপুরুষ :** পূর্বপদে দ্বিতীয়া বিভক্তি (কে. রে) লোপ পেয়ে যে সমাস হয় তাকে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন-

বইকে পড়া = বইপড়া

ভাতকে রাঁধা = ভাতরাঁধা

ব্যাপ্তি অর্থে কালবাচক পদের সাথে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ হয়। যেমন-

চিরকাল ব্যাপিয়া সুখ=চিরসুখ

ক্ষণকাল ব্যাপিয়া স্থায়ী = ক্ষণস্থায়ী

চিরদিন ধরিয়া শত্রু = চিরশত্রু

২। **তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস :** পূর্বপদে তৃতীয়া বিভক্তি (দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক) লোপ পেয়ে যে সমাস হয় তাকে তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন-

ঢেঁকি দ্বারা ছাটা = ঢেঁকিছাটা

মন দিয়ে গড়া = মনগড়া

ঘি দিয়ে ভাজা = ঘিভাজা

এমনি, শান-বাঁধানো, জুতো-পেটা, মধুমাখা, বজ্রাহত, শ্রমলব্ধ, পদাঘাত, মোহান্ধ ইত্যাদি।

৩। **চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস :** পূর্বপদে চতুর্থী বিভক্তি (কে. রে, জন্য নিমিত্ত, তবে) লোপ পেয়ে যে সমাস হয় তাকে চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন-

তীর্থের উদ্দেশ্যে যাত্রা = তীর্থযাত্রা

দেবকে দত্ত = দেবদত্ত

গুরুকে ভক্তি = গুরুভক্তি

ডাকের নিমিত্তে মাশুল = ডাকমাশুল।

এমন, ছাত্রাবাস, দূতাবাস, আরাম কেদারা, বসতবাটি, মরাকান্না ইত্যাদি।

৪। **পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস :** পূর্বপদে পঞ্চমী বিভক্তি (হইতে, বা হতে, থেকে) পূর্বপদে লোপ পেয়ে যে সমাস হয় তাকে পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস বলে। কোন কোন ৫মী তৎপুরুষে এর, চেয়ে প্রভৃতি অনুসর্গ ব্যবহৃত হয়। যেমন-

রোগ হতে মুক্ত = রোগমুক্ত

স্কুল থেকে পালানো = স্কুল পালানো

পরানের চেয়ে প্রিয় = পরানপ্রিয়।

এরূপ, জন্মান্ধ, দুগ্ধজাত, পদচ্যুত, রাজচ্যুত, যুদ্ধোত্তর, ক্ষমতাচ্যুত ইত্যাদি।

৫। **ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস :** পূর্বপদে ষষ্ঠী বিভক্তি (র, এর) লোপ পেয়ে যে সমাস হয় তাকে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন-

রান্নার ঘর = রান্নাঘর

বটের তলা = বটতলা

পথের মাঝ = মাঝপথ

এমনি, রাজহংস, পিতৃতুল্য, দেশসেবা, ধানক্ষেত, খেয়াঘাট ইত্যাদি। ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসের ক্ষেত্রে কয়েকটি নিয়ম জেনে রাখা দরকার।

১. 'রাজা'র জায়গায় 'রাজ' পিতা, মাতা, ভ্রাতার স্থানে সমস্তপদে যথাক্রমে পিতৃ, মাতৃ, ভ্রাতৃ হবে।

রাজার কুমার = রাজকুমার

পিতার স্নেহ = পিতৃস্নেহ

মাতার হৃদয় = মাতৃহৃদয়

২. সহ, তূল্য, প্রতিম, প্রায় ইত্যাদি শব্দ যোগে ষষ্ঠী তৎপুরুষ হয়। যেমন-

গুরুর তূল্য = গুরুতূল্য

অনুজের প্রতিম =অনুজ প্রতিম

ভ্রাতার সহ = ভ্রাতৃসহ

পিতারসম = পিতৃসম

৩. পূর্বপদের 'ঈ' কার 'ই' কারে পরিণত হয়। যেমন-

প্রাণীর বিজ্ঞান = প্রাণিবিজ্ঞান

স্বামীর গৃহ = স্বামিগৃহ

৪. পরপদে 'রাজা' শব্দ থাকলে সমস্তপদে আগে বসবে এবং 'আ' কার বিলুপ্ত হবে। যেমন-

হাঁসের রাজা = রাজহাস

পথের রাজা = রাজপথ

৫. পরে অর্ধ থাকলে সমস্তপদে অর্ধ আগে বসবে। যেমন -

পথের অর্ধ = অর্ধপথ

জীবনের অর্ধ = অর্ধজীবন।

৬. দুগ্ধ, শিশু, ডিম্ব, শাবক ইত্যাদি শব্দ পরপদে থাকলে সমস্তপদে স্ত্রী লিঙ্গে পরিবর্তিত হয়ে তা পূর্বপদে বসে। যেমন- হরিনীর শিশু = হরিণশিশু

ছাগীর দুগ্ধ = ছাগদুগ্ধ

হংসীর ডিম্ব = হংসডিম্ব

৭. পরপদে রাজি, পুঞ্জ, গ্রাম, বৃন্দ, সুখ প্রভৃতি সমষ্টিবাচক শব্দযোগেও ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন-

হস্তীরযুথ= হস্তীযুথ

শিক্ষকের বৃন্দ = শিক্ষকবৃন্দ

৬. **সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস :** পূর্বপদে সপ্তমী বিভক্তি (এ, য়, তে) লোপ পেয়ে যে সমাস হয় তাকে সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন-

অকালে মৃত= অকালমৃত

জলে মগ্ন = জলমগ্ন

দিবায় নিদ্রা = দিবানিদ্রা

অনেক সময় বহুর মধ্যে একজনের শ্রেষ্ঠত্ব বা উৎকর্ষতা বোঝাতেও সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন-

কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ = কবিশ্রেষ্ঠ

পুরুষের মধ্যে উত্তম = পুরুষোত্তম।

সপ্তমী তৎপুরুষে ব্যাসবাক্যে সময় শব্দ থাকলে সমস্ত পদে তা আগে বসে। যেমন-

পূর্বেভূত = ভূতপূর্ব

পূর্বে অশ্রুত= অশ্রুত পূর্ব

৭. **নঞ তৎপুরুষ সমাস :** নিষেধাত্মক নঞ অব্যয় (না, ন, নেই, নয় ইত্যাদি) পূর্বপদে বসে যে সমাস হয় তাকে নঞ তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন-

ন মিল = অমিল

ন জ্ঞান = অজ্ঞান

ন আদর = অনাদর।

এরূপ অনিচ্ছা, নিখুঁত, অবাধ্য, অসুখ, অদৃষ্ট, অনাধিক ইত্যাদি। 'নঞ' বাচক অব্যয়ের পর স্বরবর্ণ থাকলে 'অন' এবং ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলে সাধারণত 'অ' বা 'আ' হয়। যেমন-

ন অধিক = অনধিক

ন বাধ্য = অবাধ্য

ন কাল = আকাল

ন ধোয়া = আধোয়া

৮. **উপপদ তৎপুরুষ সমাস :** উপপদ তৎপুরুষ কাকে বলে তা জানার আগে জানতে হবে উপপদ এবং কৃদন্ত পদ কাকে বলে। কোন শব্দকে বিশ্লেষণ করলে যদি প্রথমে একটি পদ, তার পর একটি ধাতু এবং শেষে একটি প্রত্যয় পাওয়া যায় তাহলে সেই আদি পদকে উপপদ বলে।

ধামাধরা = ধামা+ধর+আ, এখানে 'ধামা' উপপদ, ধর, ধাতু, এর সঙ্গে 'আ' প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে। ধরে তাই ধাতু বা কৃদন্ত পদ। অর্থাৎ যে শব্দে কাজ করা বোঝায় তাই কৃদন্ত পদ।

সংজ্ঞা : যে সমাসে উপপদের সঙ্গে কৃদন্ত পদের সমাস হয় তাকে উপপদ তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন-

বর্ণচোরা = বর্ণ চুরি করে যে।

বর্ণ + ✓ চুর + আ

↓ ↓ ↓

উপপদ ধাতু প্রত্যয়

কৃদন্তশব্দ

এমনি, ছেলে ধরে যে = ছেলেধরা

পকেট মারে যে = পকেটমার

পঙ্কে জন্মে যে = পঙ্কজ

এমনি, ঠকানো, মনোলোভা, ঘরছাড়া, গা-সহা, ভাত খেকো, কুম্ভকার, সূত্রধর, শাস্ত্রকার ইত্যাদি।

৯। **অলুক তৎপুরুষ সমাস :** যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের বিভক্তি লোপ পায়না তাকে অলুক তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন-

তেলেভাজা = তেলেভাজা

গরুর গাড়ি = গরুরগাড়ি

মাটির মানুষ = মাটির মানুষ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৩

ক. নৈর্বিত্তিক প্রশ্ন :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। তৎপুরুষ সমাস কত প্রকার?
ক. ছয় প্রকার খ. নয় প্রকার
গ. পাঁচ প্রকার ঘ. চার প্রকার

২। কোনটি তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ?
ক. মা-বাবা খ. গাছপাকা
গ. দশানন ঘ. নীলাকাশ

৩। কোনটি উপপদ তৎপুরুষের উদাহরণ?
ক. কুম্ভকার খ. রাজকুমার
গ. চা বাগান ঘ. দেবদত্ত

৪। কোনটি নঞ তৎপুরুষ সমাস?
ক. ছেলেধরা খ. শ্রমলব্ধ
গ. গায়ে হলুদ ঘ. অজ্ঞান

৫। কোনটি অলুক তৎপুরুষ সমাস?
ক. জলমগ্ন খ. হংসডিম্ব
গ. পকেটমার ঘ. তেলেভাজা

৬। কোনটি চতুর্থী তৎপুরুষের উদাহরণ?
ক. গুরুদত্ত খ. শ্রমলব্ধ
গ. বস্তাপঁচা ঘ. পদচ্যুত

খ. রচনামূলক প্রশ্ন :

১। তৎপুরুষ সমাস কাকে বলে উদাহরণসহ লিখুন।

২। উপপদ এবং কৃদন্তপদ কাকে বলে উদাহরণহ ব্যাখ্যা করুন।

৩. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় করুন
গৃহবাস, সাহিত্যের বিশারদ, গৃহশিশু, শোকাকুল, বসতবাড়ি, বজ্রাহত, যাদুকর, অনৈক্য, চোখেরবালি।

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

উত্তর

১. খ, ২. খ, ৩. ক, ৪. ঘ, ৫. ঘ, ৬. ক

গৃহবাস = গৃহেবাস	সপ্তমী তৎপুরুষ
সাহিত্যবিশারদ = সাহিত্যের বিশারদ	৬ষ্ঠী তৎপুরুষ
গৃহ শিশু = গৃহের শিশু	৬ষ্ঠী তৎপুরুষ
শোকাকুল = শোকদ্বারা আকুল	৩য়া তৎপুরুষ
বসতবাড়ি = বসতের জন্য বাড়ি	চতুর্থী তৎপুরুষ
বজ্রাহত = বজ্র দ্বারা আহত	তৃতীয়া তৎপুরুষ
যাদুকর = যাদু করে যে	উপপদ তৎপুরুষ
অনৈক্য = ন ঐক্য	নঞ তৎপুরুষ
চোখের বালি= চোখের বালি	অলুক তৎপুরুষ

পাঠ ৪

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

* দ্বিগু সমাসের সংজ্ঞা লিখতে পারবেন।

সংজ্ঞা :

যে সমাসে পূর্বপদটি সংখ্যাবাচক বিশেষণ এবং পরপদটি বিশেষ্য হয় তাকে দ্বিগু সমাস বলে।

সংস্কৃতে দ্বিগু শব্দটি একটি সমাসবদ্ধ পদ, 'দ্বি' শব্দটির অর্থ দুই এবং 'গো' (বিকারে গু) = গরু। কিন্তু দ্বিগু শব্দের অর্থ দুটি গরু নয়, দুটি গরুর মূল্যে যে বস্তু কেনা হয় তাকেই দ্বিগু বলে। দ্বিগু সমাসে সংখ্যাবাচক শব্দটি সমাহার বা সমষ্টিকে বোঝায়। যেমন-

চৌরাস্তা = চার রাস্তার সমাহার।

সপ্তর্ষি= সপ্ত ঋষির সমষ্টি।

ত্রিকাল = তিনকালের সমাহার।

সপ্তাহ = সপ্ত অহের সমাহার।

শতাব্দী = শত অব্দের সমাহার ইত্যাদি।

ঠিক তেমনি

পঞ্চবটী, ত্রিপদী, পঞ্চভূত, তেপান্তর, পঞ্চনদ, ষড়ঋতু।

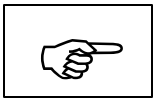

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের যে সমাস হয় তার নাম

ক. তৎপুরুষ　　খ. বহুব্রীহি

গ. দ্বন্দ্ব　　ঘ দ্বিগু

২। দ্বিগু সমাস কোন অর্থে ব্যবহৃত হয় ?

ক. মিলন অর্থে　　খ. সমাহার অর্থে

গ. বিপরীত অর্থে　　ঘ. পরিবর্তন অর্থে

৩। ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় করুন :

ক. তেমাথা, ষড়ঋতু, অষ্টধাতু, পসুরী, দ্বিপ্রহর, সেতার।

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

উত্তর

১. ঘ,　২. খ

৩।

সমস্তপদ		ব্যাসবাক্য
তেমাথা	=	তিন মাথার সমাহার
ষড়ঋতু	=	ষড় ঋতুর সমাহার
অষ্টধাতু	=	অষ্টধাতুর সমাহার
পসুরী	=	পাঁচ সেরের সমাহার
দ্বিপ্রহর	=	দুই প্রহরের সমাহার
সেতার	=	তিন তারের সমাহার

পাঠ ৫

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

* কর্মধারয় সমাসের সংজ্ঞা লিখতে পারবেন।
* কর্মধারয় সমাস সম্পর্কে কতগুলো নিয়ম ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
* কর্মধারয় সমাস কত প্রকার ও কি কি তা বলতে পারবেন।

সংজ্ঞা :

পরস্পর সম্বন্ধ বিশিষ্ট বিশেষণ ও বিশেষ্য পদে কিংবা বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ মিলে যে সমাস হয় এবং যাতে পরপদের অর্থই প্রাধান্য পায় তাকে কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন -

খাস যে মহল = খাসমহল

খাস	যে	মহল	= খাসমহল
↓		↓	
বিশেষণ		বিশেষ্য	

কালো যে পেঁচা = কালোপেঁচা

লাল যে ফুল = লালফুল

কর্মধারয় সমাসের কতগুলো নিয়ম

১. কর্মধারয় সমাসের ব্যাসবাক্যে সাধারণত বিশেষণ পদ আগে বসে।

২. কখনো কখনো বিশেষ্য পদ আগে বসে।

কর্মধারয় সমাস প্রধানত চার প্রকার

১. মধ্যপদলোপী কর্মধারয়;

২. উপমান কর্মধারয়;

৩. উপমিত কর্মধারয়;

৪. রূপক কর্মধারয়।

১. **মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস :** যে কর্মধারয় সমাসে ব্যাসবাক্যের মধ্যপদটি লোপ পায় তাকে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন-

পল (মাংস) মিশ্রিত যে অন্ন = পলান্ন

স্বর্ণের মত উজ্জ্বল যে অক্ষর = স্বর্ণাক্ষর

ছায়া প্রধান যে তরু = ছায়াতরু

ঠিক এমনি, জীবনবীমা, সিংহাসন, নাতজামাই, বনফুল, আয়কর, চালকুমড়া।

২. **উপমান কর্মধারয় :** উপমান এবং উপমিত কর্মধারয় সমাস সম্পর্কে জানতে হলে কয়েকটি বিষয় জানা দরকার।

ক. যার সাথে কোন কিছুর তুলনা করা হয় তাকে উপমান বলে।

খ. যার তুলনা করা হয় তাকে বলে উপমিত বা উপমেয়।

গ. উপমান এবং উপমেয় এই দুইয়ের মাঝের যে সাধারণ গুণ প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্যের জন্য পরস্পরের তুলনা করা হয় তাকে সাধারণ ধর্ম বলে।

নিচে একটি উদাহরণ দিয়ে শব্দগুলো স্পষ্ট করা হল :

সিঁদুরের মতো রাঙা যে মেঘ = সিদুর-রাঙা-মেঘ

এখানে সিঁদুর উপমান, কারণ সিঁদুরের সাথে মেঘের তুলনা করা হয়েছে।

'মেঘ' উপমিত বা উপমেয়, কারণ মেঘকে তুলনা করা হয়েছে।

'রাঙা' সাধারণ ধর্ম। কারণ সিঁদুরের রঙ লাল এবং সন্ধ্যার আকাশের মেঘের রঙও লাল। মেঘ এবং সিঁদুরের একই বৈশিষ্ট্যের জন্যেই পরস্পরের তুলনা করা হয়েছে।

উপমাবাচক বিশেষ্য পদের সাথে যখন সাধারণ ধর্মবাচক বিশেষণ পদের সমাস হয় তাকে উপমান কর্মধারয় সমাস বলে। এখানে উপমিত বা উপমেয় পদের কোন উল্লেখ থাকে না। যেমন-

উপমান		সাধারণ ধর্ম	
↓		↓	
অরুণের	ন্যায়	রাঙা =	অরুণরাঙা

মিশের ন্যায় কালো = মিশকালো

গরুর মত বেচারা = গোবেচারা

শশকের ন্যায় ব্যস্ত = শশব্যস্ত।

ঠিক এমনি; তুষারসাদা, শঙ্খধবল, ঘনশ্যাম, হস্তিমূর্খ, বিড়ালতপস্বী, নিমতিতা ইত্যাদি।

৩. উপমিত কর্মধারয় : উপমানবাচক পদের সাথে উপমিত পদের যে সমাস হয় তাকে উপমিত কর্মধারয় সমাস বলে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ এ সমাসে সমস্যমান পদের দুটো পদই বিশেষ্য হয়, কিন্তু উপমানবাচক পরপদটি বিশেষণবাচকের রূপ লাভ করে। এখানে সাধারণ ধর্মের উল্লেখ থাকে না। যেমন-

কর	পল্লবের	ন্যায়	= কর পল্লব
↓	↓	↓	
উপমেয়	উপমান		

বাহু লতার ন্যায় = বাহুলতা

মুখ চন্দ্রের ন্যায় = মুখচন্দ্র

ফুলের ন্যায় কুমারী = ফুলকুমারী।

তেমনি-অধরপল্লব, নরসিংহ, নয়নকমল, অধরবিম্ব, সোনামুখ ইত্যাদি।

৪. রূপক কর্মধারয় সমাসঃ উপমান এবং উপমেয়কে অভিন্ন কল্পনা করে যে সমাস হয় তাকে রূপক কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন-

জ্ঞান রূপ বৃক্ষ = জ্ঞানবৃক্ষ।

বিষাদ রূপ সিন্ধু = বিষাদসিন্ধু।

প্রাণ রূপ পাখি = প্রাণপাখি।

তেমনি সংসার সাগর, বিদ্যাধন, দেহপিঞ্জর ইত্যাদি।

নিচে দুটো উদাহরণ দেখা হল

ব্যাসবাক্য	সমস্তপদ	সমাসের নাম
ক. মুখ রূপ চন্দ্র =	মুখচন্দ্র =	রূপক কর্মধারয় সমাস
খ. মুখ চন্দ্রের ন্যায় =	মুখচন্দ্র =	উপমিত কর্মধারয়

উপরের উদাহরণ দুটোতে সমস্তপদ এক হলেও ব্যাসবাক্য এক নয়; সে কারণে দুটো আলাদা সমাস হয়েছে। প্রথম (ক) উদাহরণে মুখ এবং চন্দ্রের মাঝে কোনও পার্থক্য করা হয়নি বলে এটা রূপক কর্মধারয়। কিন্তু (খ) উদাহরণের ব্যাসবাক্যে মুখকে চন্দ্রের মত বলা হয়েছে; চন্দ্রের সঙ্গে অভিন্ন কল্পনা করা হয়নি। এ কারণে এটা উপমিত কর্মধারয় সমাস হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন অনেক সমাসই ব্যাসবাক্যের কারণে ভিন্ন সমাস হতে পারে। যেমন-

সমস্তপদ	চা জন্মে যে বাগানে - মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
চা-বাগান	চায়ের বাগান - ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস

কর্মধারয় সমাস কয়েক প্রকারের হতে পারে

১. দুটি বিশেষণ পদের মিলনে একটি বিশেষ্যকে বোঝায়। যেমন-

শান্ত শিষ্ট, চালাক-চতুর, হৃষ্টপুষ্ট

২. দুটি বিশেষ্য পদেএকই ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝায়। যেমন-

যিনি দাদা তিনি ঠাকুর = দাদা ঠাকুর

এমনি, মৌলভী সাহেব, দেবর্ষি, রাজর্ষি, নরদেবতা ইত্যাদি।

৩. কর্মধারয় সমাসের পূর্বপদে মহৎ বা মহান শব্দ থাকলে সমস্তপদে সেটি মহা হয়, এবং পরপদে 'রাজা' শব্দ সমস্তপদে 'রাজ' হয়। যেমন-

মহান যে রাজা = মহারাজ;

মহৎ যে অরণ্য = মহারণ্য;

মহান যে নবী = মহানবী।

৪. পূর্বপদে সুন্দর স্থলে 'সু' এবং কুৎসিত স্থানে 'কু' বা কদ্ হয়। যেমন-

সুন্দর যে নিয়ম = সুনিয়ম;

কুৎসিত আকার= কদাকার;

কু যে আচার = কদাচার;

কুৎসিত যে কথা = কুকথা।

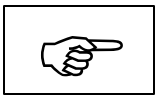

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৫

ক. নৈর্বিত্তিক প্রশ্ন :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। কোনটি মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ?

ক. মুখচন্দ্র খ. বনফুল

গ. শান্তশিষ্ট ঘ. তেমাথা

২। কোনটি উপমান কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ?

ক. গোবেচারা খ. বাহুলতা

গ. বিষাদসিন্ধু ঘ. ঠাকুরদাদা

৩। কর পল্লবের ন্যায় ব্যাসবাক্যটি কোন সমাসের উদাহরণ?

ক. উপমান খ. উপমিত

গ. রূপক ঘ. মধ্যপদলোপী

খ. রচনামূলক প্রশ্ন :

১. কর্মধারয় সমাস কত প্রকার ও কি কি উদাহরণসহ লিখুন।

২. সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করুন-

ক. যে কর্মধারয় সমাসে মধ্যপদ লোপ পায় তাকে .....।

খ. যার সঙ্গে তুলনা করা হয় তাকে .....।

গ. উপমান এবং উপমেয়কে অভেদ কল্পনা করা হলে তাকে .....।

ঘ. 'তুষার ধবল' ..... সমাসের উদাহরণ।

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

উত্তর

১. খ ২. ক ৩. খ

২। ক. মধ্যপদলোপী, খ. উপমান পদ বলে, গ. রূপক কর্মধারয় ঘ. উপমান কর্মধারয়।

পাঠ ৬

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

* অব্যয়ীভাব সমাসের সংজ্ঞা লিখতে পারবেন।
* কি কি উপায়ে অব্যয়ীভাব সমাস হয় তা লিখতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সংজ্ঞা :

যে সমাসের পূর্বপদে অব্যয় থাকে এবং পূর্বপদের অর্থই প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয় তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে। যেমন-

কূলের সমীপে = উপকূল;

কর্ণ পর্যন্ত = আকর্ণ;

মরণ পর্যন্ত = আমরণ;

অব্যয়ীভাব সমাসে অব্যয় পদটি সামীপ্য, বীপ্সা (পুনঃ পুনঃ অর্থে),অনতিক্রম, অবধি, সাদৃশ্য, যোগ্যতা, অভাব প্রভৃতি অর্থে প্রকাশ পায়।

নিচে অব্যয়ীভাব সমাসের অব্যয় পদটি বন্ধনীর ভেতরে দেয়া হল।

১। সামীপ্য (উপ) নগরের সমীপে = উপনগর
কণ্ঠের সমীপে = উপকণ্ঠ
কূলের সমীপে =উপকূল ইত্যাদি

২। অভাব (নি: নির) বিঘ্নের অভাব= নির্বিঘ্ন
আমিষের অভাব =নিরামিষ
শ্রীর অভাব =বিশ্রী,
এমনি, বেহায়া, হাভাতে, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি।

৩। বীপ্সা(পুনঃ পুনঃ) = ক্ষণে ক্ষণে = প্রতিক্ষণ
দিন দিন =প্রতিদিন
এভাবে প্রতিজন, প্রতিঘর, প্রত্যহ ইত্যাদি।

৪। পর্যন্ত (অবধি, আ) কণ্ঠ অবধি = আকণ্ঠ
সমুদ্র থেকে হিমাচল = আসমুদ্র হিমাচল
শৈশব থেকে আরম্ভ করে = আশৈশব
এরূপ, আপাদমস্তক, যাবজ্জীবন ইত্যাদি।

৫। সাদৃশ্য (উপ) বনের সদৃশ = উপবন
কথার সদৃশ = উপকথা
গ্রহের তুল্য = উপগ্রহ

৬। অনতিক্রম (যথা) শক্তিকে অতিক্রম না করে = যথাশক্তি
রীতিকে অতিক্রম না করে = যথারীতি
সাধ্যকে অতিক্রম না করে = যথাসাধ্য
এরূপ যথাবিধি, যথাসাধ্য, যথাজ্ঞান। ইত্যাদি

৭। অতিক্রান্ত (উৎ) = বেলাকে অতিক্রান্ত =উদ্বেল

শৃঙ্খলাকে অতিক্রান্ত = উচ্ছৃঙ্খল।

৮। বিরোধ (প্রতি) = বিরুদ্ধবাদ = প্রতিবাদ

বিরুদ্ধ কূল = প্রতিকূল

৯। ঈষৎ (আ) = ঈষৎ নত = আনত

ঈষৎ রক্তিম = আরক্তিম

১০। পশ্চাৎ (অনু) = পশ্চাৎগমন = অনুগমন

পশ্চাৎধাবন = অনুধাবন

তাপের পশ্চাৎ = অনুতাপ

করণের পশ্চাৎ = অনুকরণ

বিভিন্ন অর্থে আরও কয়েকটি অব্যয় হয়। যেমন-

ক্ষুদ্র অর্থে (উপ) = উপগ্রহ, উপসাগর, উপনদী

পূর্ণতা অর্থে (পরি) = পরিপূর্ণ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. নৈর্বিত্তিক প্রশ্ন :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। 'প্রতিদিন' সমস্ত পদটির ব্যাসবাক্য কি?

ক. দিনের পর দিন খ. দিন ও দিন

গ. দিন দিন ঘ. প্রতি ও দিন

২। প্রতিক্ষণ সমস্ত পদের প্রতি অব্যয়পদটি কোন অর্থে-

ক. বীপ্সা খ. সামীপ্য

গ. পর্যন্ত ঘ. আ

খ. রচনামুলক প্রশ্ন :

১। অব্যয়ীভাব সমাস কাকে বল উদাহরণসহ লিখুন।

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন :

ক. ভিক্ষার ---------- দুর্ভিক্ষ। খ. বনের ---------- উপবন।

গ. বেলাকে অতিক্রান্ত = ঘ. ---------- অতিক্রমন করে = যথারীতি।

ঙ. সমুদ্র থেকে ---------- = আসমুদ্র হিমাচল।

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

উত্তর

১। গ ২। ক

২। ক. অভাব, খ. সদৃশ গ. উদ্বেল ঘ. রীতিকে ঙ. হিমাচল পর্যন্ত

পাঠ ৭

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

* বহুব্রীহি সমাসের সংজ্ঞা লিখতে ও বলতে পারবেন।
* বহুব্রীহি সমাসের সাধারণ নিয়মগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
* বহুব্রীহি সমাস কত প্রকার তা লিখতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সংজ্ঞা :

যে সমাসে সমস্যমান পদগুলোর কোনটির অর্থ প্রধানভাবে না বুঝিয়ে তৃতীয় কোন অর্থ বোঝায় তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে।

যেমন-

লাল পাড় যার = লাল পেড়ে।

দশ আনন যার = দশানন (রাবণ)।

অর্থাৎ, পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত পদ দুটি মিলিত হয়ে যদি অন্য কোন অর্থ প্রকাশ করে সেটাই বহুব্রীহি সমাস।

যেমন উপরের উদাহরণে পূর্বপদ দশ, পরপদ আনন, কিন্তু দুটির একটিকেও না বুঝিয়ে 'দশানন' (রাবণের অন্য নাম) কে বুঝিয়েছে।

বহুব্রীহি একটি সমাসবদ্ধ পদ। এর ব্যাসবাক্য 'বহু ব্রীহি' (ধান) আছে যার। এখানে পূর্বপদ 'বহু', পরপদ ব্রীহি, দুটো মিলে বহু ধান বোঝানো উচিত ছিল। কিন্তু এখানে বহু ধান আছে এমন ব্যক্তি অর্থাৎ ধনী ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে।

বহুব্রীহি সমাসের কতগুলো নিয়ম আছে

১. বহুব্রীহি সমাসের সমস্ত পদটি বিশেষ্য ও বিশেষণ দুটোই হতে পারে। যেমন -

   পীত অম্বর যার = পীতাম্বর (বিশেষ্য)।

   মা মরেছে যার = মা-মরা (বিশেষণ)।

২. বহুব্রীহি সমাসের ব্যাসবাক্যে সাধারণত যাহার, যার, যাতে ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন -

   সুন্দর গন্ধ যার = সুগন্ধি;

   নীল নয়ন যে রমনীর = নীলনয়না।

৩. স্ত্রীবাচক শব্দ বোঝাতে সমস্তপদে 'আ' বা 'ঈ' যুক্ত হয় । যেমন -

   মৃগের ন্যায় নয়ন যে রমণীর = মৃগনয়না;

   চাঁদের ন্যায় মুখ যে রমণীর = চাঁদমুখী।

৪. সঙ্গে, সমাসন, সহ বা সহিত শব্দের সাথে অন্য পদের বহুব্রীহি সমাস হলে সহ, সমান, সহিতের জায়গায় 'স' হয়।

   যেমন-

   সমান গোত্র যার = সগোত্র;

সহ পক্ষ যার = সপক্ষ;

পুত্রের সহিত বর্তমান যে-সপুত্র

৫. বহুব্রীহি সমাসে উত্তরপদে সংস্কৃত ভাষা অনুযায়ী স্ত্রীবাচক বিশেষণ হলেও সমস্তপদে স্ত্রীবাচক প্রত্যয়টি লোপ পায়। যেমন -

দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যার = দৃঢ় প্রতিজ্ঞ;

লব্ধ প্রতিষ্ঠা যার = লব্ধ প্রতিষ্ঠা।

৬. বহুব্রীহি সমাসের পরপদে 'মাতৃ' পত্নী, স্ত্রী ইত্যাদি শব্দ থাকলে শব্দগুলোর শেষে 'ক' যুক্ত হয়। যেমন -

স্ত্রীর সহিত বর্তমান = সস্ত্রীক;

নদী মাতা যার = নদীমাতৃক।

৭. বহুব্রীহি সমাসের পরপদে 'নাভি' স্থলে নাভ, অক্ষি স্থলে অক্ষ, চূড়া স্থলে চূড়, কর্ম স্থলে কর্মা হয়। যেমন -

উর্ণ নাভিতে যার = উর্ণনাভ;

চন্দ্র চূড়া যার = চন্দ্রচূড়।

বিচিত্র কর্ম যার = বিচিত্র কর্মা

কমলের ন্যায় অক্ষি যার = কমলাক্ষ

৮. পরপদে 'গন্ধ' শব্দ থাকলে গন্ধি বা গন্ধা হয়। যমেন -

সুন্দর গন্ধ যার = সুগন্ধি;

মৎস্যের ন্যায় গন্ধ যার = মৎস্যগন্ধা।

বহুব্রীহি সমাস প্রধানত আট প্রকার

১. **সমানাধিকরণ বহুব্রীহি :** পূর্বপদ বিশেষণ এবং পরপদ বিশেষ্য হলে তাকে সমানাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন-

বদ মেজাজ যার = বদমেজাজী

লাল পাড় যার = লাল পেড়ে

এমনি, হৃতসর্বস্ব, সহোদর, উণপাজুরে, গৌরাঙ্গ ইত্যাদি।

২। **ব্যধিকরণ বহুব্রীহি :** পূর্বপদ এবং পরপদের কোনটি বিশেষণ না হলে তাকে, ব্যধিকরণ বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন-

আশিতে বিষ যার = আশীবিষ

ঘরে মুখ যার = ঘরমুখো

৩। **ব্যতিহার বহুব্রীহি :** যে বহুব্রীহি সমাসে পরস্পরের মধ্যে একই জাতীয় ক্রিয়া বোঝায় তাকে ব্যতিহার সমাস বলে।

হাতে হাতে যে লড়াই = হাতাহাতি

চুলে চুলে যে মারামারি = চুলোচুলি

কানে কানে যে কথা = কানাকানি ইত্যাদি

৪। **মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি :** যে বহুব্রীহি সমাসের মধ্যপদের লোপ হয়ে যায় তাকে মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস সমাস বলে। যেমন -

বিড়ালের মত চোখ যে রমনীর = বিড়ালচোখী

মৃগের ন্যায় চোখ যে নারীর = মৃগনয়না

৫। **নঞবহুব্রীহি :** যে বহুব্রীহি সমাসের বিভক্তি লোপ পায়না তাকে অলুক বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন -

গায়ে হলুদ দেয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = গায়ে হলুদ

মাথায় পাগড়ি যার = মাথায় পাগড়ি

হাতে খড়ি দেয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = হাতে খড়ি।

৭. **সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি :** পূর্বপদে সংখ্যাবাচক এবং পরপদ বিশেষ্য হলে তাকে সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন-

দশ গজ পরিমাণ যার = দশগজী;

চার পায়া যার = চারপেয়ে।

৮. **প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি :** যে বহুব্রীহির সমস্তপদে 'আ' এ, ও ইত্যাদি প্রত্যয় যুক্ত হয়ে সমাস হয় তাকে প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন -

এক দিকে চোখ যার = একচোখা;

দুই দিকে টান যার = দোটানা।

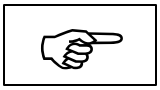

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৭

ক. নৈর্বিত্তিক প্রশ্ন :

সঠিক উত্তরের পাশে টিকচিহ্ন (✓) দিন।

১। বহুব্রীহি সমাসে কোন পদের প্রাধান্য থাকে?

ক. পূর্বপদের　　খ. পরপদের

গ. কোন পদের নয়　　ঘ. অন্য কোন তৃতীয় পদের

২। 'লাঠালাঠি' কোন বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ?

ক. সমানাধিকরণ　　খ. নঞ

গ. ব্যধিকরণ　　ঘ. ব্যতিহার

৩। মানাধিকরণ বহুব্রীহি সমাসে পূর্বপদ

ক. বিশেষণ　　খ. বিশেষ্য

গ. সর্বনাম　　ঘ. সংখ্যাবাচক

খ. রচনামূলক প্রশ্ন :

১। বহুব্রীহি সমাস কাকে বলে উদাহরণসহ বুঝিয়ে লিখুন।

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন

ক. নেই ভাগ্য করুন ---------।

খ. চাঁদের মত --------- নারীর = চাঁদমুখী

গ. --------- বিষ যার = আশীবিষ

ঘ. সমান উদর যার ---------।

ঙ. বিচলিত মন যার ---------।

উত্তর

১.ঘ, ২. গ. ৩. ক

২. ক. অভাগা, খ মুখ যে গ. আশীতে ঘ, সহোদর, ঙ বিমনা।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. নৈর্বিত্তিক প্রশ্ন :

১. কোনটি তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ?

ক. রাজর্ষি　　খ. মিশকালো

গ. বসন্ত সখা　　ঘ. দশানন

২. সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে বিশেষ্য পদের যে সমাস হয় তার নাম কি?

ক. বহুব্রীহি　　খ. কর্মধারয়

গ. দ্বন্দ্ব　　ঘ. দ্বিগু

৩. গায়ে হলুদের সঠিক ব্যাসবাক্য কোনটি?

ক. গায়ে হলুদ　　খ. গায়েতে হলুদ

গ হলুদের গা　　ঘ. গায়ে হলুদ দেয়া হয় যে অনুষ্ঠানে

৪. যে যে পদে সমাস হয় তাদের প্রত্যেকটির নাম কি?

ক. সমস্তপদ　　খ. ব্যাসবাক্য

গ. সমস্যমান পদ　　ঘ. পূর্বপদ

৫. চক্রাকার কোন সমাসের উদাহরণ?

ক. দ্বিগু　　খ. ষষ্ঠী তৎপুরুষ

গ. দ্বন্দ্ব　　ঘ. অব্যয়ীভাব

৬. যে সমাস্যমান পদ দুটির একটিকেও না বুঝিয়ে তৃতীয় পদটি প্রধান হয় তাকে কোন সমাস বলে?

ক. কর্মধারয়　　খ. অব্যয়ীভাব

গ. বহুব্রীহি　　ঘ. তৎপুরুষ

খ. রচনামূলক প্রশ্ন :

১. সমাস কাকে বলে? বাংলা ভাষায় সমাসের প্রয়োজনীয়তা কি আলোচনা করুন।

২. বাংলা ব্যাকরণে কয় প্রকার সমাস আছে? প্রত্যেকটির একটি করে উদাহরণ দিন।

৩. উপমান, উপমিত ও রূপক কর্মধারয় সমাসের পার্থক্য উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করুন।

৪. নিম্নলিখিত বাক্যগুলোর নিম্নরেখ পদগুলোর ব্যাসবাক্য সহ সমাসের নাম লিখুন :

ক. গাছপাকা আম খেতে খুব মজা।

খ. নতুন শতাব্দী শুরু হয়েছে।

গ. আজ পরিবহন ধর্মঘট।

ঘ. আজকাল ঢেঁকিছাটা চাল পাওয়া ভার।

ঙ. লোকটি একেবারে গোবেচারা।

উত্তর

১. গ　　২. ঘ　৩. ঘ　৪. গ　৫. খ　৬. ঘ

৪. ক. গাছপাকা = গাছে পাকা = সপ্তমী তৎপুরুষ

খ. শতাব্দী = শত অব্দের সমাহার = দ্বিগু।

গ. ধর্মঘট = ধর্মের নিমিত্তে যে ঘট = চতুর্থী তৎপুরুষ।

ঘ. ঢেঁকিছাটা = ঢেঁকি দ্বারা ছাটা= তৃতীয়া তৎপুরুষ।

ঙ. গোবেচারা=গরুর ন্যায় বেচারা = উপমান কর্মধারয়।

৫. ব্যাসবাক্য সহ সমাসের নাম লিখুন

দেশপ্রীতি, শোকানল, প্রশ্নকর্তা, মেষশাবক, মেঘাবৃত, মশামাছি, ভারাক্রান্ত, ভোজনপটু, ভাতকাপড়, মনগড়া, বীনাপানি, বেহুঁশ, সর্বশ্রেষ্ঠ, বটবৃক্ষ, ভক্তিসুধা।

উপসর্গ

ভূমিকা

বাংলা ভাষায় বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় শব্দ থেকে নতুন শব্দ তৈরি হয়। উপসর্গ নতুন শব্দগঠনের একটি প্রক্রিয়া। উপসর্গগুলো বাংলাভাষার শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করেছে।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

* উপসর্গের সংজ্ঞা লিখতে পারবেন।
* বাংলা ভাষায় উপসর্গের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
* উপসর্গ কত প্রকার ও কি কি তা লিখতে পারবেন।

সংজ্ঞা :

বাংলা ব্যাকরণে কতগুলো অব্যয়বাচক শব্দাংশ আছে যার নিজস্ব কোন অর্থ নেই কিন্তু অন্য শব্দের পূর্বে বসে সেই শব্দটিকে নতুন শব্দে পরিণত করে, এগুলোকেই উপসর্গ বলে।

উপসর্গ ব্যবহারের ফলে শব্দে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন হয়।

১. নতুন শব্দ গঠন করে।

২. শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটায়।

৩. অর্থের বিশিষ্টতা দান করে।

৪. অর্থের সঙ্কোচন ঘটায়।

৫. অর্থের সম্প্রসারণ ঘটায়।

অধি, বি, প্র, অপ, উপ, পরি, কু ইত্যাদি অব্যয় বাচক শব্দই উপসর্গ।

নিচের উদাহরণ দিয়ে দেখানো হল উপসর্গগুলো কিভাবে নতুন শব্দ তৈরি করে।

উপসর্গ	শব্দ	নতুন শব্দ	পরিবর্তন
প্র+	ভাত =	প্রভাত	সম্পূর্ণ ভিন্নার্থক শব্দ
প্র +	গাঢ় =	প্রগাঢ়	অর্থের সম্প্রসারণ
অপ +	মান =	অপমান	সঙ্কোচন
কদ +	বেল =	কদবেল	বিশিষ্টতা
পরি +	পূর্ণ =	পরিপূর্ণ	পূর্ণতাজ্ঞাপক

একই শব্দ ভিন্ন উপসর্গ ব্যবহারে কিভাবে নতুন শব্দ গঠন করে নিচে দেখুন :

উপসর্গ	শব্দ	নতুন শব্দ
প্র+	হার =	প্রহার
বি +	হার =	বিহার
উপ +	হার =	উপহার
পরি +	হার =	পরিহার
অনা +	হার =	অনাহার

উপসর্গগুলোর নিজস্ব কোন অর্থ নেই। কিন্তু শব্দের পূর্বে বসে শব্দের অর্থের পরিবর্তন আনতে সাহায্য করে। ফলে একই শব্দ থেকে বিভিন্ন শব্দ তৈরি হয়। ফলে ভিন্নার্থক এবং বিশিষ্টার্থক নতুন নতুন শব্দ তৈরি করে বাংলা ভাষার শব্দ ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। এজন্যেই বলা হয়, "উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে।

বাংলা ভাষার তিন প্রকার উপসর্গ আছে:

১. খাঁটি বাংলা উপসর্গ:

২. তৎসম বা সংস্কৃত উপসর্গ:

৩. বিদেশী উপসর্গ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। উপসর্গ বলতে কি বোঝায়?

ক. ধাতুযুক্ত শব্দ

খ. অব্যয়বাচক শব্দাংশ যা শব্দের আগে বসে নতুন শব্দ গঠন করে।

গ. বিভক্তিযুক্ত শব্দ

ঘ. যা শব্দের পরে বসে

২। 'প্র' উপসর্গ 'ভাত' শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যে নতুন শব্দ তৈরি হয়েছে তাতে অর্থের

ক. সম্প্রসারণ ঘটেছে
খ. অর্থের সঙ্কোচন ঘটেছে
গ. অর্থের পরিপূর্ণতা এসেছে
ঘ. সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ

৩। বাংলা ভাষায় উপসর্গ কয় প্রকার?

ক. দুই
খ. তিন
গ. চার
ঘ. ছয়

৪। বাংলা ব্যাকরণে কোন উপসর্গ নেই?

ক. সংস্কৃত
খ. তদ্ভব
গ. বিদেশী
ঘ. দেশী

৫। শূন্যস্থান পূরণ করুন :

উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই কিন্তু ---------- আছে।

৬। 'কার শব্দটিকে পাঁচটি ভিন্ন উপসর্গ যোগে নতুন শব্দ তৈরি করুন।

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

উত্তর

১। খ ২। ঘ ৩। খ ৪। খ ৫। অর্থদ্যোতকতা

৬. উপ+কার = উপকার

বি+কার = বিকার

প্র+কার = প্রকার

আ+কার = আকার

অধি+কার = অধিকার।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

* বাংলা উপসর্গ কাকে বলে তা বলতে ও লিখতে পারবেন।
* বাংলা উপসর্গ কয়টি এবং এগুলোর ব্যবহার সম্পর্কে লিখতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারের বহু অসংস্কৃত শব্দে সংস্কৃত উপসর্গের মত কতগুলো অব্যয়বাচক শব্দাংশ শব্দের আগে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। এই শব্দাংশগুলোর স্বতন্ত্রভাবে তেমন কোন অর্থ প্রকাশ করে না; কন্তু অর্থযুক্ত শব্দের পূর্বে বসে নতুন শব্দ গঠন করতে সাহায্য করে। এই অব্যয়বাচক শব্দাংশগুলোকে বাংলা উপসর্গ বলে।

সংজ্ঞা

যে বাংলা অব্যয়বাচক শব্দাংশগুলো শব্দের পূর্বে বসে অর্থবোধক নতুন শব্দ গঠন করে তাকে বাংলা উপসর্গ বলে।

খাঁটি বাংলা উপসর্গ মোট ২১টি।

উপসর্গগুলো হল : অ, অনা, অঘা, অজ, আ, আড়, আন, আব, ইতি, উন, কদ্, কু, নি, পাতি, বি, ভর, রাম, স, সু, ব, হা। নিচে উপসর্গগুলোর প্রয়োগ দেখুন এবং নিজে আরও নতুন শব্দ যোগ করতে চেষ্টা করুন।

উপসর্গ	কোন অর্থে ব্যবহৃত	শব্দ	নতুন শব্দ
অ	খারাপ বা নিন্দিত অর্থে না অর্থে ক্রমাগত অর্থে	কাজ, পয়া, ঘাটা, জানা, চেনা, দেখা, চল, ঝর, ফুরন্ত, ঘোর	অকাজ, অপয়া, অঘাটা, অজানা, অচেনা, অদেখা, অচল, অঝর, অফুরন্ত, অঘোর ইত্যাদি।
অনা	অভাব অর্থে নিন্দিত অর্থে	বৃষ্টি, আদর, আকার	অনাবৃষ্টি, অনাদর, অনামা, অনাকার, অনাচার, অনাসৃষ্টি ইত্যাদি।
অঘা	বোকা অর্থে	রাম, চণ্ডী	অঘারাম, অঘাচণ্ডী ইত্যাদি।
অজ	মন্দ অর্থে	পাড়াগাঁ, পুকুর, মূর্খ	অজপাড়াগাঁ, অজপুকুর, অজমূর্খ ইত্যাদি।
আ	না অর্থে নিন্দা অর্থে	লবণহীন, ধোয়া, বাছা, কাড়া, কার, গাছ, কথা	আলুনি, আধোয়া,আবাছা, আকাঁড়া, আকার, আগাছা, আকাট, আকথা ইত্যাদি।
আড়	বাকা অর্থে	চোখে, কথা	আড়চোখে, আড়কথা ইত্যাদি।
আন	না বাচক, বিচলিত অর্থে	কোরা, সেলাই	আনকোরা, আনসেলাই, আনচান, আনমনা ইত্যাদি।
আব	অস্পষ্টতা	ছায়া, ডাল	আবছায়া, আবডাল ইত্যাদি।
ইতি	পুরনো অর্থে	পূর্বে, হাস, কথা	ইতিহাস, ইতিপূর্বে, ইতিকথা ইত্যাদি।
উন	কম	পাঁজর, বর্ষা, কিশোর, কম	উনপাঁজর, উনবর্ষা, ঊনিশ ইত্যাদি।

কদ	খারাপ অর্থে	আচার, অর্থ, বেল	কদর্থ, কদাচার, কদবেল ইত্যাদি।
কু	কুৎসিত/খারাপ অর্থে	কাজ, অভ্যাস, কথা	কুকাজ, কুঅভ্যাস, কুকথা, ইত্যাদি।
নি	নেই অর্থে	টোল, খোঁজ, খুঁত, ভাজ	নিটোল নিখোঁজ, নিখুঁত, নিভাজ ইত্যাদি।
পাতি	ছোট অর্থে	হাঁস, কাক, নেতা	পাতিহাঁস, পাতিকাক, পাতিনেতা ইত্যাদি।
বি	নিন্দা বা না অর্থে	পথ, ফল, জোড়, ভুঁই, কল	বিপথ, বিফল, বিজোড়, বিভুই, বিকল ইত্যাদি।
ব	নিরেট মুর্খ অর্থে	কলম	বকলম, বখাটে ইত্যাদি।
ভর	পূর্ণ	পেট, দুপুর, সাঁজ, পুর	ভরপেট, ভরদুপুর, ভরসাঁজ, ভরপুর ইত্যাদি।
রাম	বড়/টি	দা, ছাগল, বোকা	রামদা, রামছাগল, রামবোকা ইত্যাদি।
স	সহ অর্থে বিশেষ অর্থে	লাজ, পরিবার, বর, ঠিক, টান	সলাজ, সপরিবার, সরব, সঠিক, সটান ইত্যাদি।
সু	ভাল অর্থে	নজর, খবর, দিন, ছাঁদ	সুনজর, সুখবর, সুদিন, সুছাদ ইত্যাদি।
হা	অভাব অর্থে	হুতাশ, ঘরে, ভাতে	হা-হুতাশ, হাঘরে, তাভাতে ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ২

ক. নৈর্বিত্তিক প্রশ্ন :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

২। বাংলা উপসর্গ কয়টি?

ক. চারটি　　খ. বিশটি

গ. একুশটি　　ঘ. উনিশটি

৩। 'অনা' উপসর্গটি নিচের কোন শব্দে খারাপ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

ক. অনাবৃষ্টি　　খ. অনাদর

গ. অনালোক　　ঘ. অনাচার

৪। 'আ' উপসর্গটি কোন শব্দে বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

ক. আধোয়া　　খ. আকাশ

গ. আবাছা　　ঘ. আলুনী

৫। 'উন' উপসর্গটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়?

ক. খারাপ অর্থে　　খ. ভাল অর্থে

গ. কম অর্থে　　ঘ. না অর্থে

৬। 'অ' উপসর্গযোগে কোন শব্দটি নিন্দিত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

ক. অচেনা　　খ. অঝর

গ. অজানা　　ঘ. অপয়া

খ. রচনামুলক প্রশ্ন :

১। বাংলা উপসর্গ কাকে বলে উদাহরণসহ লিখুন

ডান পাশ থেকে সঠিক উপসর্গ নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করুন

ক. আজ সারা দিন -------- বৃষ্টি হচ্ছে।

খ. সামনে -------- কালের দুটি মাস।

গ. ছেলেটি একেবারে -------- কলম।

ঘ. এমন -------- খুঁত কাজ দেখা যায় না।

ঙ. -------- নেতাদের যন্ত্রণায় সবাই অস্থির।

আ, অ, পাতি, ব, নি

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

উত্তর

২। গ　　৩। ঘ　　৪। খ　　৫। গ　　৬। ঘ

৭। ক. অ,　　খ আ,　　গ. ব　　ঘ. নি,　　ঙ. পাতি

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

* সংস্কৃত উপসর্গ কাকে বলে তা লিখতে পারবেন।
* তৎসম উপসর্গ কয়টি ও কি কি তা লিখতে ও বলতে পারবেন।
* বিভিন্ন উপসর্গযোগে শব্দ গঠন করতে পারবেন।

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দগুলোর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, অনেক সংস্কৃত শব্দ অবিকৃত অবস্থায় ব্যবহৃত হচ্ছে। ঠিক তেমনি বহু সংস্কৃত উপসর্গও বাংলা ভাষায় শব্দ গঠন করতে ব্যবহার করা হয়, এগুলো সংস্কৃত উপসর্গ।

সংজ্ঞা :

যে সংস্কৃত অব্যয়বাচক শব্দাংশগুলো শব্দের পূর্বে বসে শব্দের অর্থের পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করে এই শব্দাংশগুলোকেই সংস্কৃত উপসর্গ বলে।

বাংলা ভাষায় মোট কুড়িটি সংস্কৃত উপসর্গ রয়েছে। এগুলো হল : প্র, পরা, অপ, সম, নি, অব, অনু, নির, দুর, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অভি, অতি, অপি, উপ, আ।

উপসর্গ	কোন অর্থে ব্যবহৃত	শব্দ	উপসর্গযোগে গঠিত শব্দ
প্র	উৎকৃষ্ট ও আধিক্য অর্থে	গাঢ়, চৎ, দীপ, খ্যাত, সিদ্ধ, ভাব, গতি, স্থান, বেশ	প্রগাঢ়, প্রচৎ, প্রকার, প্রখ্যাত, প্রসিদ্ধ, প্রভাব, প্রগতি, প্রস্থান, প্রবেশ ইত্যাদি।
পরা	বিপরীত অর্থে আতিশয্য অর্থে	জয়, ভব, জিত, ক্রম	পরাজয়, পরাভব, পরাজিত, পরাক্রম, পরাকাষ্ঠা ইত্যাদি।
অপ	বিপরীত নিন্দার্থে	মান, কার, বাদ, কর্ম, কর্ষ, ব্যয়, হরণ, মৃত্যু	অপমান, অপকার, অপবাদ, অপকর্ম, অপকর্ষ, অপব্যয়, অপহরণ, অপমৃত্যু ইত্যাদি।
সম	সম্যকরূপ সম্মুখে	পূর্ণ, অর্পণ আগত, ভাষণ	সম্পূর্ণ, সমৃদ্ধ, সমাপ্ত, সম্ভব, সমর্পণ, সমাগত, সম্ভাষণ ইত্যাদি।
নি	আতিশয্যে, অভাব, বিকৃত অর্থে	যুক্ত, গূঢ়, কর্ম, চল, হত	নিযুক্ত, নিগূঢ়, নিদাঘ, নিস্কর্মা, নিশ্চল, নিহত ইত্যাদি।
অব	নিন্দার্থে নিচে অর্থে শেষ অর্থে	হেলা, মাননা, ক্ষয় শেষ, লুপ্ত	অবহেলা, অবমাননা, অবক্ষয়, অবতরণ, অবরোহণ, অবশেষ, অবলুপ্ত ইত্যাদি।
অনু	পশ্চাৎ পুন পুন অর্থে	সরণ, গমন, তাপ, শোচনা, ক্ষণ, দিন	অনুসরণ, অনুগামী, অনুজ, অনুতাপ, অনুশোচনা, অনুক্ষণ, অনুদিন, অনুশীলন,

	সাদৃশ্য		অনুরূপ, অনুকার, অনুবাদ ইত্যাদি।
নির	অভাব নিশ্চিত অর্থে বহিষ্কার	আশ্রয়, অক্ষর, অহঙ্কার, জীব, জন, বাক, ধারণ	নিরাশ্রয়, নিক্ষর, নিরহঙ্কার, নির্জীব, নির্জন, নির্বাক, নির্ধারণ, নির্ণয়, নিরাতিশয়, নির্গম, নির্বাসন, নিঃসরণ ইত্যাদি।
দুর	মন্দ অর্থে কষ্ট করে যা পাওয়া যায় অভাব	ভাগ্য, দশা, নাম, গতি, ব্যবহার	দুর্ভাগ্য, দুর্দশা, দুর্নাম, দুর্গতি, দুর্লভ, দুর্গম, দু:সাধ্য দুর্ব্যবহার ইত্যাদি।
বি	বিশেষ অর্থে না অর্থে অভাব	জয়, জ্ঞান, শুষ্ক, শুদ্ধ, রাগ, বর্ণ, ফল, শৃঙ্খল	বিজয়, বিজ্ঞান, বিশুষ্ক, বিশুদ্ধ বিরাগ, বিস্মৃত, বিফল, বিশৃঙ্খল ইত্যাদি।
সু	সহজ অর্থে ভাল আতিশয্যে	গম, লভ, সাধ্য, কষ্ঠ, মতি, নীল, কঠিন, ধীর, নিপুণ, তীক্ষ্ণ, শীতল।	সুগম, সুলভ, সুসাধ্য, সুকষ্ঠ, সুমতি, সুনীল, সুকঠিন, সুধীর, সুনিপুণ, সুতীক্ষ্ণ, সুশীতল ইত্যাদি।
উৎ	উপর আতিশয্যে	ক্ষিপ্ত, থান, তপ্ত, ফুল্ল, ছল, কর্ষ	উৎক্ষিপ্ত, উত্থান, উত্তোলন, উত্তপ্ত, উৎফুল্ল, উচ্ছল, উৎকর্ষ ইত্যাদি।
অধি	আধিপত্য	কার, পতি, গত	অধিকার, অধিপতি, অধিগত ইত্যাদি।
পরি	পূর্ণতাবাচক	শেষ, পূর্ণ, সীমা, তৃপ্ত পক্ব	পরিশেষ, পরিপূর্ণ, পরিসীমা, পরিতৃপ্ত, পরিপক্ব ইত্যাদি।
প্রতি	সাদৃশ্য বিপরীত অর্থে পুনঃ পুনঃ অর্থে	মূর্তি, ধ্বনি, কৃতি, দান, বাদ, শোধ, পক্ষ, উত্তর, দিন, ক্ষণ, মুহূর্ত	প্রতিমূর্তি, প্রতিধ্বনি, প্রতিকৃতি, প্রতিদান, প্রতিবাদ, প্রতিশোধ, প্রতিপক্ষ, প্রত্যুত্তর, প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ, প্রতিমুহূর্ত ইত্যাদি।
উপ	সামীপ্য সাদৃশ্য ছোট, নিন্দা অর্থে বিশেষ অর্থে	কুল, কণ্ঠ, বন, শহর, পত্নি, সাগর, নয়ন	উপকূল, উপকণ্ঠ, উপবন, উপশহর, উপপত্নি, উপগ্রহ, উপসাগর, উপনয়ন ইত্যাদি।
অভি	সম্যক গমন	ব্যক্ত, ভূত, বিজ্ঞ, নয়, সার, যান	অভিব্যক্ত, অভিভূত, অভিজ্ঞ, অভিনয়, অভিসার, অভিযান ইত্যাদি।
অপি		নিহিত	অপিনিহিত ইত্যাদি।
অতি	অতিশয় অতিক্রম	রঞ্জিত, কায়, বৃষ্টি, উজ্জ্বল প্রাকৃত, মানব	অতিরঞ্জিত অতিকায়, অতিশয়, অতিবৃষ্টি, অত্যুজ্বল, অতিপ্রাকৃত, অতিমানব ইত্যাদি।
আ	পর্যন্ত ঈষৎ বিপরীত	কণ্ঠ, মৃত্যু, সমুদ্র, রক্ত, তপ্ত, ভাস, দান, গমন, বেগ	আকণ্ঠ, আমৃত্যু, আসমুদ্র আরক্ত, আতপ্ত, আভাস আদান, আগমন, আবেগ ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৩

শূন্যস্থান পূরণ করুন (সংস্কৃত উপসর্গযোগে) :

১। কারো সম্পর্কে সম্পূর্ণ না জেনে ---------- বাদ দেয়া ঠিক নয়।

২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ক্ষুধিত পাষাণ' একটি ---------- প্রাকৃত গল্প।

৩। এ দেখছি পাগলের ---------- লাপ।

৪। মেয়েটি ---------- খুঁত সেলাই করে।

৫। এ ---------- মানের, ---------- শোধ নেব।

সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। বাংলা ভাষায় সংস্কৃত উপসর্গকটি?

ক. একুশটি　　খ. বিশটি

গ. পনেরটি　　ঘ. বাইশটি

২। কোন শব্দটি সংস্কৃত উপসর্গযোগে গঠিত?

ক. অঘারাম　　খ. অনাবৃষ্টি

গ. গরমিল　　ঘ. পরাজয়

৩। উপনয়ন শব্দটিতে উপসর্গ কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

ক. বিশেষ　　খ.বিপরীত

গ. সমান　　ঘ. নিন্দা

৪। নিচের শব্দগুলো ভিন্ন উপসর্গযোগে ৫টি ভিন্ন শব্দ লিখুন:

হার, কার, গম, তাপ, ধান

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

উত্তর

১. অপ,　২. অতি, ৩. প্র,　৪. নি,　৫. অপ, প্রতি,

১। খ　২। ঘ　৩।. ক

হার = প্রহার, বিহার, আহার, উপহার, পরিহার।

কার = আকার, বিকার, প্রকার, অনুকার, অধিকার।

গম = দুর্গম, সুগম, আগম, নির্গম, সংগম।

তাপ = পরিতাপ, অনুতাপ, প্রতাপ, উত্তাপ, সন্তাপ।

ধান = অভিধান, উপাধান, পরিধান, প্রধান, সমাধান।

পাঠ ৪

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

* বিদেশী উপসর্গ কাকে বলে তা লিখতে ও বলতে পারবেন।
* বাংলা ভাষায় কোন কোন বিদেশী ভাষার উপসর্গ ব্যবহৃত হয় তা বলতে ও লিখতে পারবেন।

বাংলাদেশে প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বহুদেশের মানুষের আগমন ঘটেছে। পরবর্তী সময়ে ভিনদেশী শাসকরা এদেশ শাসন করেছে। তাই বাংলা ভাষায় আরবি, ফারসি, ইংরেজি, ওলন্দাজ বহু ভাষার শব্দ প্রবেশ করেছে। উপসর্গের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। কিছু বিদেশী উপসর্গের ব্যবহার বাংলা ভাষায় সহজেই লক্ষ্য করা যায়।

সংজ্ঞা :

যে সব বিদেশী উপসর্গ শব্দের পূর্বে বসে, নতুন শব্দ গঠন করে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত এই উপসর্গসমূহকে বিদেশী উপসর্গ বলে।

বাংলা ভাষায় বহু বিদেশী উপসর্গ রয়েছে।

আরবি উপসর্গ

উপসর্গ	কোন অর্থে ব্যবহৃত	শব্দ	উপসর্গযোগে শব্দ
খাস	বিশেষ অর্থে	মেহমান, কামরা, মহল	খাস মেহমান, খাস কামরা, খাস মহল
আম	সাধারণ অর্থে	জনতা, দরবার	আমজনতা, আমদরবার
গর	অভাব	মিল, রাজি, হাজির, পছন্দ	গরমিল, গররাজি, গরহাজির, গরপছন্দ
লা	না অর্থে	জওয়াব, পাত্তা	লাজওয়াব, লাপাত্তা, লাখেরাজ

ফারসি উপসর্গ

উপসর্গ	কোন অর্থে ব্যবহৃত	শব্দ	উপসর্গযোগে শব্দ
কার	কাজ অর্থে	খানা, বার, চুপি, সাজি	কারখানা, কারবার, কারচুপি, কারসাজি
না	না অর্থে	চার, রাজ, মঞ্জুর, শোখ, লায়েক, বালক, হক	নাচার, নারাজ, নামঞ্জুর, নাখোশ, নালায়েক, নাবালক, নাহক
নিম	অল্প অর্থে	রাজি, হাকিম	নিমরাজি, নিমহাকিম
ফি	প্রতি অর্থে	দিন, হপ্ত, বছর, বার	ফি-দিন, ফিহপ্ত, ফি বছর, ফিবার
বদ	মন্দ অর্থে	মেজাজ, রাগি, হজম, নাম	বদমেজাজ, বদরাগি, বদহজম, বদনাম
বে	না অর্থে	তাল, জোড়, আদব, কার, আক্কেল	বেতাল, বেজোড়, বেআদব, বেকার, বেআক্কেল

ব	সাথে	মাল, নাম	বমাল, বনাম
কম	স্বল্প	বুদ্ধি, আক্কেল	কমবুদ্ধি, কম আক্কেল, কমবখত
দর	মধ্যস্থতা	দাম, খাস্ত	দরদাম, দরখাস্ত

ইংরেজী উপসর্গ

সাব	অধিন	ডেপুটি, জজ, ইন্সপেক্টর	সাব-ডেপুটি, সাব-জজ, সাব-ইন্সেপেক্টর
হাফ	অর্ধ	হাতা, স্কুল, গেরস্ত, কাজ	হাফহাতা, হাফ স্কুল, হাফগেরস্ত, হাফকাজ
ফুল	সম্পূর্ণ	বাবু, শার্ট, টিকেট	ফুলবাবু, ফুলশার্ট, ফুলটিকেট
হেড	প্রধান	মাস্টার, বাবুর্চি, পণ্ডিত	হেডমাস্টার, হেডবাবুর্চি, হেড পণ্ডিত

হিন্দি উপসর্গ

হর (প্রতিদিন) হররোজ, হরমাহিনা, হরহপ্তা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৪

১। বিদেশী উপসর্গ কাকে বলে দুটি উদাহরণসহ লিখুন।

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। নিচের কোন শব্দটি বিদেশী উপসর্গযোগে গঠিত?

ক. পরিবেশ　　খ. বেহাল

গ. প্রত্যহ　　ঘ. নির্ঝর

২। নিচের কোন শব্দটি ফারসি উপসর্গের উদাহরণ?

ক. কারবার　　খ. ফুলবাবু

গ. আমদরবার　　ঘ. খয়ের

৩। কোনটি আরবি উপসর্গের উদাহরণ?

ক. সাব-জজ　　খ. গরমিল

গ. হররোজ　　ঘ. কমজোর

সঠিক বিদেশি উপসর্গ যোগে শূণ্যস্থান পূরণ করুন :

১। মাহফুজের ------ খাস্ত ------ মঞ্জুর হয়েছে।

২। এই গরমে ------ শার্ট খুলে ------ শার্ট পরে নাও।

৩। ------ খানাটি, কর্মকর্তাদের ------ চুপিতে বন্ধ হয়ে গেছে।

৪। ------ হপ্ত এক কাজ করতে ভাল লাগে না।

৫। এই ------ নসিব মহিলার স্বামী অত্যন্ত ------ মাশ।

৬। লোকটি ------ হামেশা এখানে বসেন।

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

উত্তর

১। খ ২। ক, ৩। খ

১। দর, না, ২। ফুল, হাফ, ৩। কার, কার, ৪। ফি ৫।. বদ, বদ ৬।ু হর

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন :

১. উপসর্গ কাকে বলে? উপসর্গ কত প্রকার ও কি কি? প্রত্যেকটির দুটো করে উদাহরণ দিন।

২. বাংলা ভাষায় উপসর্গের প্রয়োজনীয়তা কেন উদহারণসহ ব্যাখ্যা করুন।

৩. নিচের শব্দগুলো প্রত্যেকটির তিনটি ভিন্ন উপসর্গযোগে নতুন অর্থবোধক শব্দ তেরি করে বাক্যরচনা করুন: শ্বাস, লয়, বাস, বাদ, মান।

৪. নিচের শব্দগুলো থেকে বাংলা, সংস্কৃত ও বিদেশী উপসর্গ যুক্ত শব্দ পৃথক করে দেখান:

প্রণাম, আলুনি, অবেলা, বেহাল, নিখুঁত, গরমিল, সম্পূর্ণ, নিযুক্ত, আজন্ম, পরিপক্ব, খোশ মেজাজ, হরবোলা।

৫. উপসর্গের স্বাধীন অর্থ নেই, কিন্তু নতুন অর্থ সৃষ্টির গুণ আছে। উদাহরণসহ উক্তিটির সভ্যতা যাচাই করুন।

৬. নিচের শব্দগুলো দেয়া হল, বাক্য রচনা নিজে তৈরি করুন।

শ্বাস : বিশ্বাস, নিঃশ্বাস, আশ্বাস

বাদ : অপবাদ, প্রতিবাদ, বিবাদ

লয় : আলয়, প্রলয়, নিলয়

বাস : আবাস, নিবাস, প্রবাস, উপবাস

খান : অপমান, অভিমান, অভিযান

নিজেরা আরও উপসর্গযোগে শব্দ চিন্তা করুন।

চূড়ান্ত মূল্যায়নের উত্তরগুলো সব পাঠ পড়ে নিজের চেষ্টায় তৈরি করুন।

ধাতু প্রকরণ

ভূমিকা

ধাতু বাংলা ব্যাকরণের রূপতত্ত্বের আলোচনায় পড়ে। ধাতু সম্পর্কে আলোচনা না করলে ক্রিয়াপদ এবং প্রকৃতি প্রত্যয় সম্পর্কিত ধারণা পূর্ণ হয় না। তাই ধাতু সম্পর্কিত আলোচনা বাংলা ব্যাকরণে গুরুত্বপূর্ণ।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

* ধাতু কাকে বলে তা লিখতে পারবেন।
* ধাতু চেনার সহজ উপায় লিখতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
* ধাতু কত প্রকার তা লিখতে ও বলতে পারবেন।

বাংলা ভাষায় বহু ক্রিয়াপদ রয়েছে। বাক্যের যে পদ দ্বারা কোন কাজ করা বোঝায় তাকেই ক্রিয়াপদ বলে। যা থেকে ক্রিয়াপদের জন্ম সেটাই ধাতু। যেমন, করি, একটি ক্রিয়াপদ। একে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় কর্+ই। কর ক্রিয়াপদের মূল অংশ, এটিই ধাতু।

সংজ্ঞা :

ক্রিয়াপদের মূল অংশকেই ধাতু বলে। অর্থাৎ ক্রিয়ার মূল অর্থ যার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় তাকেই ধাতু বলে।

যেমন- কর্, চল, পড়্, এগুলো ধাতুর উদাহরণ। এই ধাতুগুলোই পদে ব্যবহৃত হবার সময় প্রত্যয় বা বিভক্তি যুক্ত করা হয়। যেমন- পড়ে, করে, ধরে, চলা, বলা। অন্যভাবে বলা যায় ক্রিয়াপদের বিভক্তি বাদ দিলে যা থাকে সেই ধাতু। যেমন 'পড়্' ধাতুর সঙ্গে 'এ' বিভক্তি যুক্ত করে 'পড়ে' ক্রিয়া হয়েছে। অর্থাৎ 'পড়্' ধাতু পড়ে ক্রিয়াপদের মূল অংশ।

লেখার সময় ধাতু বোঝাবার জন্য শব্দের পূর্বে ✓চিহ্নটি ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ 'ধাতু' না লিখে শব্দের আগে ✓ এই চিহ্নটি ব্যবহার করলেই বোঝা যায় এটি একটি ধাতু। যেমন-

✓কর, ✓পড়্, ✓ধর, ✓খা, ✓দা ইত্যাদি।

ধাতু বা ক্রিয়ামূল চিনবার পদ্ধতি হল বর্তমান কালের অনুজ্ঞাবাচক (আদেশ, নির্দেশ ইত্যাদি বাচক) পদে তুচ্ছার্থক মধ্যম পুরুষের ক্রিয়ার যে রূপ সেটাই ধাতু।

উদাহরণটি নিচে দেখানো হল

উত্তম অনুজ্ঞা হয় না

মধ্যম	আপনি খান (সম্ভ্রমার্থে)
	তুই খা (তুচ্ছার্থে)
নাম	সে খাক (তুচ্ছার্থে)
	তিনি খান (সম্ভ্রমার্থে)

ঠিক এমনি তুই কর্, তুই লেখ্, তুই পড়্। এগুলো এক অর্থে মধ্যম পুরুষের তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত ক্রিয়াপদ, অন্য অর্থে এটাই ধাতু। বাংলা ধাতুর উৎপত্তি ও গঠন বিচার করে এগুলোতে তিন প্রকারে ভাগ করা যায়।

১. মৌলিক বা সিদ্ধ ধাতু;

২. সাধিত ধাতু;

৩. যৌগিক বা সংযোগমূলক ধাতু।

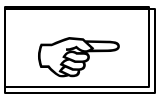

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। ধাতু কাকে বলে? উদাহরণসহ লিখুন।

এক কথায় উত্তর দিন :

১। ক্রিয়ার মূল অংশকে কি বলে?

২। কর্+এ, এখানে 'কর্' কি?

৩। ধাতু কয় প্রকার?

৪। মধ্যম পুরুষের তুচ্ছার্থক অনুজ্ঞায় ক্রিয়ার রূপটি কি?

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

উত্তর

১। ধাতু, ২। ধাতু ৩। তিন প্রকার ৪। ধাতু

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

* মৌলিক ধাতু কাকে বলে তা লিখতে পারবেন।
* বাংলা এবং সংস্কৃত ধাতু সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
* সাধিত ধাতু এবং সংযোগমূলক ধাতু সম্পর্কে বলতে ও লিখতে পারবেন।

সংজ্ঞা :

বাংলা ভাষায় যে সমস্ত ধাতুর বিশ্লেষণ সম্ভব হয় না অর্থাৎ যে ধাতু স্বয়ংসিদ্ধ তাকেই মৌলিক ধাতু বলে। এই ধাতুকে তাই স্বয়ংসিদ্ধ ধাতুও বলে। যেমন ✓পড়্, ✓কর্, ✓খা, ✓দে ইত্যাদি।

১। মৌলিক ধাতু

বাংলা ভাষায় মৌলিক ধাতুগুলোকে আবার তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয় :

১। খাঁটি বাংলা ধাতু

২। সংস্কৃত ধাতু

৩। বিদেশী ধাতু

খাঁটি বাংলা ধাতু : যে ক্রিয়াপদগুলো সরাসরি সংস্কৃত থেকে আসেনি সে ধাতুগুলোই খাঁটি বাংলা ধাতু। প্রাকৃত, অপভ্রংশের মাধ্যমে কিংবা অন্য কোনভাবে এসব ধাতু বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন - কাট্, ছাট্, কাদ, জান্, নাচ, ইত্যাদি ধাতু থেকে কাটা, ছাটা, জানা, নাচা ইত্যাদি সাধিত পদ গঠিত হয়।

সংস্কৃত ধাতু : বাংলা ভাষায় যেহেতু বহু সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার রয়েছে, তেমনি অনেক সংস্কৃত ধাতুও রয়েছে। বাংলা ভাষায় যে তৎসম ক্রিয়াপদের ধাতুগুলো ব্যবহৃত হয়, তাকেই সংস্কৃত ধাতু বলে। এই সংস্কৃত ধাতুগুলোর সঙ্গে প্রত্যয় যোগ করে বিশেষ্য বা বিশেষণের ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। যেমন- সংস্কৃত ত্যজ ধাতু থেকে ত্যাগ করা ইত্যাদি ক্রিয়াপদ হয়। আবার এই ধাতু থেকেই ত্যাগ ত্যক্ত, ত্যাজ্য ইত্যাদি পদ হয়।

ঠিক এমনি ✓দৃশ থেকে দৃশ্য, দর্শন ইত্যাদি সাধিত শব্দ তৈরি হচ্ছে।

নিচে সংস্কৃত ধাতু এবং তার সঙ্গে খাঁটি বাংলা ধাতুর অর্থের মিল দেখিয়ে সাধিত শব্দ বা পদ তৈরি করে দেখান হল :

সংস্কৃত ধাতু	সাধিত পদ	বাংলা ধাতু	সাধিত পদ
কৃ	কৃত, কর্তব্য	কর	করা, করে, করন
রক্ষ	রক্ষক, রক্ষণ, রক্ষিত	রাখ	রাখা, রাখি
চব	চব্য, চর্বিত	চিব	চিবানো, চিবাও
হৃ	হরণ, হত	হর	হারা, হার
✓দৃশ	দৃশ্য, দর্শন	দেখ	দেখা, দেখাও
গিম	গমন, গত	যা	যাওন, যাওয়া
ছিদ্	ছিন্ন, ছেদ	ছিঁড়	ছেঁড়া, ছেড়
✓ধৃ	ধৃত, ধর্তব্য, ধারণ	ধর	ধরা, ধরন
✓বচ	বক্তব্য, উক্ত, উপ্ত,		
✓গ	গায়ক, গীত	গা	গায়

বিদেশী ধাতু : বাংলা ভাষায় আরবি, ফারসি ও হিন্দি ভাষা থেকে আসা ক্রিয়ামূলকে বিদেশী ধাতু বলে। [এছাড়া কতগুলো ক্রিয়ামূল রয়েছে যার উৎস তা নির্ণয় করাও কঠিন।এ গুলোকে অজ্ঞাত মূল ধাতু বলে।] বিদেশী ভাষার ধাতুর উদাহরণ হল আট, ঘাট, জম, ঠুট, টান, ভর ধাতু থেকে যথাক্রমে আটক, ঘাটতি, জমানো, টুটা, টানা, ডরানো ইত্যাদি শব্দ।

২। সাধিত ধাতু

যে ধাতু বিশ্লেষণ করলে তার মূলে অন্য একটি ধাতু বা অন্য কোন শব্দ পাওয়া যায়, সে ধাতুকে সাধিত ধাতু বলে। অর্থ ও গঠন বিচার করলে সাধিত ধাতুকে আবার তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

ক. প্রযোজক ধাতু বা ণিজন্ত ধাতু

খ. ধ্বন্যাত্মক ধাতু

গ. নাম ধাতু

ক. মৌলিক ধাতুর সঙ্গে 'আ' প্রতয় যোগ করে প্রযোজক ধাতু বা ণিজন্ত ধাতু হয়। যেমন-

মৌলিক ধাতু কর+আ =(প্রত্যয়) = করা প্রযোজক ধাতু।

মৌলিক ধাতু নাচ+আ = নাচা, নাচায়।

মৌলিক ধাতু ✓দে+আ = দেয়া, দেওয়া।

খ. ধ্বন্যাত্মক ধাতু : ধাতু রূপে যে অনুকারবাচক শব্দগুলো বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয় তাকেই ধ্বন্যাত্মক ধাতু বলে। যেমন- হাপ+আ =হাপা (সে হাপায়)।

কনকন+আ =✓কন্‌কনায়। এরূপ ✓ গল্‌গল, ✓মচ্‌মচা, ✓পিল্‌পিলা, ✓টিল্‌টিলা ইত্যাদি।

গ.নামধাতু :সাধারণ বিশেষ্য বা বিশেষণ শব্দের উত্তর 'আ' প্রত্যয় যোগ করে যে ধাতু হয় তাকে নাম ধাতু বলে। যেমন - হাত+আ= ✓হাতা (হাতানো), লাথি+আ = ✓লাথা = (লাথানো), ঘুম+আ = ঘুমা (ঘুমানো) এমনি, চিড়া থেকে চড়ানো, চমক+আ = চমকা (চমকায়, চমকানো) ইত্যাদি।

বাংলা কবিতার ভাষায় সংস্কৃত বিশেষ্য শব্দ অনেক সময় ধাতুরূপে ব্যবহৃত হয়। বিশেষ করে মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবিতায় ক্রিয়াপদের সঙ্গে ইল প্রত্যয় যোগ উঠিল, প্রকাশিল, প্রবেশিল, বাহিরায়, দানিল, সুকুলিল, শিহরিলা ইত্যাদি।

৩। সংযোগমূলক ধাতু

বিশেষ্য, বিশেষণ অথবা ধ্বন্যাত্মক শব্দের সঙ্গে কর্,হ, দে,পা প্রভৃতি যোগ করে সংযোগমূলক ধাতু হয়। যেমন-

(ক) 'হ' ধাতু যোগে : একমত হ, রাজি হ, সমর্থ হ ইত্যাদি।

(খ) দে ধাতু যোগে : জবাব দে, শাস্তি দে, মার দে, ভোট দে,

(গ) কর ধাতুযোগে : সন্দেহ কর, ভক্তিকর, সম্পাদন কর, লাভ কর, যোগ কর, ঘেরাও কর ইত্যাদি সংযোগমূলক ধাতু।

(ঘ) খা ধাতুযোগে : মার খা, হাবুডুবু খা, ঘুরপাক খা, ঘুষ খা, লাথি খা ইত্যাদি।

(ঙ)'ছাড়' ধাতু যোগে : হাত ছাড়, ঘর ছাড়, পথ ছাড় ইত্যাদি।

(চ) 'পা' ধাতু যোগে : কষ্ট পা, দুঃখ পা, সুখ পা, লজ্জা পা ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ২

এক কথায় জবাব দিন

১। বাংলা ভাষায় মৌলিক ধাতুগুলোকে কয় শ্রেণীতে ভাগ করা যায়?

২। কৃত এবং কর্তব্য কোন ধাতু থেকে গঠিত পদ?

৩। 'হৃ' সংস্কৃত ধাতু বাংলায় কোন ধাতু হিসেবে ব্যবহৃত?

৪। সাধিত ধাতুকে কয় শ্রেণীতে ভাগ করা যায়?

৫। মৌলিক ধাতুর সঙ্গে আ প্রত্যয় যোগে কোন ধাতু হয়?

৬। ধাতু রূপে যে অনুকারবাচক শব্দগুলো বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয় তাকে কি বলে?

৭। সাধারণ বিশেষ্য বা বিশেষণ পদের উত্তর 'আ' প্রত্যয় যোগ করে যে ধাতু হয় তাকে কি বলে?

৮। বিশেষ্য, বিশেষণ অথবা ধ্বন্যাত্মক শব্দের সঙ্গে কর, হা, পা, দে, খা প্রভৃতি যোগ করে যে ধাতু হয় তার নাম কি?

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

উত্তর

১। তিন, ২। 'কৃ', ধাতু থেকে, ৩। হর, ৪। তিন শ্রেণীতে ৫। প্রযোজক নিজন্ত ধাতু

৬। ধ্বন্যাত্মক ধাতু, ৭। নাম ধাতু, ৮। সংযোগ মূলক ধাতু।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. নৈর্বিত্তিক প্রশ্ন :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। নিচের কোনটি সংস্কৃত ধাতু?

ক. হর খ. দৃশ

গ. জম ঘ. কাট

২। কোনটি খাঁটি বাংলা ধাতু?

ক. কৃ খ. টান

গ. হাস ঘ. আট

৩। কোনটি বিদেশী ধাতু?

ক. ডর খ. কৃৎ

গ. চিব্ ঘ. শুন

খ. রচনামূলক প্রশ্ন :

১। ধাতু কাকে বলে? ধাতু কয় প্রকার ও কি কি? প্রত্যেক প্রকার ধাতুর একটি করে উদাহরণ দিন।

২। সাধিত ধাতু কয় শ্রেণীতে বিভক্ত? প্রত্যেকটি শ্রেণীর সংজ্ঞাসহ উদাহরণ দিন।

৩। মৌলিক ধাতু কয়প্রকার ও কি কি? উদাহরণসহ লিখুন।

৪। বিভিন্ন পদের সঙ্গে 'হ', দে, খা, বাস ও পা ধাতুযোগে যৌগিক ক্রিয়াপদ তৈরি করুন?

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

উত্তর

১। খ ২। গ ৩। ক

রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর পাঠগুলো পড়ে নিজে তৈরি করুন।

প্রত্যয়

ভূমিকা

বাংলা ভাষায় শব্দ থেকে নতুন শব্দ তৈরি করার একটি পদ্ধতি হল প্রকৃতি ও প্রত্যয়। প্রকৃতি ও প্রত্যয় সম্পর্কিত আলোচনা তাই বাংলা ব্যাকরণে গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হয়।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

* প্রকৃতি ও প্রত্যয় কাকে বলে তা বলতে ও লিখতে পারবেন।
* প্রত্যয় কত প্রকার তা বলতে ও লিখতে পারবেন।

সংজ্ঞা :

যে সমস্ত বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি ধাতু বা শব্দের শেষে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে তাকে প্রত্যয় বলে।

যেমন- পড়্, একটি ধাতু। ✓ পড়্ এর পর 'আ' যুক্ত করলে হবে ✓পড়্+আ = পড়া। একটি নতুন শব্দ। এখানে 'পড়্' ধাতু এবং 'আ' হল প্রত্যয়।

এমনি দিন+ইক = দৈনিক

✓চল+অন্ত = চলন্ত

প্রত্যয়গুলো কখনো ধাতুর শেষে যুক্ত হয়, কখনো বা শব্দের শেষে যুক্ত হয়। তাই প্রত্যয়ের সাহায্যে যে সকল নতুন শব্দ গঠিত হয় তার উৎস দু'প্রকার। সেজন্যে প্রত্যয় জাত শব্দকে বিশ্লেষণ করলে কখনো ধাতু পাওয়া যায়, কখনো বা শব্দ পাওয়া যায়। প্রত্যয়কে বাদ দিলে শব্দের মূল অংশকেই প্রকৃতি বলে।

সংজ্ঞা

ধাতু বা শব্দ যার সাথে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে সেই মূল অংশকেই প্রকৃতি বলে।

তাই প্রত্যয় নির্ণয় করার সময় অবশ্যই ধাতু এবং শব্দের পার্থক্য সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়-

১। ✓পড় + আ = পড়া

প্রকৃতি প্রত্যয় নতুন শব্দ

২। কাঁচ + আ = কাঁচা

প্রথম প্রত্যয়টি বিশ্লেষণ করে পাওয়া গেল ধাতু এবং দ্বিতীয় প্রত্যয়টি বিশ্লেষণ করে পাওয়া গেল শব্দ। প্রকৃতি তাই দু'প্রকার।

১. ধাতু বা ক্রিয়া প্রকৃতি

২. নাম প্রকৃতি

১। ধাতু বা ক্রিয়া প্রকৃতি : যে শব্দমূল কোন কিছুর নাম না বুঝিয়ে কোনও প্রকার ক্রিয়াকে বোঝায় তাকে বলে ধাতু বা ক্রিয়াপ্রকৃতি বলে। কারণ আমরা আগেই জেনেছি ক্রিয়ার মূলই ধাতু। ওযমন -

✓চল+অন্ত = চলন্ত

✓পড় + উয়া = পড়ুয়া

২। নাম প্রকৃতি : যে শব্দমূলকে কোন প্রকার ক্রিয়া না বুঝিয়ে জাতি, গুণ, বিষয় বা বস্তুকে বোঝায় তাকে নাম প্রকৃতি বলে। যেমন-

তেল+আ = তেলা

হাত+ আ =হাতা

দুটোতেই মূল শব্দটি কোন কিছুর নামকে বোঝাচ্ছে। এক অর্থে নাম প্রকৃতিগুলো আবার মৌলিক শব্দও বটে।

প্রত্যয় আবার দু'প্রকার–

১. কৃৎ প্রত্যয় ও

২. তদ্ধিত প্রত্যয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১

এক কথায় উত্তর দিন :

১। যে সমস্ত বর্ণ বা বর্ণসমসষ্টি ধাতু বা শব্দের শেষে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে তাকে কি বলে?

২। প্রত্যয়ের সাহায্যে যে সমস্ত নতুন শব্দ গঠিত হয় তার উৎস কয় প্রকার?

৩। প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দের মূল অংশকে কি বলে?

৪। প্রকৃতি কয় প্রকার?

৫। যে প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দের মূল অংশটি কোন শব্দকে বোঝায় তাকে কোন প্রকৃতি বলে?

৬। যে প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দের মূল অংশটি ধাতু তাকে কোন প্রকৃতি বলে?

৭। প্রত্যয় কয় প্রকার ও কি কি?

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

উত্তর

১। প্রত্যয়, ২। দুই প্রকার ৩। প্রকৃতি, ৪। দু'প্রকার ৫। নাম প্রকৃতি

৬। ধাতু বা ক্রিয়া প্রকৃতি ৭। দু'প্রকার ক. কৃৎ প্রত্যয়, খ. তদ্ধিত প্রত্যয়

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

* কৃৎ প্রত্যয় কাকে বলে তা বলতে পারবেন।
* কৃৎ প্রত্যয় কত প্রকার তা লিখতে ও বলতে পারবেন।
* কি কি উপায়ে কৃৎ প্রত্যয় যোগে নতুন শব্দ হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সংজ্ঞা

যে সব প্রত্যয় ধাতুর সাথে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে তাকে কৃৎ প্রত্যয় বলে। যেমন -

✓ডুব+আরি = ডুবারি>ডুবুরি

✓চল্+আ = চলা

ধাতুর উত্তর কৃৎ প্রত্যয় যোগে গঠিত শব্দকে কৃদন্ত পদ বা কৃৎপ্রত্যয়ান্ত শব্দ বলে।

বাংলা ভাষায় যেহেতু অন্যান্য ভাষারও বহু শব্দ রয়েছে। তেমনি অন্য ভাষার প্রত্যয়ও বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত কৃৎপ্রত্যয়গুলোকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা -

১. বাংলা কৃৎ প্রত্যয়

২. সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়

৩. বিদেশী কৃৎ প্রত্যয়

[ধাতু বোঝাবার জন্য✓চিহ্ন এবং রূপান্তর বোঝাবার জন্যে > চিহ্ন ব্যবহৃত হল]

বাংলা কৃৎ প্রত্যয় যোগে গঠিত শব্দের উদাহরণ

১. **অ (লুপ্ত) প্রত্যয় যোগে :** ধাতুর পরে 'অ' প্রত্যয়যুক্ত হয়ে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য শব্দ গঠন করে। উচ্চারণের সময় এই 'অ' প্রত্যয়টির অনেক সময় উচ্চারিত হয় না তাই একে লুপ্ত প্রত্যয়ও বলে।

যেমন, ✓চল্+অ = চল, ✓ধর্+অ=ধর, ✓ঝুল+অ=ঝুল। ✓খুঁজ+অ=খোঁজ, (ধাতুর পর 'উ' কার পরিবর্তিত হয়ে 'ও' কার হয়েছে), ✓ঝুক্+অ=ঝোঁক

কখনও কখনও 'অ' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে যে বিশেষণ শব্দটি হয় তা শব্দের দ্বিত্ব, হয়ে নতুন অর্থ প্রকাশ করে।

যেমন, ✓কাঁদ্+অ=কাঁদো

✓ডুব্+অ=ডুবু, [কৃদন্ত পদে 'অ' 'উ'তে পরিণত হয়েছে]

✓উড়্+অ=উড়ু ইত্যাদি

২। **অন্ প্রত্যয় যোগে :** এই প্রত্যয়যোগে গঠিত শব্দ ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যপদ হয়।

✓নাচ্+অন=নাচন, ✓কাঁদ্+অন=কাঁদন, ✓বাঁধ্+অন=বাঁধন, এভাবে বাড়ন, ঝুলন, দোলন, গড়ন, ফলন ইত্যাদি। মাঝে মাঝে আ-কারান্ত ধাতুর সঙ্গেও 'অন্' প্রত্যয়যুক্ত হয়। যেমন–

✓যা+অন=যাওন, ✓ছা+অন=ছাওন, ✓ঝাড়া+অন=ঝাড়ান।

এমনি সাজন, ফুড়ন, গাওন। উচ্চারণের সময় কখনও কখনও 'অন' প্রত্যয়টি ওন হতে পারে।

৩। **'অনা প্রত্যয় যোগে :** ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যপদ হয়।

✓কাঁদ্+অনা = কান্দনা>কাদনা>কান্না

✓দে+অনা = দেনা, ✓পি+অনা= পাওনা, ✓রাধ্+অনা = রাধনা >রান্না। এভাবে ধরনা, খেলনা, কাটনা, দোলনা, ঢাকনা, বাজনা ইত্যাদি।

৪। **অনি প্রত্যয় যোগে :** অনি প্রত্যয় স্বরসঙ্গতির ফলে কখনও উনি, পদে 'উ' লোপ পেয়ে 'নি' হয়ে যায়।

✓কাদ+অনি = কাদুনি, ✓চাহ্+অনি = চাহনি, ✓রাধ+অনি = রাঁধুনি, এমনি কাঁপুনি, নাচুনি, ছাঁকুনি, ইত্যাদি।

৫। **অন্ত প্রত্যয় যোগে :** অন্ত প্রত্যয় যোগে গঠিত শব্দটি ক্রিয়াবাচক বিশেষণ পদ হয়।

✓ফুট্+অন্ত = ফুটন্ত, ✓ফল্+অন্ত = ফলন্ত, ✓পড়্+অন্ত = পড়ন্ত, ✓ডুব+অন্ত = ডুবন্ত। এমনি, ছুটন্ত, জীয়ন্ত, বাড়ন্ত ইত্যাদি।

৬। **'আ' প্রত্যয় যোগে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য এবং বিশেষণ দুটোই হয়।**

✓চল্+আ = চলা, ✓পড়্+আ = পড়া, ✓ফুট+আ = ফোটা, এমনি ছোটা, দেখা, শোনা ইত্যাদি।

৭। **'আই'** প্রত্যয় যোগে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য হয়।

✓যাচ্+আই = যাচাই, ✓বাছ্+আই = বাছাই, ✓বাধ্+আই = বাঁধাই, এমনি করে ঢালাই, চোলাই, খোদাই (✓খুদ্+আই), লড়াই ইত্যাদি।

৮। **'আইত (চলিত ভাষায় আত) প্রত্যয় যোগে :**

✓ডাক্+আইত = ডাকাইত>ডাকাত, ✓সেব্+আইত = সেবাইত

৯। **'আও' প্রত্যয় যোগে গঠিত শব্দ :**

✓ঘির্+আও = ঘেরাও, ✓চড়্+আও = চড়াও, ✓ঢাল্+আও = ঢালাও। এভাবে, ফলাও, ছাড়াও ইত্যাদি।

১০।**আন বা আনি প্রত্যয় যোগে :**

✓জান্+আন = জানানো, ✓ঠক্া+আন = ঠকানো, ✓শুন+আনি = শুনানি, এভাবে পারানি, জুতানো, উড়ানি, জ্বালানি, শাসানি ইত্যাদি।

১১।**আরি বা উরি প্রত্যয় যোগে (সাধারণত কর্মেদক্ষ অর্থে ব্যবহৃত শব্দ গঠিত হয়) :**

✓ডুব্+আরি = ডুবারি>ডুবুরি, ✓ধুন্+আরি = ধুনুরি, ✓পূজ্+আরি = পূজারি ইত্যাদি।

১২।**তা, তি প্রত্যয় যোগে গঠিত শব্দ :**

✓ফির্+তা = ফেরতা, ✓বহ্+তা = বহতা, ✓পড়+তা = পড়ুতা, এমনি বাড়তি, গনতি, কাটতি, কমনি ইত্যাদি।

১৩।**'ই' প্রত্যয় যোগে গঠিত শব্দ :**

✓বুল+ই= বুলি, ✓ভাজ্+ই = ভাজি, ✓বেড়্+ই = বেড়ি, ✓হাস্+ই = হাসি, এভাবে কাশি, চুরি ইত্যাদি।

১৪।**ইয়া, ইলে, ইতে প্রত্যয় যোগে**

✓চড়+ইয়া = চড়িয়া, (সাধারণত অসমাপিকা ক্রিয়া হয়) ✓বস্+ইয়া = বসিয়া, ✓ফির্+ইলে = ফিরিলে, ✓নাচ্+ইতে = নাচিতে, এমনি উঠিতে, ফিরিতে, উঠিলে ইত্যাদি।

১৫।**'উক' প্রত্যয় যোগে :**

✓মিশ্+উক = মিশুক, ✓খা+উকা = খাউকা>খেকো।

১৬।**'অক্' প্রত্যয় যোগে :** ✓মুড়+অক = মোড়ক, ✓চড়্+অক = চড়ক, ✓ঝল্+অক = ঝলক, এমনি দোলক।

আরও অনেক প্রত্যয় নিস্পন্ন শব্দ রয়েছে আপনারা চিন্তা করে শব্দ সংখ্যা বাড়াবার চেষ্টা করুন।

সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়

বাংলা ভাষায় বহু সংস্কৃত কৃৎপ্রত্যয় সামান্য পরিবর্তিত হয়ে বাংলা ভাষায় প্রচলিত রয়েছে।

১। **'অনট' প্রত্যয় যোগে** ('ট', লুপ্ত হয়ে অন থেকে যায়) :

যেমন- ✓নী+অন = নয়ন, ✓শ্রু+অনট = শ্রবণ, ✓কৃষ+অনট>কর্ষন, এমনি করে ✓ভুজ্, ✓পিত, ✓রক্ষ, ✓ভক্ষ, ✓গর্জ, ✓লজ্ঘ, প্রভৃতি ধাতুর সঙ্গে অনট প্রত্যয়যুক্ত হয়ে ভোজন, পতন, রক্ষণ ভক্ষণ, গর্জন ইত্যাদি শব্দ গঠিত হয়।

২। **'ক্ত' প্রত্যয় যোগে** ('ক' লুপ্ত হয়ে 'ত' থেকে যায়) ✓মুচ+ক্ত = মুক্ত, ✓গম+ক্ত = গত, ✓কৃ+ক্ত = কৃত, ✓শ্রুত+ক্ত = শ্রুত, ✓সৃজ্+ক্ত = সৃষ্ট, ✓ভুজ্+ক্ত = ভূত, ✓দুহ্+ক্ত = দুগ্ধ, ✓বচ্+ক্ত= উক্ত, ✓বপ্+ক্ত = উপ্ত।

[ক্ত প্রত্যয় পরে থাকলে ধাতুর ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন হয়। যেমন- ধাতুর পরের বর্ণটি চ ও জ থাকলে সেখানে ক হয়। উপরের উদাহরণে এ পরিবর্তনগুলো লক্ষ্য করা গেছে।]

৩। **ক্তি প্রত্যয়** 'ক' লুপ্ত হয়ে 'তি' হয়। যেমন ✓গম্+ক্তি = গতি, ✓খ্যা+ক্তি = খ্যাতি, ✓বৃধ্+ক্তি = বৃদ্ধি, এমনি শক্তি, দীপ্তি, শান্তি, তৃপ্তি, ভীতি ইত্যাদি।

৪। **'তব্য' প্রত্যয়** (সাধারণত করা, উচিত এই অর্থে ধাতুর পরে যুক্ত হয়) ✓কৃ+তব্য = কর্তব্য, ✓দা+তব্য = দাতব্য, ✓স্মৃ+তব্য = স্মতব্য, ✓দৃশ+তব্য = দ্রষ্টব্য, ✓ গম্+তব্য = গন্তব্য, ✓বচ্+তব্য = বক্তব্য।

৫। **'ণক' প্রত্যয়** যোগে (ণ লোপ পেয়ে 'অক' থাকে) শব্দ = ✓নী+ণক = নায়ক, ✓গৈ+ণক = গায়ক, ✓কৃ+ণক = কারক, ✓গ্রহ+ণক = গ্রাহক এভাবে খাদক, নর্তক, রজক ইত্যাদি।

৬। **'তৃচ' প্রত্যয়** যোগে শব্দ ('চ' লোপ পেয়ে 'তৃ' থেকে যায়)

✓মা+তৃচ = মাতা(তৃ>তা হয়েছে), ✓পা+তৃচ = পিতা, ✓দা+তৃচ = দাতা, ✓কৃ+তৃচ = ক্রেতা

৭। **য্যাণ প্রত্যয়** (য,ণ লোপ পেয়ে 'য'ফলা থেকে যায়]

✓কৃ+য্যান = কার্য, ✓রম+য্যান = রম্য, ✓ধৃ+য্যান =ধার্য

৮। **'অল' প্রত্যয়ে :** (ল লোপ পায় অ থাকে)

✓জি+অল = জয়, ✓ক্ষি+অল = ক্ষয়, ✓ভি+অল = ভয়, এরূপ ক্রোধ, ভেদ, ইত্যাদি।

৯। **'ইন' প্রত্যয় যোগে** ✓জি+ইন = জয়ী, ✓শ্রম+ইন = শ্রমী

১০। **ইষ্ণু প্রত্যয় যোগে** : ✓সহ+ইষ্ণ = সহিষ্ণু, ✓চল+ইষ্ণু = চলিষ্ণু, এরূপ ক্ষয়িষ্ণু, বর্ধিষ্ণু ইত্যাদি।

১১। **নিন প্রত্যয়** (ণ-লুপ্ত হয়ে 'ইন' থাকে, ইন 'ঈ' কার হয়) : যেমন ✓গ্রহ+নিন = গ্রাহী, ✓প্রা+নিন = পায়ী, এরূপ কায়ী, দ্রোহী, স্থায়ী, ইত্যাদি।

নিজেরা আরো প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দ চিন্তা করে উপরে দেয়া নিয়মযোগে বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. নৈর্বিত্তিক প্রশ্ন :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

২। বাংলা ভাষায় কৃৎ প্রত্যয় কত প্রকার?

ক. দুইপ্রকার　　খ. চার প্রকার

গ. তিন প্রকার　　ঘ. পাঁচ প্রকার

৩। 'দেনা' শব্দের সঠিক প্রকৃতি-প্রত্যয় কোনটি?

ক. দে+না　　খ. দে+অনা

গ. দি+না　　ঘ. দা+ইনি

৪। 'মাতা'র সঠিক প্রকৃতি-প্রত্যয় কোনটি?

ক. মা+তা　　খ. ম+আতা

গ. মাতৃ+আ　　ঘ. মা+তৃচ

৫। 'মুক্ত'র সঠিক প্রকৃতি-প্রত্যয় কোনটি?

ক. মুহ+ত　　খ. মুচ+ক্ত

গ. মুক+ত　　ঘ. মু+ক্ত

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

উত্তর

২। গ.　৩। খ　৪। ঘ　৫। খ

নিচের শব্দগুলোর প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্ণয় করুন :

ঝাড়ন =

পাওনা =

দোলনা =

রাঁধুনি =

জীয়ন্ত =

লড়াই =

যাচাই =

ডাকাত =

ঘেরাও =

ডুবুরি =

ফলন্ত =

ডুবুডুবু =

শ্রবণ =

জ্ঞাত =

খ. রচনামূলক প্রশ্ন :

১। কৃৎ প্রত্যয় কাকে বলে উদাহরণসহ লিখুন।

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

* তদ্ধিত প্রত্যয়ের সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
* তদ্ধিত প্রত্যয় কত প্রকার তা লিখতে পারবেন।
* কতগুলো শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় করতে পারবেন।

যে শব্দের মূল অংশটি কোন ক্রিয়া না বুঝিয়ে বস্তু, বিষয় এবং গুণ বোঝায় এগুলোকে নাম প্রকৃতি বলে।

সংজ্ঞা : শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে যে সব প্রত্যয় নতুন শব্দ গঠন করে তাকে তদ্ধিত প্রত্যয় বলে।

যেমন,

চোর+আই = চোরাই

ঢাকা+আই = ঢাকাই

লাজ+উক = লাজুক

এখানে চোর, ঢাকা, লাজুক তিনটি শব্দ মূলই, শব্দ এবং গুণকে নির্দেশ করে। তিনটির একটি প্রকৃতিও ক্রিয়া বা ধাতু নয়। তাই এগুলো তদ্ধিত প্রত্যয়ের উদাহরণ।

বাংলা ভাষায় তদ্ধিত প্রত্যয় তিন প্রকার

১. বাংলা তদ্ধিত
২. সংস্কৃত বা তৎসম তদ্ধিত
৩. বিদেশী তদ্ধিত

নিচে তদ্ধিত প্রত্যয়ের উদাহরণ দেয়া হল

বাংলা তদ্ধিত

১। অ বা ও প্রত্যয় যোগে : কাল+অ = কালো, শিব+অ = শিব, নুলা+অ = নুলো।

২। অট, অটা, অটি, অটিয়া ইত্যাদি প্রত্যয় যোগে গঠিত শব্দ সাদৃশ্য অর্থে বা ভাবার্থে বিশেষ্য বা বিশেষ্যবাচক শব্দ বোঝায়।

দর্প>দাপ+অট = দাপট, ঝাপ+অটা = ঝাপটা, জমা+অট = জমাট, ভরা+অট = ভরাট, এভাবে ঘষটা, বাহুটা নেওটা, পাশুটে ইত্যাদি শব্দ হয়।

স্বর সঙ্গতির ফলে অনেক সময়

ধোয়া+আটিয়া = ধোয়াটিয়া>ধোয়াটে, এবাবে তুলো, তামা+আটিয়া = তামাটিয়া>তামাটে, ভাড়াটে, আষটে, ঝগড়াটে, বোকাটে, লম্বাটে ইত্যাদি শব্দ হয়।

৩। আ প্রত্যয় যোগে সাধারণত স্বার্থ, নিন্দায় বা অনাদরে এবং সম্বন্ধ কোন কিছুর বৈশিষ্ট্য বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

চোর+আ = চোরা, ছাগল+আ = ছাগলা, পাগল+আ = পাগলা, বাঘ+আ = বাঘা, হাত+আ = হাতা, চাল+আ = চালা, তেল+আ = তেলা, জল+আ = জলা।

ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বোঝাতে : হাজির+আ = হাজিরা, চাষ+আ = চাষা।

৪। আই প্রত্যয় সাধারণ ভাবার্থে সম্বন্ধ বোঝাতে বা বিশেষণার্থে ব্যবহৃত হয়।

বিশেষণ : চোর+আই = চোরাই, বড়+আই = বড়াই, মোগল+আই = মোগলাই, এমনি মিঠাই, বামনাই, খাড়াই, সাফাই ইত্যাদি।

'আই' প্রত্যয় অনেক সময় নামের সংক্ষিপ্ত রূপের উত্তরে আদরার্থে বোঝায়।

বলাই (বল রামের সংক্ষিপ্ত), কান+আই = কানাই (কৃষ্ণের) নিমাই

জাত অর্থে = ঢাকা+আই = ঢাকাই।

৫। আউরা (অভিশ্রুতিতে ওয়া) উয়া (অভিশ্রুতিতে ও) প্রত্যয় সাধারণত বিশেষণ, সম্বন্ধ, সংযোগ ইত্যাদি বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

ঘর+আউয়া = ঘরোউয়া>ঘরোয়া, ঘাথউয়া = ঘেয়ো, গা+উয়া = গেঁয়ো, টাকা+উয়া = টেকো, এমনি বেতো, সলো, ঝড়ো, তেলো, ভেতো, গেছো, দেঁতো, গেছো, মেছো ইত্যুদি।

৬। আনি (সংস্কৃত পানীয় অর্থে) আম+আনি = আমানি, নাকানি, চোবানি।

৭। আম, আমো, আমি প্রত্যয় যোগে : ভাব, কর্ম বা অনুকরণার্থে।

ঠক+আমি = ঠকামি, ছেলে+মি = ছেলেমি, পাকা+আমি = পাকামি, এমনি করে পাগলামি ডেপোনি, বোকামি, কুড়েমি ইত্যাদি।

৮। আর, আরি, ইরি, উরি প্রত্যয় যোগে সাধারণ বৃত্তি পেশা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

চাম+আর = চামার, (গ্রাম>গাও) গাঁও,+আর = গাওয়ার>গোয়ার, পূজা+আরি = পূজারি, শাঁখারি, কাসারি, জুয়ারি, ভিখারি ইত্যাদি।

৯। আল প্রত্যয় যোগে গুণ সম্বন্ধ ইত্যাদি বোঝায়, যেমন বঙ্গ+আল = বাঙ্গাল, পাক+আল = পাঁকাল, ছুচ+আল = ছুচাল, এমনি জোরালো, ঝাঁজালো, দাতাল, জমকানো, মাতাল, ঘড়ীআল, ঘোষাল, সিধেল।

১০। ওয়ালা, ওলা প্রত্যয় যোগে : বাড়ি+ওয়ালা = বাড়িওয়ালা, কাপড়ওলা, গাড়িওয়ালা।

১১। আলি ভাবার্থে ও সাদৃশ্যার্থে ব্যবহৃত হয়।

ভাবার্থে : মিতা+আলি = মিতালি, ঘটকা+আলি = ঘটকালি, এমনি চতুরালি

সাদৃশার্থে : রূপালি, সোনালি, গোড়ালি, সুতুলি।

১২। ইয়া প্রত্যয় যোগে সাধারণত কোন কিছুর মত, অনাদরে অতি ঘনিষ্ঠতা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

হাল+ইয়া = হেলে, পাহাড়+ইয়া = পাহাড়িয়া>পাহাড়ে, মাটি+ইয়া = মেটে, এভাবে কুড়ে, নাচুনে, ছোঁয়াচে, আষাঢ়ে কুছলে, ছিচকে ইত্যাদি।

১৩। উ প্রত্যয় যোগে : সাঁতার+উ = সাঁতারু, ঢাল+উ = ঢালু, পিছু।

১৪। উক প্রত্যয় যোগে বিশেষণ বাচক শব্দ হয়।

পেট+উক = পেটুক , মিথ্যা+উক = মিথ্যুক, হিংসুক, লাজুক, নিন্দুক।

১৫। ক, কা, কি, কিয়া, : স্বার্থে, সম্বন্ধে, শব্দের প্রসারে ব্যবহৃত হয়।

মড়+অক = মড়ক, ঢোল+ক= ঢোলক, দমক, দমকা।

১৬। ল প্রসারে লা, লি প্রত্যয়ে দীর্ঘ+ল = দীঘল, পাত+লা = পাতলা, হাত+ল = হাতল, মেঘ+লা = মেঘলা।

আপনি আরও শব্দ চিন্তা করে এভাবে প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় করুন।

সংস্কৃত তদ্ধিত

১। অ (সংস্কৃত প্রত্যয়) প্রত্যয় শব্দের সঙ্গে যুক্ত হলে এর প্রাতিপদিকের (বিভক্তিহীন নাম শব্দকে প্রাতিপদিক বলে) শেষ স্বরের উ-কার ও কারে পরিণত হয়। (ও+অ সন্ধির নিয়মে অব হয়) যেমন মনু+অ = মানব, লঘু+(ষ্ণ)অ = লাঘব, কুরু+অ = কৌরব, গুরু+অ = গৌরব, শিশু+অ = শৈশব। এভাবে রাঘব, মাধব, যাদব, দানব, শৈব (শিব+অ), বৈষ্ণব (বিষ্ণু+অ) ইত্যাদি

জাত অর্থে : পৃথিবী+অ = পার্থিব, দেব+অ = দৈব, হেমন্ত+অ = হৈমন্ত, এভাবে, প্রাকৃত, বৈধ, আরণ্য, সান্ধ্য, পাশব, চৌম্বক, হান্তব, বাস্তব ইত্যাদি।

২। আলু (সংস্কৃত আলুচ) অভ্যাস অর্থে, ব্যবহৃত হয়। নিদ্রা+আলু = নিদ্রালু, শ্রদ্ধা+আলু = শ্রদ্ধালু, দয়ালু, ভাবালু।

৩। 'ই' প্রত্যয় সাধারণত : পুত্র অর্থে ব্যবহৃত হয়। দশরথ+ই = দাশরথি, সুমিত্রা+ই = সৌমিত্রি, পর্বত+ই = পার্বতি, জনক+ই = জানকি ইত্যাদি।

৪। 'ইক' প্রত্যয় যোগে সম্বন্ধ, জাত, নিযুক্ত ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

তর্ক+ইক = তার্কিক, ন্যায়+ইক = নৈয়ায়িক, পুরাণ+ইক = পৌরানিক, পরলোক+ইক = পারলৌকিক, সমাজ+ইক = সামাজিক, সর্বজন+ইক = সার্বজনীন, দেহ+ইক = দৈহিক।

এমনি, মৌখিক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, জাগতিক, ঐচ্ছিক, আধুনিক, রাজনীতিক, সাম্প্রতিক ইত্যাদি।

৫। ইত (জাত অর্থে) পল্লব+ইত = পল্লবিত, এভাবে অঙ্কুরিত, কণ্টকিত, লজ্জিত, দুঃখিত।

৬। ইন, বিন, অস্তি (আছে এই অর্থে) পক্ষ+ইন = পক্ষী, ফণা+ইন্ = ফণী, মেধা+বিন = মেধাবী, এভাবে তপস্বী, মায়াবী, তেজস্বী।

৭। ইমা (ইমন থেকে) ভাবার্থে।

নীল+ইমা (ইমন) = নীলিমা, রক্তিমা, তনিমা, মহৎ+ইমা = মহিমা, অনিমা ইত্যাদি।

৮। ইল (আছে অর্থে) পঙ্ক ইল = পঙ্কিল, মাংস+ল = মাংসল, শীত+ল = শীতল, ফেন+ইল = ফেনিল, পাংশুল।

৯। ইন প্রত্যয় যোগে শব্দ : নব+ইন = নবীন, গ্রাম+ইন = গ্রামী, কুল+ইন = কুলীন।

১০। ঈয় প্রত্যয় যোগে : দেশ+ঈয় = দেশীয়, রাজ+ঈয় = রাজকীয়, ধর্ম+ঈয় = ধর্মীয়।

১১। তা, ত্ব প্রত্যয় যোগে : মূর্খ+তা = মুর্খতা, অলস+তা = অলসতা, এভাবে, কাতরতা, সাধুতা, শালীনতা, নিপুণতা, চপলতা, নেতৃ+ত্ব = নেতৃত্ব, পিতৃ+ত্ব = পিতৃত্ব, এভাবে মাতৃত্ব, ভ্রাতৃত্ব, কর্তৃত্ব।

১২। 'তন' প্রত্যয় যোগে সাধারণত : কালবাচক অব্যয়ের পরে বসে এই প্রত্যয় শব্দ তৈরি করে। যেমন- পূর্ব+তন = পূর্বতন, পুরা+তন = পুরাতন, চিরম+তন = চিরন্তন ইত্যাদি।

১৩। মৎ = বৎ মৎ প্রত্যয়ের 'ম' স্থলে 'ব' হয়। কিংবা, মনে, বনে হয়।

গুণ+বৎ = গুণবান, বল+বৎ = বলবান, জ্ঞান+বৎ = জ্ঞানবান, ধনবতী, ভাগ্যবতী ইত্যাদি।

১৪। ময় (মরট) = ব্যাপ্তি বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

জল+ময় = জলময়, মৃৎ ময় = মৃন্ময়, মধুময়, বাষ+ময় = বাঙ্ময়, চিৎ+ময় = চিন্ময় ইত্যাদি।

১৫। 'য' প্রত্যয় যোগে : সেনাপতি+য = সৈন্যপত্য।

পুরোহিত+য = পিরেহিত্য, আদি+য = আদ্য, তালু+য = তালুব্য, প্রাচ্+য = প্রাচ্য, স্থির+য = স্থৈয্য, ধীর+য = ধৈর্য, বিষম+য = বৈষম্য। এভাবে, কার্পণ্য, আধিক্য, ঔদার্থ, সাম্য, পাণ্ডিত্য ইত্যদি।

১৬। 'র' আছে অর্থে ব্যবহৃত হয়। মুখ+র = মুখর, উষ+র= উষর, মধু+র = মধুর, পাণ্ডুর।

১৭। বৎ প্রত্যয় সাধারণত তুলনার্থে ব্যবহৃত হয়।

চন্দ্র+বৎ = চন্দ্রবৎ, পিতৃ+বৎ = পিতৃব্য, পুত্রবৎ, ভ্রাতৃবৎ

১৮। 'শ' আছে অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন - রোম+শ = রোমশ/লোমশ, গিরি+শ= গিরিশ ইত্যাদি।

১৯। সাৎ প্রত্যয় যোগে : আত্ম+সাৎ = আত্মসাৎ

বিদেশী তদ্ধিত

১। আনা > আনি প্রত্যয় যোগে : বাবু+আনা = বাবুয়ানা, গরিব+আনা = গরিবানা, বিবি+আনা = বিবিয়ানা, মুরুব্বি+আনা = মুরুব্বিআনা।

২। 'ওয়ান' প্রত্যয় যোগে : গাড়ি+ওয়ান = গাড়োয়ান, দ্বার+ওয়ান = দারোয়ান, এভাবে কোচওয়ান।

৩। খানা প্রত্যয় যোগে : বৈঠক+খানা = বৈঠকখানা, চিড়িয়া+খানা = চিড়িয়াখানা

৪। খোর প্রত্যয় যোগে : ঘুষ+খোর = ঘুষখোর, এমনিকরে গাজাখোঁর, মদখোর, আফিখোর, নেশাখোর।

৫। গর, গিরি প্রত্যয় যোগে : কারি+গর = কারিগর, বাবু+গিরি = বাবুগিরি, গুরু+গিরি = গুরুগিরি, দাতাগিরি, কেরানিগিরি, নেতাগিরি, গুন্ডাগিরি ইত্যাদি।

৬। চা, চি, প্রত্যয় যোগে : তবল+চি = তবলচি, মশাল+চি = মশালচি, খাঞ্জাচি, বাবুর্চি ইত্যাদি।

৭। দান, দানি প্রত্যয় যোগে : ফুল+দানি = ফুলদানি, কলম+দান = কলমদান, এভাবে আতরদান, ধূপদান, বাতিদান, মোমদানি ইত্যাদি।

৮। দার প্রত্যয় যোগে : দোকান+দার = দোকানদার, বাজন+দার = বাজনাদার, অংশী+দার = অংশীদার, ভাগীদার, জমিদার, হাওলাদার, দফাদার, খবরদার।

৯। নবিশ (লেখার কাজে ব্যবহৃত অর্থে) : নকল+নবিশ= নকলনবিশ, শিক্ষা+নবিশ = শিক্ষানবিশ, হিসাব+নবিশ = হিসাবনবিশ।

১০। বন্দ, বন্দী অর্থে : নজর+বন্দী = নজরবন্দী, বাক্স+বন্দী = বাক্সবন্দী, গলা+বন্ধ = গলাবন্ধ, কোমরবন্ধ।

১১। বাজ (খারাপ অর্থে) : ধোঁকা+বাজ = ধোঁকাবাজ, ধড়ি+বাজ = ধড়িবাজ, চাঁদা+বাজ = চাঁদাবাজ, চাপা+বাজ = চাপাবাজ। এভাবে চালবাজ, গুলবাজ, দাঙ্গাবাজ, ফন্দিবাজ

১২। সই বা সহি (যোগ্য অর্থে) : মানান+সই = মানানসই, টেক+সই = টেকসই, লাগসই, প্রমানসই, মাপসই ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৩

ক. নৈর্বিত্তিক প্রশ্ন :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। তদ্ধিত প্রত্যয় কত প্রকার?

ক. দুই　　খ. তিন

গ. চার　　ঘ. পাঁচ

২। শব্দের সঙ্গে যে সব প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে তাকে বলে

ক. তদ্ধিত প্রত্যয়　　খ. ধাতু প্রকৃতি

গ. কৃৎ প্রত্যয়　　ঘ. নাম প্রকৃতি

৩। নাম প্রকৃতিকে এক অর্থে বলা যায়

ক. যৌগিক শব্দ　　খ. মৌলিক শব্দ

গ. তৎসম শব্দ　　ঘ. বিদেশী শব্দ

৪। বিভক্তিহীন নাম শব্দকে

ক. ক্রিয়া বিভক্তি বলে　　খ. প্রত্যয় বলে

গ. ধাতু বলে　　ঘ. প্রাতিপদিক বলে

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

উত্তর

১। খ,　২। ক　৩। খ　৪। ঘ

নিচের শব্দগুলোর প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর

প্রকৃতি + প্রত্যয়

জটা =

জমাট =

মেটে =

মৃন্ময় =

মেছো =

ছেলেমি =

রাঘব =

পাণ্ডব =

নেতৃত্ব =

ঘুষখোর =

চাঁদাবাজ =

প্রাচ্য =

টেকসই =

গ্রাম্য =

মেধাবি =

দৈনিক =

সাংবাদিক =

চপলতা =

মধুর =

দাতাগিরি =

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. নৈর্বিত্তিক প্রশ্ন :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। কোন শব্দটি প্রত্যয়ের উদাহরণ?

ক. হাত　　খ. গোপ

গ. মা　　ঘ. জমাট

২। ধাতু বা শব্দের পর ভিন্ন ভিন্ন অর্থে যে বর্ণ বা বর্ণসমূহ যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে সেগুলো

ক. সমাস　　খ. উপসর্গ

গ. প্রত্যয়　　ঘ. কারক

৩। কোনটি তদ্ধিত প্রত্যয়ের উদাহরণ?

ক. মিশুক　　খ. শ্রবণ

গ. দারোয়ান　　ঘ. ঢাকাই

৪। কোনটি কৃৎ প্রত্যয়ের উদাহরণ?

ক. আধুরি　　খ. রক্ষক

গ. দৈন্য　　ঘ. শাসাল

৫। কোন শব্দটি বিদেশী প্রত্যয়ের উদাহরণ?

ক. দাপট　　খ. ফুলদানি

গ. গমন　　ঘ. বিজ্ঞান

৬। ঘড়ীয়াল শব্দের সঠিক প্রত্যয় কোনটি?

ক. ঘড়+ইয়াল　　খ. ঘড়ী+আল

গ. ঘ+ড়িয়াল　　ঘ. ঘড়ীয়া+ল

৭। কোন শব্দে প্রত্যয় আদরার্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

ক. ঢাকাই　　খ. লাজুক

গ. বলাই　　ঘ. গেঁয়ো

৮। কোন শব্দটিতে প্রত্যয় 'জাত' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

ক. পাবনাই　　খ. বড়াই

গ. ডাক্তার　　ঘ. লেজুড়

৯। কোন শব্দটিতে প্রত্যয় সাদৃশার্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

ক. ছোয়াচ　　খ. চাঁদপানা

গ. লাজুক　　ঘ. পূজারী

উত্তর

১। ঘ,　২। গ　৩। ঘ　৪। খ,　৫। খ　৬। খ,　৭। গ,　৮। ক,　৯। খ

খ. রচনামূলক প্রশ্ন :

১। প্রত্যয় কাকে বলে ও কয় প্রকার উদাহরণসহ লিখুন। বাংলা সাহিত্যে প্রত্যয়ের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিন।

২। কৃৎ প্রত্যয় ও তদ্ধিত প্রত্যয়ের পার্থক্য উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

৩। প্রকৃতি প্রত্যয় নির্ণয় করুন।

সাহিত্যিক, দর্শনীয়, শ্রদ্ধাবান, ধড়িবাজ, পানীয, পার্থিব, পৌরহিত্য, জীয়ন্ত, কুশর, জ্যান্ত, ভূমিসাৎ, হলদে, ডাকাত, চড়াই, বাছাই, গন্তব্য, বসতি, চাহনী, শৈশব, বহতা, কাঁদুনে, জলো, তালব্য, সাংবাদিক, আর্থিক।

৪। ধাতু থেকে শব্দ এবং শব্দ থেকে নতুন শব্দ কিভাবে সাধিত হয় উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

শব্দের শ্রেণীবিভাগ

ভূমিকা

বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে অর্থের দিক থেকে কিভাবে ভাগ করা যায় তা জানা সবার জন্যই জরুরি। একটি শব্দ বিশ্লেষণ করলে যে অর্থ আমরা পাই কার্যক্ষেত্রে সে অর্থে শব্দটি আমরা ব্যবহার করি না। সে কারণেই শব্দসমূহকে আবার অর্থের দিক থেকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

১. বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে মোট কয়ভাগে ভাগ করে বিচার করা যায় তা লিখতে পারবেন।

২. অর্থের দিক থেকে শব্দ কত প্রকার ও কি কি তা বলতে ও লিখতে পারবেন।

৩. অর্থের দিক থেকে বিভক্ত প্রত্যেক প্রকার শব্দ সম্পর্কে উদাহরণসহ লিখতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

আমরা জানি ধ্বনিই হল শব্দের মূল অংশ। একাধিক ধ্বনির সমন্বয়ে শব্দ হয়। কিন্তু সব ধ্বনিই শব্দ নয়। যেমন- বজ্রের শব্দ, কুকুরের ডাক, ব্যাঙের ডাক ইত্যাদি অর্থহীন ধ্বনি। কাজেই একাধিক ধ্বনি সমন্বয়ে গঠিত যে শব্দ স্পষ্ট অর্থ প্রকাশ করে তাকেই শব্দ বলে। বাংলা ভাষায় বিভিন্ন ধরনের শব্দ রয়েছে। এ শব্দগুলোকে তিন দিক থেকে বিচার করা যায়।

১. শব্দের গঠনগত দিক

২.শব্দের উৎসের দিক

৩.শব্দের অর্থমূলক দিক

অর্থের দিক থেকে বিচার করলে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দসমূহকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা -

১. যৌগিক শব্দ

২. রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ

৩. যোগরূঢ় শব্দ

কোনো শব্দকে বিশ্লেষণ করলে, শব্দটির গঠন এবং ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করা যায়। শব্দের বিশ্লিষ্ট অংশ থেকে যে অর্থ বোঝা যায়, তাকেই সেই শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বলে।

আর ভাষা ব্যবহার করার সময় শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, কিংবা শব্দটির যে অর্থ প্রচলিত তাকেই শব্দের মুখ্য বা প্রধান অর্থ বা ব্যবহারিক অর্থ বলে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় কিছু খাঁটি বাংলা শব্দ আছে, যে শব্দগুলোকে বিশ্লেষণ করলে বিশ্লিষ্ট অংশের কোন অর্থই হয় না। সুতরাং এমন শব্দের ক্ষেত্রে বুৎপত্তিগত অর্থের প্রশ্ন ওঠে না। এসব শব্দের কেবলমাত্র ব্যবহারিক অর্থ হয়। যেমন- খোকা, খুকু, ঝিঙ্গা, ডাহা ইত্যাদি।

যৌগিক শব্দ

যে শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ ও ব্যবহারিক অর্থের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, সেই শব্দগুলোকে যৌগিক শব্দ বলে। যেমন- পাঠক শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় -

✓পঠ্+অক = পাঠক (পাঠ করে যে)

এমনি, ✓পড়্+উয়া = পড়ুয়া (যে পড়ে)

✓গৈ+অক = গায়ক (গান করে যে)

✓পচ্+অক = পাচক (রান্না করে যে)

প্রত্যেকটি উদাহরণে দেখা যাচ্ছে শব্দগুলোর অর্থ প্রকৃতি ও প্রত্যয় অনুযায়ীই হয়েছে। অর্থাৎ শব্দগুলোর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও ব্যবহারিক অর্থের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তাই এগুলো যৌগিক শব্দ। এমনি- বাবুয়ানা, মধুর, নিন্দুক, মিতালি, মাল-গাড়ি, লেখক, দাতা, সবই যৌগিক শব্দের উদাহরণ।

রূঢ়ি শব্দ

যে শব্দের অর্থ প্রত্যয় বা উপসর্গযোগে গঠিত হলেও মূল অর্থ প্রকাশ না করে অন্য কোনো অর্থ প্রকাশ করে তাকে রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ বলে।

আরো সহজ করে বলা যায় বুৎপত্তি বিশ্লেষণ করে যে শব্দের অর্থ বোঝা যায় না তাকে রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ বলে। যেমন- হস্তী শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় : হস্ত+ইন (যার হাত আছে) কিন্তু শব্দটি হাতি নামক একটি বিশেষ প্রাণীকে বোঝাচ্ছে।

এমনি,

কুশ+অল (কুশ আহরণকরে যে) কুশল কিন্তু এর ব্যবহারিক অর্থ নিপুণ বা ভালো।

বাঁশ+ই = বাঁশি (বাঁশ দিয়ে তৈরি সব বস্তুকে না বুঝিয়ে একটি বিশেষ বাদ্যযন্ত্রকে বোঝাচ্ছে)।

জেঠামি (পাকামি অর্থে ব্যবহৃত) পাঞ্জাবি (বিশেষ ধরণের জামা; অথচ বুৎপত্তিগত অর্থ পাঞ্জাবের লোক)।

সন্দেশ = (সংবাদ না বুঝিয়ে বিশেষ ধরনের মিষ্টি বিশেষ)।

তৈল = তেল থেকে তৈরি না বুঝিয়ে সব ধরনের তেল বোঝায়)।

শুশ্রূষা, প্রবীণ, ছেলেমি ইত্যাদি রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দের উদাহরণ।

যোগরূঢ় শব্দ

যে সব শব্দের মুখ্য বা ব্যবহারিক অর্থ এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন নয়, কিন্তু অর্থটি সংকুচিত অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই ধরনের শব্দগুলো সমাসবদ্ধ হয়।

অন্যভাবে বলা যায়, যে সমাসবদ্ধ পদসমূহ সমস্যমান পদগুলোর অর্থ প্রকাশ না করে ভিন্ন অর্থকে প্রকাশ করে সে শব্দসমূহকে যোগরূঢ় শব্দ বলে। যেমন- সরোজ= সরোবরে জন্মে যা, সরোজ শব্দের অর্থ তাহলে সরোবরে জন্মানো সব জিনিসকে বোঝানো উচিত ছিল। কিন্তু এর ব্যবহারিক অর্থ পদ্ম।

ঠিক তেমনি জলদ = জল দেয় যে (কিন্তু কেবল মেঘ অর্থে ব্যবহৃত হয়)।

সুহৃদ= সুন্দর হৃদয় যার (ব্যবহারিক অর্থ বন্ধু)।

রাজাপুত = রাজার পুত্র (রাজপুত্র না বুঝিয়ে বিশেষ জাতিকে বুঝিয়েছে।)

মহাযাত্রা=মহা সমারোহে যে যাত্রা (কিন্তু এর ব্যবহারিক অর্থ মৃত্যু)।

ঠিক এমনি, পঙ্কজ, জলধি, অসুখ, পরিবার ইত্যাদি যোগরূঢ় শব্দের উদাহরণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১

ক. নৈর্বিত্তিক প্রশ্ন :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে কটি শ্রেণীতে ভাগ করে বিচার করা হয়?

ক. দুই শ্রেণীতে　　খ. তিন শ্রেণী

গ. পাঁচ শ্রেণীতে　　ঘ. ছয় শ্রেণীতে

২। যে শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও ব্যবহারিক অর্থ এক হয় তাকে বলা হয়

ক. যৌগিক শব্দ　　খ. যৌগিক রূঢ়

গ. মৌলিক বিদেশী শব্দ　　ঘ. রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ

৩। যে শব্দের অর্থ সমস্যমান পদসমূহের অর্থকে প্রকাশ না করে বিশিষ্ট অর্থকে প্রকাশ করে তাকে—

ক. রূঢ়ি শব্দ　　খ. প্রত্যয় বাচক শব্দ

গ. যোগরূঢ় শব্দ　　ঘ. যৌগিক শব্দ

৪। কোনটি যোগরূঢ় শব্দের উদাহরণ?

ক. কুশল　　খ. পাঠক

গ. পঙ্কজ　　ঘ. পড়ুয়া

৫। কোনটি রূঢ় শব্দের উদাহরণ?

ক. পাচক　　খ. সন্দেশ

গ. মহাযাত্রা　　ঘ. দাতা

৬। কোনটি যৌগিক শব্দের উদাহরণ?

ক. জলধি　　খ. পাঞ্জাবি

গ. নিন্দুক　　ঘ. বাঁশি

খ. রচনামূলক প্রশ্ন :

১. বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে মোট কয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করে বিচার করা যায়? শ্রেণীগুলোর নাম লিখুন।

২. শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এবং ব্যবহারিক অর্থ কাকে বলে উদাহরণসহ বুঝিয়ে দিন।

৩. অর্থ অনুসারে বাংলা ভাষার শব্দ কয়প্রকার ও কি কি? উদাহরণসহ লিখুন।

৪. রূঢ় বা রূঢ়ি এবং যোগরূঢ় শব্দের পার্থক্য কি? উদাহরণসহ বুঝিয়ে দিন।

৫. নিম্নলিখিত শব্দগুলোর ব্যুৎপত্তিগত ও ব্যবহারিক অর্থ লিখুন-

পাঞ্জাবি, হস্তী, সরোজ, জেঠামি, কুশল, গায়ক, মালগাড়ি, সুহৃদ, জলদ, রাজপুত, মহাযাত্রা, কুম্ভকার।

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

উত্তর

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর নিজেরাই লিখুন। কেবল সঠিক উত্তরগুলো দেয়া হল

১। খ,　২। ক,　৩। গ,　৪। গ,　৫। খ　৬। গ

পদ-প্রকরণ

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

১. পদ কাকে বলে তা লিখতে পারবেন।

২. পদের প্রকারভেদ ও নাম লিখতে পারবেন।

৩. বাংলা পদের বৈশিষ্ট্য লিখতে পারবেন।

পদ : বাক্যে ব্যবহৃত অবস্থান পরিচায়ক চিহ্নযুক্ত বা বিভক্তিযুক্ত শব্দের নাম পদ।

কেবল শব্দ ও ধাতু ভাষায় ব্যবহৃত হয় না। ভাষায় ব্যবহৃত হওয়ার জন্যে শব্দ ও ধাতুর সঙ্গে বিভক্তির যোগ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কেননা, বাক্যে অর্থাৎ ভাষায় প্রত্যেকটি শব্দ ব্যবহারের একটি নির্দিষ্টস্থান আছে। কথায় যেখানে যে শব্দের ব্যবহার প্রয়োজন সেখানে সে শব্দের ব্যবহার না হলে কথার অর্থ কেউ বুঝতে পারে না। যেমন-

"মানুষ বাঘ মারে"।

এই বাক্যটি মানুষ শব্দ প্রথম, বাঘ শব্দ দ্বিতীয় এবং মারে শব্দ তৃতীয় স্থানে অবস্থিত। এর প্রথম দুটি শব্দের স্থান পরিবর্তন করে দিলে বাক্যটি দাঁড়ায়- বাঘ "মানুষ মারে"। (Tigers kill man)), এতে বক্তার বক্তব্য একেবারেই আলাদা হয়ে যায়। কাজেই, বাক্যের শব্দ বসানোর স্থান নির্ণয় করার জন্য শব্দের সঙ্গে কতগুলো চিহ্ন বা বিভক্তি (যেমন - শব্দ বিভক্তি, ক্রিয়া বিভক্তি) যোগ করতে হয়। বাক্যে ব্যবহৃত এরকম অবস্থান পরিচায়ক চিহ্নযুক্ত (অর্থাৎ বিভক্তিযুক্ত) শব্দের নাম পদ।

পদ-বিভাগ

বাংলা ভাষায় তৎসম, তদ্ভব, দেশী, বিদেশী প্রভৃতি যত প্রকারের শব্দ আছে, সেগুলোকে মোট দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

ক. নাম-পদ বা প্রাতিপদিক

খ. ক্রিয়া পদ

প্রাতিপাদিকের সঙ্গে নাম বিভক্তি যুক্ত হয়ে নামপদ গঠিত হয়। এই নাম বিভক্তির নাম কারক-বিভক্তি।

ধাতুর সঙ্গে ক্রিয়া-বিভক্তি যুক্ত হয়ে ক্রিয়া পদ গঠিত হয়। প্রাতিপদিক বা নাম-পদগুলোকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন বিশেষ্য, সর্বনাম, বিশেষণ এবং অব্যয়।

চিত্রের সাহায্যে পদবিভাগ এভাবে দেখানো যায় :-

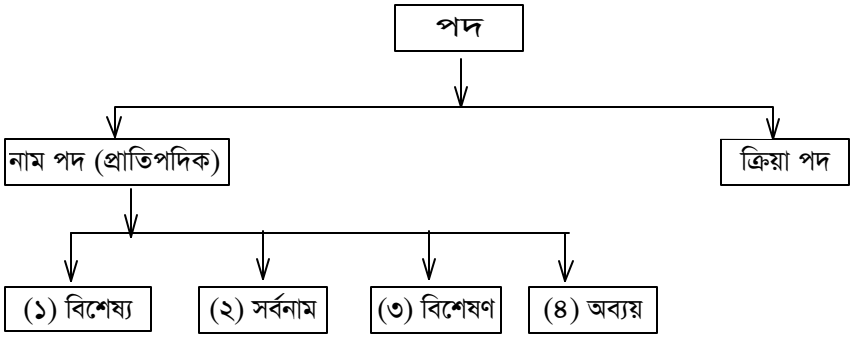

বাংলা পদের বৈশিষ্ট্য

শব্দ বিভক্তি সাধারণত, বাক্যে শব্দ বসাবার স্থান নির্দেশ করে, শব্দ যথাস্থান থেকে সরে গেলে অর্থের দিক থেকে অনর্থ ঘটে। আবার এমনও দেখা যায় স্থান ঠিক আছে অথচ বিভক্তি নেই। এ যেন সভায় বসবার জায়গা আছে নির্দিষ্ট কিন্তু বসার জন্য কোন আসন দেখা যায় না। এ অবস্থায় অগত্যা মাটিতে বসতে বাধ্য হবার মতই শব্দ বিনা বিভক্তিতে ঠিক স্থানেই বসে। অতএব বাংলা পদের এই অবস্থাকে শূন্য বিভক্তি বললে সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। তবে শূন্য বিভক্তি দ্বারা এই বোঝানো হয় যে, শব্দের বসবার ক্রম ঠিক আছে, কিন্তু বিভক্তি শূন্য অবস্থায়। বাংলা ক্রিয়া পদেও বিভক্তি হয়। এটাই বাংলা পদের বৈশিষ্ট্যের অন্যতম। অনুজ্ঞায় অনেক ক্ষেত্রে ধাতুর মূল রূপটি ক্রিয়ারূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন- তুই আজ যা, কাল আসিস। "তুই গরুর মতো খা আর কুকুরের মতো মর।"

বাংলা পদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

বাংলা পদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পদের প্রকারভেদ পাঁচ রকম হয়ে থাকে। যেমন -

ক) বিশেষ্য,

খ) সর্বনাম

গ) বিশেষণ

ঘ) অব্যয়

ঙ) ক্রিয়া

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১

ক. নৈর্বিত্তিক প্রশ্ন :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। পদ বলতে বোঝায়-

ক. বিভক্তিযুক্ত শব্দের পদ।

খ. ধাতুর সঙ্গে বিভক্তিযুক্ত হয়ে গঠিত পদ।

গ. বাক্যে ব্যবহৃত যে কোনো শব্দ পদ।

ঘ. বাক্যে ব্যবহৃত অবস্থান পরিচায়ক চিহ্নযুক্ত শব্দের নাম পদ।

২। পদ কয় প্রকার-

ক. পাঁচ প্রকার　　খ. দুই প্রকার

গ. তিন প্রকার　　ঘ. চার প্রকার

৩। প্রাতিপদিকের সঙ্গে নাম বিভক্তি যুক্ত হয়ে গঠিত হয়-

ক. ক্রিয়া বিভক্তি　　খ. কারক বিভক্তি

গ. নামপদ　　ঘ. বিশেষণ

খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন

১। বাক্যে ব্যবহৃত -------- চিহ্নযুক্ত বা বিভক্তিযুক্ত শব্দের নাম ---------- ।

২। ধাতুর সঙ্গে -------- যুক্ত হয়ে ----------গঠিত হয়।

৩। প্রাতিপদিক বা ------ গুলোকে ---------- ভাগ করা যায়।

৪। বিশেষ্য ------ বিশেষণ এবং -------- ।

৫। বাংলা পদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী -------- প্রকারভেদ ---------- ।

সংজ্ঞা লিখুন : পদ, প্রতিপাদিক পদ, ক্রিয়া পদ।

উত্তর

১। ঘ,　২। খ,　৩। গ

শূন্যস্থান :

১। অবস্থান, পরিচায়ক পদ　২। ক্রিয়াবিভক্তি, ক্রিয়া পদ,　৩। নামপদ, চার ভাগে　৪। সর্বনাম, অব্যয়

৫। পদের, পাঁচ রকম

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার পড়ুন ও নির্দেশ মতো কাজ করুন।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

১। বিশেষ্য পদের সংজ্ঞা লিখতে পারবেন।

২। উদাহরণসহ সর্বনাম পদের সংজ্ঞা লিখতে পারবেন।

৩। বিশেষণ পদ কাকে বলে তা লিখতে পারবেন।

৪। অব্যয় পদ কি তা লিখতে পারবেন।

৫। ক্রিয়া পদের সংজ্ঞা এবং সমাপিকা ক্রিয়া ও অসমাপিকা ক্রিয়ার পার্থক্য লিখতে পারবেন।

ক. বিশেষ্য পদ

বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত কোন ব্যক্তি, বস্তু, গুণ, স্থান, কাল, ভাব ও ক্রিয়া প্রভৃতির নামকে বিশেষ্য পদ বা নাম-পদ বলে।

বিশেষ্য পদ পাঁচ প্রকার

১. **সংজ্ঞাবাচক** : পাঞ্জাব, পদ্মা, হিমালয় ইত্যাদি।

২. **বস্তুবাচক** : পানি, বাতাস, লবণ, চিনি, কাপড় ইত্যাদি।

৩. **জাতিবাচক** : পর্বত, নদী, মানুষ, মুসলিম, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি।

৪. **গুণবাচক** : দয়া শৌর্য, মাধুর্য, দৃঢ়তা, দারিদ্র্য ইত্যাদি।

৫. **ক্রিয়াবাচক** : শোয়া, বসা, চলা, ধ্যান, দর্শন, শ্রবণ।

প্রভাত, সন্ধ্যা, মধ্যাহ্ন প্রভৃতি সময়বাচক এবং গণ বৃন্দ শ্রেণী প্রভৃতি নাম সমষ্টিবাচক বিশেষ্য। এরা জাতিবাচকেরই অন্তর্গত। অনেকে আবার পৃথকভাবে নির্দেশ করে থাকেন।

অনেক ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম লক্ষণীয় :

১. ব্যক্তিবাচক বিশেষ্য বিশেষ অর্থে জাতিবাচক হয়ে বসে। যথা - গৃহে গৃহে বিভীষণ।

২. বস্তুবাচক বিশেষ্য গুণবাচক হয়ে বসে। যথা- মুখে মধু, অন্তরে বিষ।

৩. কখনো কখনো ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বস্তুবাচকে পরিণত হয়। যথা-
আমার পাওনা আদায় কর। রবীন্দ্রনাথের রচনাগুলো ভাবগম্ভীর।

খ. সর্বনাম পদ

বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত বিশেষ্য পদের পরিবর্তে যে পদ ব্যবহৃত হয়, তাকে সর্বনাম পদ বলে।

সর্বনাম পদের প্রকারভেদ বিভিন্নভাবে হতে পারে। নিম্নে এগুলো আলোচনা করা হলো :

১। **ব্যক্তিবাচক সর্বনাম :** সে, কে, যে, যিনি, আপনি, উনি, ইনি, তুমি, আমি প্রভৃতি। যেমন– তুমি কোথায় যাও, সে ঢাকা যাবে।

২। **প্রশ্নবাচক সর্বনাম :** কে, কি, কোন্ প্রভৃতি। যেমন– কে কে এসেছে? আমাকে কি বলতে চাও?

৩। **নির্দেশক সর্বনাম :** এটা, ওটা, তা, এই, ওই প্রভৃতি। যেমন- ওটা তুমি নাও, আমি এটা নেব।

৪। **সম্বন্ধবাচক সর্বনাম :** যে, যিনি, যা, তা, যারা, তারা প্রভৃতি। যেমন- যে সকলের আগে পৌঁছতে পারবে - সেই জিতবে। যাদের অপমান করেছ, তাদের কাছে ক্ষমা চাও।

৫। **পরিমাণবাচক সর্বনাম :** যত, তত, কত, এত প্রভৃতি। যেমন- যত বেশি কিনবে তত লাভ হবে।

৬। **আত্মবাচক সর্বনাম :** স্ব, নিজে, আপনি প্রভৃতি। যেমন- সে স্বগৃহে আসবে। তার নিজের মত আমার মতের বিপরীত।

সর্বনাম 'তুমি' পদ সম্ভ্রমার্থে 'আপনি' ও তুচ্ছার্থে 'তুই' হয়ে থাকে।

৭। **বিশেষণরূপে ব্যবহৃত সর্বনাম :** যে, যেই, সে, সেই, এ এই, কত, যত, তত, এত প্রভৃতি সর্বনাম বাংলায় বিশেষণরূপে বহু ব্যবহৃত, যেমন- যে-জন, সেই লোক, এতদিন, ততকাল, কতজন, এইলোক, ঐ ব্যক্তি।

৮। **দ্বিরুক্ত সর্বনাম :** পরস্পর (পর+পর), অপরাপর (অপর+অপর), অন্যান্য (অন্য+অন্য)। তারা পরস্পর একে অন্যের সঙ্গে মিলেমিশে থাকে।

গ. বিশেষণ পদ

যে পদ বাক্যমধ্যে ব্যবহৃত বিশেষ্যের দোষ গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ প্রভৃতি বোঝায়, সেই পদকে বিশেষণ পদ বলে। যেমন-

(১) আরিফ সাহেব সুখী ব্যক্তি - ব্যক্তির গুণ।

(২) পাকা আম খেতে মিষ্টি - আমের অবস্থা।

(৩) আলম বিশাল সম্পত্তির অধিকারী - সম্পত্তির পরিমাণ।

বিশেষণ পদের প্রকারভেদ, যেমন-

১। বিধেয় বিশেষণ

বিধেয় বিশেষণ বিশেষ্যের পরে বসে থাকে। যেমন- লোকটি সুস্থ, তার মন খারাপ। আকবর ভারতের ভাগ্যবিধাতা ছিলেন। অনেক সময় বিধেয় পদ বিশেষ্যও হতে পারে। যেমন- সন্তোষ সুখের মূল। আলস্য দোষের নিদান। বাংলায় এগুলোকে বিধেয় পদ বলা হয়।

২। বিশেষণের বিশেষণ

বিশেষণের বিশেষণ বিশেষণের গুণ বা অবস্থা প্রকাশ করে। যেমন- সে অতি শান্ত, মেয়েটি বেশ ভালো, লোকটির মেজাজ খুব নরম, লায়লাকে অত্যন্ত শোকার্ত বলে মনে হয়।

৩। ক্রিয়া বিশেষণ

যে পদ ক্রিয়ার গুণ বা অবস্থা প্রকাশ করে তার নাম ক্রিয়া বিশেষণ। যেমন - আস্তে চল, ধীরে ধীরে অগ্রসর হব।

অনেক সময়ে বিশেষণের 'এ' বিভক্তি যোগ করে ক্রিয়া বিশেষণ গঠিত হয়। যেমন- জোরে বায়ু বইছে।

ঘ. অব্যয় পদ

যে পদের ক্ষয় নেই, কোনো পরিবর্তন নেই তাকে অব্যয় পদ বলে।

অব্যয়ের অনেক প্রকারভেদ আছে। যেমন-

১। সংযোজক অব্যয় : যে অব্যয় এক পদের বা বাক্যের সঙ্গে অন্য পদের বা বাক্যের সংযোজন করে, তাকে সংযোজক অব্যয় বলে। যেমন- কামাল ঘরে এলো এবং তার মা ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

২। বিয়োজক অব্যয় : সে সকল অব্যয় বিভিন্ন পদ বা বাক্যকে বিচ্ছিন্ন করে, তাদের নাম বিয়োজক অব্যয়। যেমন-মীনা অথবা রিনা এখানে আসবে, আমি সেখানে যাব, নয় তো তুমি একবার এসো।

৩। সঙ্কোচক অব্যয় : কতগুলো অব্যয় বাক্যার্থের সঙ্কোচ বিধান করে তাদের বলা হয় সঙ্কোচক অব্যয়। যেমন- বরং অনাহারী থাকবে তথাপি ভিক্ষা করবে না, জবা ফুল দেখতে সুন্দর কিন্তু গন্ধহীন।

৪। অনুকার অব্যয় : যে সব অব্যয় অব্যক্ত শব্দের অনুকরণ করে তাকে বলা হয় অনুকার অব্যয়। এদের আরেক নাম ধ্বন্যাত্মক অব্যয়। যেমন- শো শো বায়ু বইছে, বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এল বান। ঝম ঝমাঝম বাজিয়ে যাব মল।

৫। প্রশ্নসূচক অব্যয় : যেসব অব্যয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে ব্যবহৃত হয় তাদের বলা হয় প্রশ্নসূচক অব্যয়। যেমন- তাই নাকি? একথা সত্যি কি হে?

৬। সম্বোধনসূচক অব্যয় : যে সকল অব্যয় কাউকে আহবান করতে ব্যবহৃত হয় তাকে সম্বোধনসূচক অব্যয় বলে। যেমন- ওহে, মিলন ভালো তো? হে, মাঝি কোথায় যাও? অয়ি সুলতান, কে তোমাকে ডাকে।

৭। আবেগসূচক অব্যয় : যে সকল অব্যয় বিস্ময়, হর্ষ, দুঃখ, ঘৃণা প্রভৃতি প্রকাশ করে, তাদের আবেগসূচক অব্যয় বলা হয়। যেমন- হায়, কি অদৃষ্ট তোমার! আহা, কি সুন্দর চাঁদ আজ আকাশে! ছিঃ ছিঃ এমন কাজ কখনো করো না।

এছাড়াও অব্যয়ের আরো প্রকারভেদ রয়েছে।

ঙ. ক্রিয়া পদ

যে পদের দ্বারা খাওয়া, হওয়া, করা প্রভৃতি কাজকে বোঝায় তাকে ক্রিয়া পদ বলে।

মনে রাখতে হবে- ধাতুর সঙ্গে ক্রিয়া বিভক্তির যোগে বাংলা ক্রিয়া গঠিত হয়ে থাকে। যেমন- করি (✓কর্+ই) যাইব (✓যা+ইব)।

ক্রিয়া দুই প্রকার। সমাপিকা ক্রিয়া ও অসমাপিকা ক্রিয়া।

১। সমাপিকা ক্রিয়া : যে ক্রিয়ার দ্বারা বাক্য সম্পূর্ণ হয়, তার নাম সমাপিকা ক্রিয়া। যেমন- "আকলিমা বাড়ি গেল"- এই বাক্যে 'গেল' সমাপিকা ক্রিয়া।

২। অসমাপিকা ক্রিয়া

যে ক্রিয়ার দ্বারা বাক্য শেষ হয় না, বক্তার আরো বলবার আকাঙ্ক্ষা থাকে তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন- অভিক নাস্তা খেয়ে স্কুলে রওনা হল। এই বাক্যে 'খেয়ে' অসমাপিকা ক্রিয়া। এছাড়া কর্মভেদে ক্রিয়া দুই প্রকার-

সকর্মক ক্রিয়া ও অকর্মক ক্রিয়া।

সকর্মক ক্রিয়া : বাক্য মধ্যে যে ক্রিয়া কর্ম সম্পাদন করে তাকে সকর্মক ক্রিয়া বলে। যেমন- আলাল টাকা নিয়েছে। এই বাক্যে 'নিয়েছে' ক্রিয়াটি সকর্মক এবং এর কর্ম 'টাকা।

অকর্মক ক্রিয়া - বাক্য মধ্যে যে ক্রিয়া কর্ম সম্পাদন করে না তাকে অকর্মক ক্রিয়া বলে। যেমন- আবুল শুইল - এই বাক্যে 'শুইল' ক্রিয়ার কর্ম নেই সুতরাং এটি অকর্মক ক্রিয়া।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ২

ক. নৈর্বিত্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। কোন কিছুর নামকে বলা হয়-
ক. বস্তুবাচক বিশেষ্য খ. জাতিবাচক বিশেষ্য
গ. সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য ঘ. বিশেষ্য

২। বিশেষ্য পদ কত প্রকার?
ক. দুই প্রকার খ. সাত প্রকার
গ. পাঁচ প্রকার ঘ. চার প্রকার

৩। বিশেষ্য পদের পরিবর্তে যে পদ ব্যবহৃত হয় তাকে বলা হয়-
ক. বিশেষণ পদ খ. সর্বনাম পদ
গ. বিশেষণের বিশেষণ ঘ. অব্যয় পদ

৪। ধাতুর সঙ্গে ক্রিয়া বিভক্তি যোগে গঠিত হয়-
ক. ক্রিয়া বিভক্তি খ. বিশেষণ পদ
গ. ক্রিয়া পদ ঘ. বাংলা ক্রিয়া পদ

৫। যে সকল অব্যয় অব্যক্ত শব্দের অনুকরণ করে তাকে বলা হয়-
ক. অনুকারক অব্যয় খ. সংযোজক অব্যয়
গ. সঙ্কোচক অব্যয় ঘ. প্রশ্নসূচক অব্যয়

৬। যে ক্রিয়া কর্ম সম্পাদনের যোগ্যতা রাখে না, তার নাম-
ক. অসমাপিকা ক্রিয়া খ. অকর্মক ক্রিয়া
গ. দ্বিকর্মক ক্রিয়া ঘ. সকর্মক ক্রিয়া

খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন

১। পদ পাঁচ প্রকার। যথা, বিশেষ্য, বিশেষণ ---------- অব্যয় ও --------।

২। যে সকল অব্যয় বিভিন্ন পদ বা বাক্যকে বিচ্ছিন্ন করে, তাদের নাম .....।

৩। যে ক্রিয়ার দ্বারা বাক্য সম্পূর্ণ হয় তার নাম ..... ।

৪। যত, তত, কত, এত এইগুলো ..... সর্বনাম।

গ. সংজ্ঞা লিখুন

সম্বন্ধবাচক সর্বনাম, অব্যয় পদ, বিশেষ্য পদ।

উত্তর লিখুন

১। গ, ২। গ, ৩। খ, ৪। গ ৫। ক ৬। খ

শূন্যস্থান :

১। সর্বনাম, ক্রিয়া ২। বিয়োজক অব্যয় ৩। সমাপিকা ক্রিয়া ৪। পরিমাণ বাচক

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

* ক্রিয়ার কাল কাকে বলে জানতে পারবেন।
* ক্রিয়ার পুরুষ কাকে বলে তার সংজ্ঞা লিখতে পারবেন।
* বিভিন্ন কালের সংজ্ঞা জানতে পারবেন।
* কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ দেখিয়ে বাক্য রচনা করতে পারবেন।

কাল : কাল বলতে ক্রিয়ার সময়কে বোঝায়। ক্রিয়া অর্থ 'কাজ'। অর্থাৎ যে সময়ে কোনো ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, সেই সময়কে ক্রিয়ার কাল বলে। এই 'কাল' শব্দের দ্বারা কোনো বিশেষ তারিখ বা নির্দিষ্ট সময় বোঝায় না। বক্তা যে মুহূর্তে বাক্য উচ্চারণ করে, সে মুহূর্তের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে ক্রিয়ার কাল স্থির করা হয়।

যে সময়ে কোন কাজ সম্পাদিত হয় - সেই সময়কে ক্রিয়ার কাল বলে।

বাংলা ব্যাকরণ অনুযায়ী কাল তিন প্রকার। যেমন -

ক. বর্তমান (Present)

খ. অতীত (Past)

গ. ভবিষ্যৎ (Future)

ছকের মাধ্যমে উদাহরণসহ বিভিন্ন কালের প্রকারভেদ দেখানো হলো

কাল	প্রকারভেদ	উদাহরণ
ক. বর্তমান	১। নিত্যবৃত্ত বর্তমান	করে
	২। ঘটমান বর্তমান	করছে
	৩। পুরাঘটিত বর্তমান	করেছে
	৪। বর্তমান অনুজ্ঞা	কর
খ. অতীত	১। সাধারণ অতীত	করলো
	২। নিত্যবৃত্ত অতীত	করতো
	৩। ঘটমান অতীত	করছিল
	৪। পুরাঘটিত অতীত	করেছিল
গ. ভবিষ্যৎ	১। সাধারণ ভবিষ্যৎ	করবে
	২। ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা	করো

	৩। ঘটমান ভবিষ্যৎ	করতে
	৪। পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ	করে

ক্রিয়ার কালের ব্যবহার বা প্রয়োগ

বাংলা ভাষায় ক্রিয়ার কালের ব্যবহার যেমন সাধারণভাবে হয়ে থাকে তেমনি বিশিষ্টভাবেও এর প্রয়োগ হয়ে থাকে। ক্রিয়ার কালের এই বিশিষ্ট ব্যবহার ভাষার বাগধারা সম্মত বলে কিছুটা জটিল। এক্ষেত্রে কালের বিশিষ্ট ব্যবহার উদাহরণসহ আলোচিত হলো।

ক. বর্তমান কাল

১। নিত্য বৃত্ত বর্তমান : যে ক্রিয়া সকল সময় স্বাভাবিকভাবে সম্পন্ন হয়ে থাকে, তাই নিত্য বৃত্ত বর্তমান কাল। যেমন- আমি ভাত খাই। তিনি সন্ধ্যায় বেড়ান। নিত্য বৃত্ত বর্তমানের বিশিষ্ট ব্যবহার :

(অ) অতীত ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনায় অনেকক্ষেত্রে নিত্যবৃত্ত বর্তমানকালের ব্যবহার বাংলা বাগধারা সম্মত। একে ঐতিহাসিক বর্তমানও বলা যায়। যেমন- সম্রাট শাহজাহান ১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দে তাজমহল নির্মাণ করেন।

(আ) যদি, যখন, যেন, যতক্ষণ প্রভৃতি শব্দ দিয়ে রচিত বাক্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'অতীত' ও 'ভবিষ্যৎ' কাল বোঝাতে নিত্যবৃত্ত বর্তমান কাল ব্যবহৃত হয়। কিন্তু উল্লেখিত শব্দগুলো দ্বারা রচিত বাক্যে তা অতীত বা ভবিষ্যৎকাল হয়। যেমন- তিনি যদি আসেন, তবে কি হবে? যখন শিক্ষক আসেন, তখন ছাত্রদের সকলেই পালিয়ে গিয়েছিল। যতক্ষণ কাজ শেষ না হয়, ততক্ষণ থাকব। দোয়া করবেন, যেন পরীক্ষায় পাস করি।

(ই) প্রস্তাব বা অনুমতি প্রার্থনা বোঝাতে অব্যবহিত ভবিষ্যৎকালের পরিবর্তে নিত্যবৃত্ত বর্তমানকাল হয়। যেমন- আজ ঈদ, আসুন কোলাকুলি করি। অনেক সময় কাট্‌ল, এখন তবে আসি।

২। ঘটমান বর্তমান : যে কাজ শেষ হয়নি, এখনো চলছে, সেইকাজ বোঝাতে ঘটমান বর্তমানকাল ব্যবহৃত হয়। যেমন- অভিক অংক কষছে, তুষি গান গাচ্ছে, তিনি ভ্রমণ করছেন।

ঘটমান বর্তমান কালের বিশিষ্ট ব্যবহার :

(অ) বর্ণনার বিষয়বস্তুকে শ্রোতার কাছে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ করে প্রকাশের জন্য অনেক সময় অতীতকালের ক্রিয়ার পর ঘটমান বর্তমান কাল ব্যবহৃত হয়; যেমন- বিরোধী দলীয় নেতা বক্তৃতা মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলল, - "সন্ত্রাসীদের অত্যাচার বেড়ে যাচ্ছে, ধন-সম্পদ লুণ্ঠিত হচ্ছে, দেশজুড়ে আগুন জ্বলছে, আর সহ্য করা যাচ্ছে না : আন্দোলন, আন্দোলন, আন্দোলন, - 'একমাত্র আন্দোলনই হচ্ছে এর প্রতিকার'।

(আ) দুটি অতীতকালের ক্রিয়ার মধ্যে যখন একটি কাজ সম্পাদিত না হতেই অন্যটি সম্পাদিত হচ্ছিল বলে বোঝায়, তখন যে কাজ পূর্বে সম্পাদিত হচ্ছিল, তাতে ঘটমান বর্তমানকালের রূপ বসে; যেমন- আমি দেখলাম আমগাছ থেকে আম পড়ছে। ইংরেজরা যে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে তখন তা কে জানতো?

(ই) কোনো ক্রিয়া যদি বর্তমানকালের কিছু সময় আগেই ঘটবে বলে স্থির থাকে, তবে সে ক্রিয়ায় ঘটমান বর্তমানকাল ব্যবহৃত হয়; যেমন- আমি আগামীকাল খুলনা যাচ্ছি (= যাব অর্থে) এই বিকেলেই তারা চট্টগ্রাম যাচ্ছেন (যাবেন অর্থে)।

(ঈ) বর্তমান এবং ভবিষ্যৎকালের অনুজ্ঞার পরেও ঘটমান বর্তমান কাল ব্যবহৃত হতে দেখা যায়; যেমন- মনে রেখো, সে ভাল কাজই করছে। ভেবো না, শোন, আমি তোমায় টাকা দিচ্ছি।

৩। পুরাঘটিত বর্তমান কাল :

সামান্য আগে অথবা বহু আগেই কাজ শেষ হয়ে গেছে, অথচ সে কাজের ফল এখনও বর্তমান, এমন ক্ষেত্রে পুরাঘটিত বর্তমান কাল ব্যবহৃত হয়, যেমন- গেল বারে আমি এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি। আমি কালই ঢাকা আসছি।

পুরাঘটিত বর্তমান কালের বিশিষ্ট ব্যবহার :

নৈরাশ্যব্যঞ্জক ভবিষ্যৎ কালের জন্য পুরাঘটিত বর্তমান কালের ব্যবহার বাগ্‌ধারা-সম্মত, যেমন- তুমি বল কি? তিন বছর কেটে গেল। সেও টাকা দিয়েছে (= দিবে অর্থে) আর আমিও পেয়েছি (পাব অর্থে)।

৪। বর্তমান অনুজ্ঞা : যে ক্রিয়ার দ্বারা আদেশ, প্রার্থনা, অনুরোধ, উপদেশ কিংবা আশীর্বাদ বোঝাতে বর্তমান অনুজ্ঞা ব্যবহৃত হয়। যেমন-

১. আদেশাত্মক অনুজ্ঞা –	যাও, কাজে ঝাঁপিয়ে পড়।
২. প্রার্থনাজ্ঞাপক অনুজ্ঞা –	প্রার্থনা করি, তোমার মঙ্গল হোক।
৩. অনুরোধাত্মক অনুজ্ঞা –	অনুরোধ করি, আপনি একবার আসুন এ গরিবালয়ে।
৪. উপদেশাত্মক অনুজ্ঞা –	ছাত্রগণ, লেখাপড়া শিখে মানুষের মতো মানুষ হও।
৫. আশীর্বাদ জ্ঞাপক অনুজ্ঞা –	দোয়া করি, তোমার জীবন সুন্দর হোক, শোভন হোক, তুমি সৎ ও উদার হও।

খ. অতীতকাল

১। সাধারণ অতীতকাল – বর্তমানকালের আগেই যে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে যায়, সেই সময়কে সাধারণ অতীতকাল বোঝায়। যেমন– সে সেদিন একাকী কাঁদলো।

বিশিষ্ট ব্যবহার :

(অ) একটু আগেই কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে– এমন ক্রিয়ার সময় জ্ঞাপনেও সাধারণ অতীতকালের ব্যবহার হয়। যেমন- সে এইমাত্র চলে গেল। শুনলাম, পরীক্ষা পিছিয়ে যাবে।

(আ) অর্ধেক প্রকাশের উপায়রূপে বর্তমানকালে সাধারণ অতীতের রূপ ব্যবহৃত হয়ে থাকে; যেমন- তুমি বসে থাক, আমি চললাম। সে আসলে আসুক, আমি কিন্তু খেতে বসলাম।

২। নিত্যবৃত্ত অতীত : অতীতকালে কোনো ক্রিয়া সর্বদা সম্পন্ন হতো, এমন ভাব বোঝাতে নিত্যবৃত্ত অতীতকাল ব্যবহৃত হয়, যেমন- সে প্রতিদিন বাগানে বেড়াতো।

বিশিষ্ট ব্যবহার :

উগ্র বাসনা জ্ঞাপনেও নিত্যবৃত্ত অতীতকাল বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়; যেমন- লিলি এখন আসলে, বেশ হতো। যদি মনোরমা ফিরে আসতো, তবে সুমনের জীবনটা মধুর হতো।

৩. ঘটমান অতীত : অতীতকালে কোনো কাজ চলছিল এবং তখনও কাজটি শেষ হয়ে যায়নি- এরকম ভাব বোঝাতে ক্রিয়ার ঘটমান অতীত কালের রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন- কৃষক মাঠে লাঙ্গল দিচ্ছিল, এমন সময় হঠাৎ বাজ পড়লো। তখনও মেয়েরা স্কুলে যাচ্ছিল, অভিভাবকেরা বাড়িতে বকাবকি করছিলেন।

৪. পুরাঘটিত অতীত : অতীতকালে কোনো কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে এবং তার ফল বর্তমান নেই, এমন ক্ষেত্রে পুরাঘটিত অতীতকাল ব্যবহৃত হয়। যেমন- দুই বছর আগে একবার তাকে সভায় দেখেছিলাম। বহুদিন আগে তার অসুখ করেছিলো।

বিশিষ্ট ব্যবহার : অতীকালের কোনো ক্রিয়ার আগে আরও একটি ক্রিয়া ঘটে গিয়েছিল - এমনভাব বোঝাতে পূর্ববর্তী ক্রিয়ার পুরাঘটিত অতীতকাল ব্যবহৃত হয়। যেমন- সভায় আমি পৌঁছবার আগেই, তিনি এসেছিলেন। এখানে আসবার আগেই সে চিঠি দিয়েছিল।

গ. ভবিষ্যৎ কাল

১। সাধারণ ভবিষ্যৎ : যে ক্রিয়া ভাবীকালে সম্পন্ন হবে, তাতে সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল ব্যবহৃত হয়। যেমন- অনার্স পরীক্ষার্থীরা জুন মাসে পরীক্ষা দেবে। কে কখন মরবে কেউ বলতে পারবে না।

বিশিষ্ট ব্যবহার :

কখনো কখনো অতীতকালের ক্রিয়ায় সাধারণ ভবিষ্যৎকালের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন- ভাগ্য মন্দ না হলে, আমার সর্বস্ব লুট হবে (হলো) কেন? হঠাৎ ইরাকে যুদ্ধ বাধবে (বেধেছিল), কেউ তা জানতো না।

২। ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা : ভবিষ্যৎকালে যে ক্রিয়া সম্পন্ন করা জন্য আদেশ, উপদেশ, নির্দেশ ইত্যাদি বুঝাতে ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা ব্যবহৃত হয়। যেমন -

(অ) মৃদু আদেশে : সর্বদা সৎকাজ করো। তুমি কাল এসো।

(আ) পরোক্ষ আদেশে : সে আগামীকাল বাড়ি যাবে।

(ই) বিধান মানায় : অসুখ হলে ডাক্তারের কাছে যাবে।

(ঈ) অনুরোধে : আপনি মে মাসে আসবেন।

৩। ঘটমান ভবিষ্যৎ : যে কাজ ভবিষ্যৎ কালে শুরু হয়ে ভবিষ্যতে চলতে থাকবে এরূপ বুঝালে, ঘটমান ভবিষ্যৎকাল ব্যবহৃত হয়। যেমন - আগামীকাল আমি তিন ঘন্টা যাবৎ কাজ করব, ততক্ষন যে যেতে থাকবে।

৪। পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কাল : যে কাজ ভবিষ্যতে সম্পন্ন হয়ে থাকবে এরুপ বুঝালে, পুরাঘটিত ভবিষ্যৎকাল ব্যবহৃত হয়। যেমন- এতক্ষনে সে পৌঁছে যাবে, এতদিনে সে এম. এ. পাস করবে ইত্যাদি।

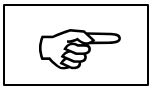

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. নৈর্বিত্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। যে সময়ে কোনো কাজ সম্পাদিত হয়, সেই সময়কে বলে

ক. ক্রিয়ার কাল　　খ. ক্রিয়ার বিভক্তি

গ. বর্তমানকাল　　ঘ. ভবিষ্যৎকাল

২। কাল কত প্রকার?

ক. দুই প্রকার　　খ. তিন প্রকার

গ. চার প্রকার　　ঘ. পাঁচ প্রকার

৩। যে ক্রিয়া সব সময় স্বাভাবিকভাবে সম্পন্ন হয় তাই-

ক. ঘটমান বর্তমান　　খ. নিত্য বৃত্ত বর্তমানকাল

গ. পুরাঘটিত বর্তমান　　ঘ. বর্তমান অনুজ্ঞা

৪। সম্রাট শাহজাহান ১৬৪৮ খ্রিঃ তাজমহল নির্মাণ করেন– এটি কোন্ কাল?

ক. অতীত ঐতিহাসিক　　খ. পুরাঘটিত অতীত

গ. ঐতিহাসিক বর্তমান　　ঘ. পুরাঘটিত বর্তমান

৫। বর্তমানকালের আগেই যে ক্রিয়া সম্পন্ন হয় সেই সময়কে বলে–

ক. অতীত কাল　　খ. সাধারণ অতীত

গ. পুরাঘটিত অতীত　　ঘ. নিত্যবৃত্ত অতীত

৬। যে ক্রিয়া ভাবীকালে সম্পন্ন হবে – তাকে বলে–

ক. ভবিষ্যৎ কাল　　খ. সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল

গ. ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা　　ঘ. নিত্য বৃত্ত বর্তমান

৭। সর্বদা সৎকাজ করো – বাক্যটিতে প্রকাশ পেয়েছে –

ক. মৃদু আদেশ　　খ. ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা

গ. সাধারণ ভবিষ্যৎ　　ঘ. পরোক্ষ আদেশ

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

উত্তর

১। ক　২। খ　৩। খ　৪। গ　৫। ক　৬। ক　৭। ক

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১। 'কাল' কি বুঝিয়ে লিখুন। ক্রিয়ার কালের সংজ্ঞা দিন।

২। বাংলা ব্যাকরণ অনুযায়ী কাল কত প্রকার এবং কি কি? উদাহরণসহ লিখুন।

৩। তিন প্রকার কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ দেখিয়ে তিনটি বাক্য রচনা করুন।

৪। বর্তমান অনুজ্ঞার বিভিন্ন ব্যবহার দেখিয়ে পাঁচটি বাক্য রচনা করুন।

৫। অতীতকালের বিশিষ্ট প্রয়োগ দেখিয়ে বাক্য রচনা করুন।

প্রশ্নগুলোর উত্তর নিজেরাই লিখুন

পাঠ ৪

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

* সমাপিকা ক্রিয়া কাকে বলে তা লিখতে পারবেন।
* অসমাপিকা ক্রিয়ার সংজ্ঞা ও ব্যবহার লিখতে পারবেন।
* যৌগিক ক্রিয়া সম্পর্কে সম্যক জানতে পারবেন।

যে ক্রিয়ার দ্বারা বাক্য সম্পূর্ণ হয়, তার নাম সমাপিকা ক্রিয়া। যেমন-

আসলাম বাড়ি গেল। এই বাক্যে 'গেল' সমাপিকা ক্রিয়া।

গাছ থেকে আম পড়ল। এই বাক্যে 'পড়ল' সমাপিকা ক্রিয়া।

যে ক্রিয়ার দ্বারা বাক্য শেষ হয় না, বক্তার আরো বলবার আকাঙ্ক্ষা তাকে- থাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন- অভিক নাস্তা খেয়ে স্কুলে রওয়ানা হল। এই বাক্যে 'খেয়ে' অসমাপিকা ক্রিয়া।

অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার

অসমাপিকা ক্রিয়ার বিভক্তি হলো- ইয়া, ইলে, ইতে, ইবার। এই সকল প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়ার সাহায্যে এক একটি বাক্যাংশের সমাপ্তি হয়। যেমন- আমি খাওয়া দাওয়া সারিয়া শহরে যাইব।

চলিত ভাষায় ইয়া স্থলে 'এ' ব্যবহৃত হয়। যেমন ক'রে, খে'য়ে, শু'য়ে, দে'খে, শু'নে ইত্যাদি।

ক) 'ইয়া' প্রত্যয় ক্রিয়ার পূর্বকাল বোঝায়। যেমন- ভাত খাইয়া সে স্কুলে গেল– এই বাক্যে খাওয়া কাজটি পূর্বে হয়েছে।

চলিত ভাষায় – ভাত খেয়ে সে স্কুলে গেল।

ইয়া, প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়া পদ এবং সমাপিকা ক্রিয়া পদের একটি কর্তা অর্থাৎ ক্রিয়া দুইটি এক কর্তা।

রুমী গান গেয়ে ঘরে ঢুকলো। এই বাক্যে 'গেয়ে' এবং 'ঢুকলো' ক্রিয়ার কর্তা রুমী।

'ইয়া প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়া কখনো কখনো সমকাল সূচিত করে। যেমন– সে হেসে কথা বলে (বলা ও হাসা যুগপৎ)। সুমন গান গাইতে গাইতে পথ চলে। (চলা ও গান গাওয়া একসঙ্গে চলছে)।

খ) 'ইলে' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়া (করিলে, চলিলে, বসিলে, চলিত ভাষায় করলে, চললে, বসলে ইত্যাদি) পূর্বকাল সূচিত করে। যেমন-

তুমি বসিলে আমি বসিব (সাধুরূপ)।

তুমি বসলে আমি বসব (চলিতরূপ)।

এই দুই ক্রিয়ার কর্তা এক নয়–

১. যদি, যখন, তখন এই সাপেক্ষ অব্যয়ের ভাব এই ক্রিয়ার দ্বারা সূচিত হয়। যেমন- বেল পাকলে কাকের কি? (যদি বেল পাকে তবে)? সূর্য উঠলে ইলা পড়তে বসে (যখন সূর্য উঠে তখন) এই বাক্যটিতে পড়তে বসারকাল 'উঠলে' ক্রিয়ার দ্বারা সূচিত হয়েছে। সংস্কৃতে একে ভাবী সপ্তমী বলে। বাংলায় এ জাতীয় ক্রিয়াকে ভাবাত্মক ক্রিয়া বলা যেতে পারে।

গ) 'ইতে' প্রত্যয়ান্ত অমাপিকা ক্রিয়ার দ্বারাও 'ইলে' এবং 'ইয়া' প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়ার মতো পূর্ববর্তী কার্য সূচিত হয়; যেমন- সে শিস্ দিতেই কুকুরটি এলো।

(অ) ইতে - প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়ার কর্তা ও সমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা একও থাকতে পারে আবার পৃথকও হতে পারে। যেমন- আমি গান শুনিতে আসিয়াছি (এক-কর্তৃক) (সাধুরূপ)

আমি গান শুনতে এসেছি (ঐ) চলিত রূপ।

যুদ্ধ করিতে অস্ত্র দাও (ভিন্ন কর্তৃক) সাধুরূপ।

যুদ্ধ করতে অস্ত্র দাও (ঐ) চলিত রূপ।

(আ) 'ইতে' প্রত্যয় বিশেষণ স্থানীয় বাক্যাংশ গঠন করে। যেমন-

কাহাকেও পথে আসিতে দেখিয়াছ কি? (সাধুজন)

কাউকে পথে আসতে দেখেছো কি? (চলিত রূপ)

(ই) 'ইতে' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার–

(১) নিমিত্তার্থে প্রয়োগ – আমি ভাত খাইতে (খাওয়ার জন্য) আসিয়াছি। (সাধু রূপ)

আমি ভাত খেতে এসেছি (চলিত রূপ)

তাড়াতাড়ি খাইতে বস (সাধুরূপ) তাড়াতাড়ি খেতে বস (চলিত রূপ)

(২) ইংরেজি Idfinitive mood-এর মতো মূল ক্রিয়ার কর্মরূপে প্রয়োগ হয়ে থাকে। যেমন-

ছেলেটি হাসিতে লাগিল। সে আমাকে কাজ করিতে বলিল (সাধু)।

ছেলেটি হাসতে লাগল। সে আমাকে কাজ করতে বলল (চলিত)।

(৩) দুই ক্রিয়ার সমকাল বর্তিতার অর্থে 'ইতে' প্রত্যয়ের দ্বিরুক্তি ব্যবহার লক্ষণীয়। যেমন- সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল। (সাধু)।

সে কাঁদতে কাঁদতে বলল (চলিত রূপ)

যাইতে যাইতে পথে এ দৃশ্য দেখিলাম (সাধুরূপ)

যেতে যেতে পথে এ দৃশ্য দেখলাম (চলিত রূপ)

এখানে কাঁদা ও দেখা ক্রিয়ার কাল 'বলা' ও 'খাওয়া' ক্রিয়ার একই সঙ্গে চলেছে।

(ঈ) ইকার প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়াগুলো বাংলায় ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য পদ; অর্থাৎ ক্রিয়া পদ ও বিশেষ্য পদের ভাব একসঙ্গে বর্তমান থাকে। এইগুলো অনেকটা ইংরেজি (Geround) পর্যায়ভুক্ত। কাজেই, এগুলো কর্তৃকারক। বিশেষণ পদ, ও সমন্ধপদ রূপে এবং অনুসর্গসহ বাক্যে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন- অনেক কিছু বলিবার আছে। এই বাক্যে আছে ক্রিয়ার কর্তা, বলিবার পদ, আবার বলিবার ক্রিয়ার কর্ম হল কিছু পদ।

১. পড়িবার জন্য বই চাই (অনুসর্গ জন্য যোগে)।

২. কাল তাহার আসিবার কথা (সম্বন্ধপদ)।

৩. কাহাকেও ঠকাইবার কথা বলিও না (কথার বিশেষণ রূপে)।

যৌগিক ক্রিয়া

দুটি ক্রিয়া পদ একসঙ্গে মিলে বা যুক্ত হয়ে যদি সম্মিলিতভাবে একটা ভাব প্রকাশ করে তবে তাকে যৌগিক ক্রিয়া বলে।

যে দুটি ক্রিয়া যুক্ত হয়ে যৌগিক ক্রিয়া সম্পাদন করে তার একটিকে সহায়ক ক্রিয়া (Auxiliary) এবং অপরটিকে মুখ্যক্রিয়া (Principal verb) বলা যায়।

সাধারণত সহায়ক ক্রিয়া মুখ্য ক্রিয়ার অর্থকে নানাভাবে বিস্তৃত করে এর অর্থ সম্প্রসারণে সাহায্য করে। যেমন-

এমনটি আর কোথাও দেখা যায় না।

আমাকে দেখিয়া সে হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল।

তিনি চমৎকার বলিতে পারবেন।

উদ্ধৃত বাক্য তিনটিতে দেখা যায়, কাঁদিয়া ফেলা এবং বলিতে পারা যৌগিক ক্রিয়া এবং যাওয়া, ফেলা ও পারা সহায়ক ক্রিয়া আর দেখা, কাঁদিয়া 'বলিতে' মুখ্য ক্রিয়া। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, যৌগিক ক্রিয়ার প্রথমটি মুখ্যক্রিয়া এবং দ্বিতীয়টি সহায়ক ক্রিয়া।

কয়েকটি বিশেষ ক্রিয়া বা ধাতু সহায়ক ক্রিয়া হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সব ধাতুর ক্ষেত্রে এই নিয়ম সিদ্ধ নয়। এই শ্রেণীর কয়েকটি প্রধান সহায়ক ক্রিয়া নিম্নরূপ–

আসা, উঠা, যাওয়া, ফেলা, পারা, দেওয়া, তুলা, পড়া, থাকা, লাগা, লওয়া, সহা ইত্যাদি। এই সহায়ক ক্রিয়াগুলো ইয়া, ইতে প্রত্যয়ান্ত মুখ্য ক্রিয়ার পরে বসে। যেমন-

আসা

১. আসন্ন সম্ভাবনায় – ফুলগুলি ফুটিয়া আসিয়াছে।

২. ক্রিয়ার পরিসমাপ্তিতে – তাঁহারা বলিয়া আসিয়াছেন।

৩. অনুজ্ঞায় – তুমি চলিয়া আস।

৪. ভবিষ্যতে – বৃদ্ধ বয়সে শক্তি কমিয়া আসিবে।

যাওয়া

১. 'আ' প্রত্যয়ান্ত মুখ্য ক্রিয়ার সঙ্গে 'যাওয়া' ছাড়া অন্য কোন সহায়ক ক্রিয়া ব্যবহৃত হয় না। যেমন-
এই রূপ অনেক কথাই শুনা যায়। সমস্ত কথা খুলিয়া বলা যাইতেছে না।

২. ক্রিয়ার পরিসমাপ্তিতে – ধান পাকিলে গাছ মরে যায়।
সে বহুদিন আগে চলে গেছে।

৩. ক্রিয়ার অবিরামতা বোঝাতে – শুনছি, তুমি বলে যাও।
ছেলেটি অনর্গল পড়ে যাচ্ছে।

সহায়ক ক্রিয়ার উদাহরণ

১. সমস্ত কথা বলে কেন। পুলিশ আসামিকে ছেড়ে দিল।
সে আমাকে পাগল করে তুলেছে। সে কথা শুনে চুপ করে রইল। তিনি তো মরেই আছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. নৈর্বিত্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। যে ক্রিয়ার দ্বারা বাক্য সম্পূর্ণ হয় তার নাম–

ক. অসমাপিকা ক্রিয়া　　খ. সমাপিকা ক্রিয়া

গ. যৌগিক ক্রিয়া　　ঘ. সকর্মক ক্রিয়া

২। যে ক্রিয়ার দ্বারা বাক্য শেষ হয় না তার নাম

ক. সমাপিকা ক্রিয়া　　খ. অসমাপিকা ক্রিয়া

গ. সকর্মক ক্রিয়া　　ঘ. অকর্মক ক্রিয়া

৩। বেল পাকলে কাকের কি?

ক. অসমাপিকা ক্রিয়া　　খ. অকর্মক ক্রিয়া

গ. সমাপিকা ক্রিয়া　　ঘ. সকর্মক ক্রিয়া

৪। দুটি ক্রিয়া যুক্ত হয়ে একটি ভাব প্রকাশ করলে তাকে বলে–

ক. সকর্মক ক্রিয়া　　খ. যৌগিক ক্রিয়া

গ. সমাপিকা ক্রিয়া　　ঘ. অসমাপিকা ক্রিয়া

৫। যে দুটি ক্রিয়া যুক্ত হয়ে যৌগিক ক্রিয়া সম্পাদন করে তার একটির নাম–

ক. সহায়ক ক্রিয়া　　খ. সমাপিকা ক্রিয়া

গ. গৌণ ক্রিয়া　　ঘ. সকর্মক ক্রিয়া

৬। মুখ্য ক্রিয়ার অর্থকে সম্প্রসারণ করে–

ক. সকর্মক ক্রিয়া　　খ. যৌগিক ক্রিয়া

গ. সহায়ক ক্রিয়া　　ঘ. গৌণ ক্রিয়া

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. সমাপিকা ক্রিয়ার সংজ্ঞা দিন।

২. অসমাপিকা ক্রিয়ার সঙ্গে সমাপিকা ক্রিয়ার পার্থক্য নির্দেশ করে দুটি বাক্য রচনা করুন।

৩. যৌগিক ক্রিয়া কাকে বলে উদ্ধৃতিসহ ব্যাখ্যা করুন।

৪. সহায়ক ক্রিয়া 'যাওয়া' ও 'আসা' দিয়ে ৫টি বাক্য রচনা করুন।

৫. অসমাপিকা ক্রিয়ার তিনটি বিভক্তি নির্দেশ করে বাক্য রচনা কর।

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

উত্তর

১। খ　২। খ　৩। ক　৪। খ　৫। ক　৬। গ

পাঠ ৫

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

১. বিভক্তি ও ক্রিয়া বিভক্তি কাকে বলে তা জানতে পারবেন।

২. সাধু ভাষায় ক্রিয়া বিভক্তির ব্যবহার জানতে পারবেন।

৩. চলিত ভাষায় ক্রিয়া বিভক্তির ব্যবহার সম্পর্কে জানতে পারবেন।

বিভক্তি

বিভক্তি শব্দের অর্থ 'ভাগ' বা অংশ। বাংলা ভাষায় যে সমস্ত বাক্যে ক্রিয়া আছে, সেগুলোতে কারক ও বিভক্তি দুই-ই আছে, আর যে সমস্ত বাক্যে ক্রিয়া নেই সেগুলোতে কারক নেই, কিন্তু বিভক্তি বা বিভক্তি স্থানীয় শব্দ আছে। অর্থাৎ

বাক্যে ব্যবহৃত যে সমস্ত চিহ্ন বা চিহ্ন স্থানীয় শব্দ বাক্যের বিভাগ নির্দেশ করে তাদের নাম বিভক্তি।

তবে, বিভক্তি এবং বিভক্তি স্থানীয় শব্দকে পরস্পর আলাদা করবার জন্যে এই এক জিনিসের দুটি নাম দেয়া হয়। তাই, শুধু চিহ্নগুলোকে বিভক্তি এবং তৎস্থানীয় শব্দগুলোকে কর্ম প্রবর্তনীয় বা অনুসর্গ বলে।

বাংলা ভাষায় বিভক্তির সংখ্যা বেশি নয়। মাত্র ছয়টি। (১) শূন্য বিভক্তি (২) 'এ' বিভক্তি (৩) 'তে'বিভক্তি (৪) 'কে'বিভক্তি (৫) 'র' বিভক্তি এবং (৬) কার বিভক্তি। এগুলোর মধ্যে কেবল 'র' এবং 'কার' বিভক্তি ছাড়া আর চারটি প্রায় সকল কারকেই ব্যবহৃত হয়। 'র' এবং 'কার' সম্বন্ধপদ নির্দেশক বিভক্তি।

এই বিভক্তিগুলো এক বচনের জন্যে ব্যবহৃত হয়। বহুবচনের জন্যে বাংলায় কোন বিভক্তি নেই।

ক্রিয়া বিভক্তি

বাংলা ক্রিয়া বিভক্তি ক্রিয়া পদের কাল ও পুরুষ নির্দেশ করে। লিঙ্গ ও বচনভেদে বাংলা ক্রিয়া পদের কোনো রূপভেদ হয় না।

ধাতুর পরে যে সকল বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যোগ করলে ক্রিয়া পদ রচিত হয়, সেই সকল বর্ণ বা বর্ণসমষ্টিকে ক্রিয়া বিভক্তি বলে।

বাংলা ভাষায় কারক অপেক্ষা বিভক্তি বা বিভক্তি স্থানীয় শব্দের প্রাধান্য বেশি। কেননা, বাংলা ভাষায় কারক না হলেও বাক্য রচনা সম্ভব, কিন্তু বিভক্তি বা বিভক্তি স্থানীয় শব্দের অভাবে এই ভাষায় কোনো বাক্য রচিত হতে পারে না। কাজেই, বাংলা ক্রিয়া বিভক্তির দুটি রূপই বিদ্যমান।

১. সাধু ভাষার রূপ

২. চলিত ভাষার রূপ

রাজ শেখর বসুর অনুসরণে নিম্নে তা দেখানো হলো :

ক্রিয়ার কাল						ক্রিয়া বিভক্তি = তিৎ	
			ক	খ	গ	ঘ	ঙ
প্রধান কাল	প্রধান কালের বিভাগ	কাল জ্ঞাপক সংখ্যা	নাম পুরুষ সামান্য	নাম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষ গুরু	মধ্যম পুরুষ সামান্য	মধ্যম পুরুষ তুচ্ছ	উত্তম পুরুষ

(১) বর্তমান	নিত্যবৃত্ত	১	-এ	-এন	-অ	-ইস	-ই
	ঘটমান	২	-ইতেছে	-ইতেছেন	-ইতেছ	-ইতেছিস্	-ইতেছি
	পুরাঘটিত	৩	-ইয়াছে	-ইয়াছেন	-ইয়াছ	-ইয়াছিস	-ইয়াছি
	অনুজ্ঞা	৪	-উক	-উন	-অ	×	*
(২) অতীত	সাধারণ	৫	-ই	-ইলেন	-ইলে	-ইলি	-ইলাম
	নিত্যবৃত্ত	৬	-ইত	-ইতেন	-ইতে	-ইতিস্	-ইতাম
	ঘটমান	৭	-ইতেছিল	-ইতেছিলেন	-ইতেছিলে	-ইতেছিলি	-ইতেছিলাম
	পুরাঘটিত	৮	-ইয়াছিল	-ইয়াছিলেন	-ইয়াছিলেন	-ইয়াছিলি	-ইয়াছিলাম
(৩) ভবিষ্যৎ	সাধারণ	৯	-ইবে	-ইবেন	-ইবে	-ইবি	-ইব
	অনুজ্ঞা	১০	-ইবে	-ইবেন	-ইও	-ইস	*
	কৃৎ	১১	-ইতে	-ইয়া	-ইলে	-ইবার	-আ

× কোন বিভক্তি যোগ হয় না

* কোন রূপ নেই

ক্রিয়ার কাল						ক্রিয়া বিভক্তি = তিৎ	
			ক	খ	গ	ঘ	ঙ
প্রধান কাল	প্রধান কালের বিভাগ	কাল জ্ঞাপক সংখ্যা	নাম পুরুষ সামান্য	নাম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষ গুরু	মধ্যম পুরুষ সামান্য	মধ্যম পুরুষ তুচ্ছ	উত্তম পুরুষ
(১) বর্তমান	নিত্যবৃত্ত	১	-এ	-এন	-অ	-ইস	-ই
	ঘটমান	২	-ছে	-ছেন	-ছ	-ছিস্	-ছি
	পুরাঘটিত	৩	-এছে	-এছেন	-এছ	-এছিস	-এছি
	অনুজ্ঞা	৪	-উক	-উন	-অ	×	*
(২) অতীত	সাধারণ	৫	-লে, -ল	-লেন	-লে	-লি	-লাম
	নিত্যবৃত্ত	৬	-ত	-তেন	-তে	-তিস্	-তাম
	ঘটমান	৭	-ছিল	-ছিলেন	-ছিলে	ছিলি	-ছিলাম
	পুরাঘটিত	৮	-এছিল	-এছিলেন	-এছিলেন	-এছিলি	-এছিলাম
(৩) ভবিষ্যৎ	সাধারণ	৯	-বে	-বেন	-বে	-বি	-ব (বো)
	অনুজ্ঞা	১০	-বে	-বেন	-ও	-ইস	*
	কৃৎ	১১	-তে	-এ,	-লে	-বার	-আ

× কোন বিভক্তি যোগ হয় না

* কোন রূপ নেই

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৫

ক. নৈর্বিত্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. বিভক্তি শব্দের অর্থ-

ক. বিভাগ　　খ. ভাগ

গ. ভাঙা　　ঘ. গড়া

২. বাংলা ভাষায় বিভক্তির সংখ্যা-

ক. আটটি　　খ. ছয়টি

গ. দশটি　　ঘ. চারটি

৩. বিভক্তি নির্দেশ করে-

ক. বাক্যের সংযোজন　　খ. বাক্যের অন্বয়

গ. বাক্যের বিভাগ　　ঘ. বাক্যের বিয়োজন

৪. যে সকল বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি ধাতুর পরে যুক্ত হয়ে ক্রিয়া পদ রচিত করে তাদের বলা হয়-

ক. বিভক্তি　　খ. ক্রিয়া বিভক্তি

গ. অনুসর্গ　　ঘ. কর্ম প্রবচনীয়

৫. 'র' এবং 'কার' বিভক্তি নির্দেশ করে-

ক. সম্বন্ধপদ　　খ. করণ কারক

গ. চতুর্থী বিভক্তি　　ঘ. সম্প্রদান কারক

৬. ক্রিয়া বিভক্তির কয়টি রূপ বিদ্যমান-

ক. তিনটি　　খ. দুইটি

গ. চারটি　　ঘ. একটি

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

উত্তর

১. খ　　২. খ　　৩. খ　　৪. ক　　৫. ক　　৬. খ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. ক্রিয়াবিভক্তি কাকে বলে লিখুন।

২. সাধু ভাষায় অতীতকালের ক্রিয়া বিভক্তির রূপ আলোচনা করুন।

৩. সাধু ও চলিত ভাষায় ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়া বিভক্তির রূপ লিখুন।

৪. ক্রিয়া বিভক্তি প্রয়োগে সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য নিরূপণ করুন।

৫. বাংলা ভাষায় বিভক্তির সংখ্যা কত এবং কি কি?

৬. বিভক্তি ও অনুসর্গের মধ্যে পার্থক্য কি?

প্রশ্নগুলোর উত্তর পাঠটি পড়ে নিজে নিজে লিখুন।

পাঠ ৬

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

১. অনুসর্গ কি তার সংজ্ঞা দিতে পারবেন।

২. কারক ও বিভক্তির ব্যবহার সম্পর্কে জানতে পারবেন।

অনুসর্গ বা কর্ম প্রবচনীয়

বাংলায় বিভক্তি-স্থানীয় শব্দকে অনুসর্গ বলা হয়। অনুসর্গ শব্দের পরে বসে। সংস্কৃতে এ জাতীয় শব্দকে কর্ম প্রবচনীয় বলে। অর্থাৎ সংস্কৃতে যা কর্মপ্রবচনীয় বলে পরিচিত বাংলায় তাকেই অনুসর্গ বলা হয়। এক কথায় বলা যায়-

বাংলায় বিভক্তি স্থানীয় শব্দকে অনুসর্গ বলা হয়।

বাংলায় দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক, হইতে, (যেমন- ছুরি দিয়া হাত কাটা, কাঠির দ্বারা মারা, গাছ হইতে পড়া) প্রভৃতিকে বিভক্তি বলে ধরা হলেও এগুলো বিভক্তি নয়- অনুসর্গ। কিছু অনুসর্গের উদাহরণ দেয়া হলো।

বিনা- টাকা বিনা সংসার অচল। তাকে ভিন্ন আমার চলে না।

সহ, সহিত, সঙ্গে – চোর মাল'সহ ধরা পড়েছে, তোমার 'সহিত' দেখা হইয়া ভালই হইল। আমার 'সঙ্গে এস।

ধিক্ (নিন্দা অর্থে)-ধিক্ তোমার দুঃসাহসে।

উপর – তোমার উপর আমার কোনো রাগ নেই।

অবধি – সিঙ্গাইর থেকে মানিকগঞ্জ অবধি কোন রাস্তা নেই।

হেতু – কী হেতু এতো অবিশ্বাস তোমার।

পক্ষে – বাদী পক্ষে কোন সাক্ষী খুঁজে পাওয়া যায় না।

অপেক্ষা – ফুল অপেক্ষা ফলের কদর বেশি।

মতো – এখনকার মতো আসি।

বাংলা অনুসর্গ

মাঝে – দুই বাড়ির মাঝে দেয়াল তুলে দেয়া হয়েছে।

কাছে – ভুলের জন্যে মায়ের কাছে ক্ষমা চাও।

তরে – মুহূর্তের তরে বিশ্বাস নেই তার।

চেয়ে – এর চেয়ে দিনমজুরও ভালো।

ছাড়া – তাকে ছাড়া চলে না আমার।

সাথে – কারু সাথে বিবাদ নেই আমার।

কারকে বিভক্তির ব্যবহার

সংস্কৃত বা আরবি ভাষার মতো বাংলার কোনো কারকের জন্য কোন নির্দিষ্ট বিভক্তির ব্যবহার নেই। বাংলায় সকল কারকেই প্রায় সকল বিভক্তির ব্যবহার হয়ে থাকে। কাজেই, বাংলায় কারক চিনবার কোনো সহজ উপায় নেই। বাক্যে ব্যবহৃত ক্রিয়ার সঙ্গে নাম পদগুলোর যে সম্বন্ধ, তা স্থির করতে না পারলে কারক চিনতে পারা যায় না। সুতরাং বাংলা বাক্যে কারক আবিষ্কারের জন্য ক্রিয়ার সঙ্গে অন্য পদের সম্বন্ধ স্থির করে নিতে হয়। এটাই বাংলা বাক্যে কারক চিহ্নিত করার একমাত্র উপায়। নিম্নে বিভিন্ন কারকে বিভক্তির ব্যবহার দেখানো হলো :

ক. কর্তৃকারক

সংজ্ঞা : বাক্য মধ্যে যে ক্রিয়া সম্পাদন করে তাকেই কর্তৃপদ বা কর্তা বলে। মনির হাসছে – এই বাক্যে মনির কর্তা। কর্তৃপদগুলো লক্ষণীয়- লোকে কিনা বলে? আবুল ভয়ে অধীর হলো। জল পড়ে পাতা নড়ে। বুলবুলিতে ধান খেয়েছে। খোদা আছেন। পাগলে কিনা বলে?

কর্তৃকারকে বিভক্তির ব্যবহার : কর্তায় শূন্য বিভক্তির উদাহরণই বেশি। যেমন- জল পড়ে পাতা নড়ে। মেলা বসেছে। এ (য়ে) বা তে বিভক্তি : লোকে কি বলবে? চোরে চুরি করে। গরুতে ঘাস খায়। বুলবুলিতে ধান খেয়েছে। ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া ইত্যাদি।

কর্তৃবাচ্যে ও ভাববাচ্যে কে ও র বিভক্তি হয়। যেমন- তোমাকে যেতে হবে অথবা তোমার যেতে হবে।

কর্মবাচ্যে তৃতীয়া বিভক্তি নির্দেশক 'কর্তৃক' এই পরপদ অথবা ষষ্ঠী বিভক্তি নির্দেশক 'র' দের বা দিগের বিভক্তি বা বিভক্তি স্থানীয় অনুসর্গ যুক্ত হয়। যেমন- মুনি কর্তৃক শ্লোকটি পঠিত হলো (কর্মবাচ্য), আমার অথবা আমাদের যেতে হবে (ভাববাচ্যে)।

কর্তৃপদের শূন্য বিভক্তি অথবা 'এ' 'যে', ও 'তে' 'রা' বিভক্তিকে প্রথমা বিভক্তি বলা হয়। 'যে' বিভক্তি 'এ' বিভক্তিরই অন্যরূপ, এটি কোনো আলাদা বিভক্তি নয়।

খ. কর্ম-কারক

সংজ্ঞা : ক্রিয়ার বিষয়কে কর্ম বলে। যা করা যায়, দেখা যায়, শোনা যায়, বলা যায় ইত্যাদি তাই কর্ম। সাধারণত কর্মপদে শূন্য কে, 'র' দিগকে প্রভৃতি বিভক্তি বসে। যেমন- তুমি বই পড়। গরুতে ঘাস খায়। সকলের কথা বিশ্বাস করো না।

কর্ম-কারকে বিভক্তির ব্যবহার : কর্তৃ ও কর্মকারকে 'র' ও 'এর' বিভক্তির প্রয়োগ হয়ে থাকে। যেমন- রোগীর সেবা, দেহের যত্ন ইত্যাদি।

কর্মবাচ্যের কর্মে শূন্য বিভক্তি বসে, যেমন- বালক কর্তৃক চোরধৃত হলো। কর্মবাচ্যের কর্মের শূন্য বিভক্তিকে বলা হয় প্রথমা বিভক্তি। আর কর্তৃবাচ্যের কর্মের কে, রে, এ বিভক্তিকে দ্বিতীয়া বিভক্তি বলা হয়।

গ. করণ কারক

সংজ্ঞা : কর্তা যার সাহায্যে ক্রিয়া সম্পাদন করে তাকে করণ কারক বলে। যেমন- রহিম হাত দিয়ে ফল পাড়ছে। এই বাক্যে 'হাত দিয়ে' করণ কারক। অনুরূপ – কলম দিয়ে লেখ। জেলে জাল দিয়ে মাছ ধরে ইত্যাদি বাক্যে 'দ্বারা' 'দিয়ে' যুক্ত পদগুলো করণ কারক। দ্বারা, দিয়ে, কর্তৃক প্রভৃতিকে তৃতীয়া বিভক্তি বলা হয়।

করণ কারকে বিভক্তির ব্যবহার : করণ কারকে কখনো কখনো এ, য় তে প্রভৃতি বিভক্তিও বসে; যথা- সে কানে শোনে না। ভক্তের স্তবে ভগবান তুষ্ট হন। মির্জা মিয়া যাতিতে হাত কেটে ফেলেছে।

ক্রীড়া ও প্রহারার্থক ক্রিয়া যোগে করণ কারকে শূন্য বিভক্তি বসে। যেমন- বালকেরা ভাল খেলছে। গুন্ডারা লাঠি মেরে পথিককে মেরে ফেলল।

ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যযোগে করণে 'র', 'এ' 'এর' বিভক্তি বসে। যেমন- লাঠির গুতো ছোরার ঘা। হাতের (হাত+এর) তৈরি জিনিস।

ঘ. সম্প্রদান কারক

সংজ্ঞা : যার উদ্দেশ্যে স্বত্ব ত্যাগ করে কিছু দান করা যায়, তাকে সম্প্রদান কারক বলে। যেমন- দারিদ্র্যকে বস্ত্র দান কর– এই বাক্যে দরিদ্রকে সম্প্রদান কারক। অনুরূপ– ভিক্ষুককে অন্ন দিবে। এতিমকে দয়া কর। অনেকে সম্প্রদানকে ভিন্ন কারক বলে স্বীকার না করে গৌণ কর্ম বলে নির্দেশ করে থাকেন।

সম্প্রদান কারকে বিভক্তির ব্যবহার : সম্প্রদান কারকে 'কে', 'রে' 'এ' বিভক্তির ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন- জীবকে আহার দিবে। "তোমারে দিব না টাকা।" গৃহহীনে গৃহ দাও। সম্প্রদান কারকের বিভক্তিগুলোকে চতুর্থী বিভক্তি বলা হয়ে থাকে।

নিমিত্তার্থেও এই বিভক্তির প্রয়োগ হয়। যেমন- বেলা যে পড়ে এল জলকে চল। তিনি হজ্বে যাবেন। কিন্তু চতুর্থী বিভক্তির পদ হলেও এটি সম্প্রদান কারক নয়।

ঙ. অপাদান কারক

সংজ্ঞা : যা থেকে বিশ্লেষ বা উচ্ছেদ হওয়া বোঝায়, তাকে অপাদান কারক বলে। চলন, পতন, ভয়, ত্রাণ, উৎপত্তি উত্থান, লজ্জা, পরাজয় প্রভৃতি বোঝায়। বালক ব্যাঘ্র হইতে ভয় পাইতেছে। বিপদ হইতে ত্রাণ কর। হিমালয় হইতে গঙ্গা উৎপন্ন হইয়াছে।

অপাদান কারকে বিভক্তির ব্যবহার : 'হইতে' এই পরপদ এবং 'এ' 'তে' এবং শূন্য বিভক্তি অপাদান কারকে ব্যবহৃত হয়। অপাদান কারকের বিভক্তিকে পঞ্চমী বিভক্তি বলা হয়।

'এ' বিভক্তির উদাহরণ : লোকমুখে শুনলাম, "আমি কি ডরাই কভু ভিখারী বাঘবে।"

'তে' বিভক্তির উদাহরণ – ঝরনাতে জল আনতে যাও, নদীতে মাছ ধরা সহজ নয়।

শূন্য বিভক্তির উদাহরণ – এতক্ষণে চাটগাঁ মেইল ঢাকা ছেড়েছে। "সমস্ত দুপুরে দোকান পালিয়ে কোথা ছিলিরে, কেষ্ট?"

চ. অধিকরণ কারক

সংজ্ঞা : ক্রিয়ার আধারকে অধিকরণ কারক বলে। যাতে কোনও কিছুর অবস্থিতি বোঝায়, তারই নাম আধার। যেমন- "জলে মাছ আছে" এই উদাহরণে জলে অধিকরণ কারক। অধিকরণ কারকে যখন 'এ', 'তে' এবং 'য়' বিভক্তি বসে, তখন তাদেরকে সপ্তমী বিভক্তি বলা হয়।

অধিকরণ কারকে বিভক্তির ব্যবহার : অধিকরণের একবচনের 'এ' 'য়' 'তে' বিভক্তি এবং বহুবচনে 'দিগে', 'দিগেতে' বিভক্তি বসে। এরা যখন যে যে কারকে ব্যবহৃত হয়, তখন সেই সেই কারকের বিভক্তিরূপে পরিগণিত হয়।

এ বিভক্তি প্রায় সব কারকেই ব্যবহৃত হয়। 'য়' বিভক্তি 'এ' বিভক্তিরই উচ্চারণের রূপান্তর মাত্র। যেমন- জল+এ=জলে, গঙ্গা+য় = গঙ্গায়, নদী+তে = নদীতে

লক্ষণীয় যে, আ-কারান্ত ও ঈ কারান্ত শব্দে 'এ' বিভক্তির স্থানে 'য়' ও 'তে' বিভক্তি বসেছে। অধিকরণ কারকে শূণ্য বিভক্তিরও বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন-

শনিবার ঢাকা যেতে হবে।

আজ বাবা বাড়ি নেই। ইত্যাদি।

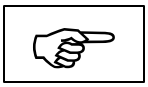

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. নৈর্বিত্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। বাংলায় বিভক্তি স্থানীয় শব্দকে বলে-

ক. উপসর্গ　　খ. অনুসর্গ

গ. ক্রিয়া বিভক্তি　　ঘ. কর্ম প্রবচনীয়

২। উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ?

ক. করণ কারকে এ বিভক্তি　　খ. কর্তৃকারকে ৭মী বিভক্তি

গ. অনুসর্গ　　ঘ. উপসর্গ

৩। জল পড়ে পাতা নড়ে

ক. কর্তায় শূন্য বিভক্তি　　খ. কর্মে শূন্য বিভক্তি

গ. কর্তায় ৭মী বিভক্তি　　ঘ. করণে শূন্য বিভক্তি

৪। ক্রিয়ার বিষয়কে বলে-

ক. উপাদান　　খ. কর্ম

গ. করণ　　ঘ. অধিকরণ

৫। ভিক্ষুককে অন্ন দাও

ক. সম্প্রদানে দ্বিতীয়া　　খ. করণে সপ্তমী

গ. সম্প্রদানে চতুর্থী　　ঘ. অপাদানে সপ্তমী

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

উত্তর

১. খ　　২.　　৩. ক　　৪. খ　　৫. গ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. অনুসর্গের সংজ্ঞা দিন।

২. বিভিন্ন কারকে শূন্য বিভক্তির ব্যবহার দেখিয়ে ৫টি বাক্য লিখুন।

৩. সম্প্রদান ও অধিকরণ কারকের সংজ্ঞা দিন।

৪. কারক কয় প্রকার ও কি কি? প্রত্যেক প্রকার কারকের ১টি করে উদাহরণ দিন।

৫. করণ কারকের সংজ্ঞা দিন। 'এ' ও শূন্য বিভক্তির ব্যবহার দেখিয়ে দুটি বাক্য রচনা করুন।

৬। কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করুন-

পাগলে কিনা বলে।

দরিদ্রকে বস্ত্র দান কর।

গৃহহীনে গৃহ দাও।

হিমালয় হইতে গঙ্গা উৎপন্ন হইয়াছে।

নদীতে মাছ ধরা সহজ নয়।

প্রশ্নগুলোর উত্তর পাঠটি পড়ে নিজে নিজে লিখুন।

বাক্য প্রকরণ

ভূমিকা

এ ইউনিটে আমরা বাক্য নিয়ে আলোচনা করব। বাক্যের মৌলিক উপাদান পদ। তবে এলোমেলোভাবে পদ ব্যবহার করলেই তা বাক্য হবে না। বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হলে তবেই তা বাক্য হবে। এ ধারণাটিকে মাথায় রেখে বাক্যের সংজ্ঞা এভাবে আমরা নিরূপণ করতে পারি।

সুবিন্যস্ত পদসমষ্টি দ্বারা যখন কোনো বিষয়ে কোনো বক্তার ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় তখন তাকে বাক্য বলে।

ভাষার বিচারে বাক্যের তিনটি গুণ থাকা দরকার। সেগুলো হচ্ছে- (১) আকাঙ্ক্ষা, (২) আসত্তি, (৩) যোগ্যতা,

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

* বাক্যে আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি ও যোগ্যতা কাকে বলে তা লিখতে পারবেন।

(ক) পৃথিবী সূর্যের চারদিকে

(খ) করে মাঠে ছেলেরা খেলা

(গ) আকাশে গরু ওড়ে

উদ্ধৃত তিনটি অংশ, কোনোটিই বাক্য নয়। যদিও এগুলোর প্রত্যেকটিতে একাধিক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ধরা যাক (ক) উদাহরণটি- "পৃথিবী সূর্যের চারদিকে" বললে বক্তার মনোভাব পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় না। সেজন্য এটি বাক্য নয়। যদি উদাহরণটি এভাবে লেখা হতো - "পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে" - তাহলে এটিকে বাক্য বলা যেত। কারণ এখানে বক্তার মনোভাব পূর্ণ প্রকাশিত হয়েছে। তাহলে দেখা যাবে বক্তার মনোভাব প্রকাশের জন্য যে যে শব্দ বা পদ প্রয়োজন তার সবগুলোই ব্যবহার করতে হবে।

দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে (খ) সবগুলো প্রয়োজনীয় শব্দই আছে, তবে তা বসান হয়েছে এলোমেলো করে। শব্দগুলো যদি এভাবে বিন্যাস করা যায় - ছেলেরা মাঠে খেলা করে। তাহলে বাক্যটি পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে।

তৃতীয় উদ্ধৃতিতে (গ) বাক্যের প্রথমের দুটি শর্তই আছে। তবে এতে যা বলা হয়েছে- তা সম্ভব নয়। অর্থাৎ গরু আকাশে ওড়ে না, তাই এটি বাক্য নয়। যদি বলা যায়, পাখি আকাশে ওড়ে, - তাহলে এটি সঠিক বাক্য হবে।

প্রথম উদ্ধৃতি : পৃথিবী সূর্যের চারদিকে - এতে আরও জানার আকাঙ্ক্ষা ছিল। 'ঘোরে' পদটি বসানোর ফলে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছে। তাই বলা যায়-

বাক্যের অর্থ নির্দিষ্টভাবে বোঝার জন্য এক পদের পরে অন্য পদ শোনার যে ইচ্ছা, তাই আকাঙ্ক্ষা।

দ্বিতীয় উদ্ধৃতি : করে মাঠে ছেলেরা খেলা - এতে পদগুলোর ক্রম বা বিন্যাস সঠিক নেই। পদগুলোর বিন্যাস - ছেলেরা মাঠে খেলা করে। তাই বলা যায়-

বাক্যের অর্থসঙ্গতি রক্ষার জন্য শৃঙ্খলাযুক্ত পদবিন্যাসকেই আসত্তি বলা যায় ।

তৃতীয় উদ্ধৃতি : গরু আকাশে ওড়ে - বাস্তবসম্মত নয়। যা বাস্তব সম্মত তা হচ্ছে - পাখি আকাশে ওড়ে। তাই বলা যায়-

বাক্যের পদসমূহের মধ্যে যা বাস্তবসম্মত ভাব প্রকাশ করে তাকে যোগ্যতা বলে ।

বাক্য তাই শুধু শব্দসমষ্টি নয় - এতে থাকতে হয় আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি ও যোগ্যতা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। বাক্যের একটি সংজ্ঞা লিখুন

উত্তর ----------

---।

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন

ক. আকাঙ্ক্ষা বলতে বোঝায় ----------

খ. আসত্তি বলতে বোঝায় ----------

গ. যোগ্যতা বলতে বোঝায় ----------

৩। আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি, যোগ্যতার মানদণ্ডে নিচের উদ্ধৃতিগুলো সঠিক বাক্যে রূপান্তর করুন।

ক. আমি প্রতিদিন তিন মাইল হেঁটে স্কুলে

খ. পুকুরে পাখি বাস করে

গ. গ্রামে গাছ উচিত আমাদের লাগান

ঘ. সুন্দরবনে হরিণ যায় পাওয়া চিত্রল

ঙ. দুটি গরু গাছের মাথায় বাসা বেঁধেছে

চ. হাতি আকাশে সাঁতার কাটছে

পাঠটি পড়ে উত্তরগুলো নিজে নিজে লিখুন।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

* বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় চিহ্নিত করতে পারবেন।
* গঠন অনুযায়ী বাক্য কত প্রকার ও কি কি লিখতে পারবেন।

বাক্য বিশ্লেষণ করলে আমরা দুটি অংশ পাই। একটি- বাক্যে কাউকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলা হয় এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়। বাক্যের দুটি অংশের প্রথমটির নাম উদ্দেশ্য ও দ্বিতীয়টির নাম বিধেয়।

বাক্যে যাকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলা হয় তাকে উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা বলা হয় তাকে বিধেয় বলা হয়।

করিম বই পড়ে। এ বাক্যে 'করিম' উদ্দেশ্য। কারণ 'করিম' সম্পর্কে কিছু বলা হচ্ছে। যা বলা হচ্ছে- অর্থাৎ "বই পড়ে" অংশটি বিধেয়।

উদ্দেশ্য ও বিধেয় অনেক সময় সম্প্রসারিত হতে পারে।

আমাদের স্কুলের করিম ভাল ছাত্র।

এখানে উদ্দেশ্য 'করিম' ও উদ্দেশ্যের সম্প্রসারক 'আমাদের স্কুলের'।

লোকটি অত্যন্ত দ্রুত হাঁটতে পারে। এ বাক্যে 'হাঁটতে পারে' বিধেয় ও 'অত্যন্ত দ্রুত' বিধেয়র সম্প্রসারক।

বাক্যের প্রকারভেদ

গঠন অনুযায়ী বাক্যেকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। সেগুলো হচ্ছে- (১) সরল বাক্য (২) মিশ্র বাক্য বা জটিল বাক্য (৩) যৌগিক বাক্য।

করিম স্কুলে গিয়াছে। এখানে 'করিম' উদ্দেশ্য 'গিয়াছে' বিধেয়। এটি একটি সরল বাক্য। যে বাক্যে একটি কর্তা বা উদ্দেশ্য ও একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া বা বিধেয় থাকে তাকে সরল বাক্য বলে।

পাখি আকাশে ওড়ে

↓ ↓

উদ্দেশ্য বিধেয়

মিশ্র বা জটিল বাক্য - যে বাক্যে একটি প্রধান খণ্ড বাক্য থাকে এবং তার অধীনে এক বা একের বেশি অপ্রধান বা আশ্রিত খণ্ড বাক্য থাকে তাকে মিশ্র বা জটিল বাক্য বলে।

যে পরিশ্রম করে সেই সুখ লাভ করে

↓ ↓

অপ্রধান বা আশ্রিত খণ্ড বাক্য প্রধান খণ্ড বাক্য

যৌগিক বাক্য - পরস্পর নিরপেক্ষ দুই বা তার চেয়ে বেশি খণ্ড বাক্য সংযোজক অব্যয় দ্বারা যুক্ত হয়ে একটি বাক্য গঠন করলে তাকে যৌগিক বাক্য বলে। যেমন -

তুমি এলে	তবে	আমি যাব
↓	↓	↓
খণ্ড বাক্য	সংযোজক	খণ্ড বাক্য

সরল বাক্যকে মিশ্র বা জটিল বাক্যে রূপান্তর

সরল বাক্যকে মিশ্র বা জটিল বাক্যে রূপান্তর করতে হলে সরল বাক্যের কোনো অংশকে খণ্ড বাক্যে পরিণত করতে হয় ও উভয়ের সংযোগের জন্য সম্বন্ধসূচক পদের সাহায্যে (যেমন-তবে, যে, সে) পরস্পর সাপেক্ষ করতে হয়। যেমন -

সরল বাক্য	জটিল বা মিশ্র বাক্য
ভিক্ষুককে দান কর।	যে ভিক্ষা চায় তাকে দান কর।
গুণবান ব্যক্তি বিনয়ী হন।	যার গুণ আছে তিনি বিনয়ী।
তিনি দরিদ্র হলেও লোভী নন।	যদিও তিনি দরিদ্র, তবুও লোভী নন।

মিশ্র বা জটিল বাক্যকে সরল বাক্যে রূপান্তর

মিশ্র বাক্যেকে সরল বাক্যে পরিবর্তন করতে হলে মিশ্র বাক্যের প্রধান খণ্ড বাক্যটিকে সঙ্কুচিত করে একটি পদ বা একটি বাক্যাংশে পরিণত করতে হয়। যেমন-

জটিল বাক্য	সরল বাক্য
যারা মূর্খ তারা পশুর সমান।	মূর্খলোক পশুর সমান
যে রক্ষক, সেই ভক্ষক।	রক্ষকই ভক্ষক
যতদিন জীবন থাকবে, মিথ্যাকথা বলব না।	আজীবন মিথ্যা কথা বলব না

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ২

ক. নৈর্বিত্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। কোন বাক্যটি সরল বাক্য?

ক. যিনি বিদ্যা অর্জন করেন তিনি জ্ঞানী।

খ. যাহারা দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধাইয়াছে তাহারা এখন দুঃখ প্রকাশ করিতেছে।

গ. কাক ডাকে।

ঘ. যে গরিব, তাকে সাহায্য কর।

২। সরল বাক্য, জটিল বাক্য ও যৌগিক বাক্যের সংজ্ঞা লিখুন।

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

উত্তর

১. গ

বাগধারার ব্যবহার

সংজ্ঞা : এক বা একাধিক শব্দ যখন বিশিষ্ট একটি অর্থে ব্যবহার করা হয় তখন তাকে বাগধারা বলা হয়। যেমন- অগ্নি পরীক্ষা = কঠিন পরীক্ষা।
বাগধারা বাংলা ভাষার একটি বিশিষ্ট সম্পদ। নিচের বাগধারাগুলো ভাল করে পড়ুন ও ব্যবহার করতে শিখুন।

বাগধারার উদাহরণ

১. অকাল কুষ্মাণ্ড (অপদার্থ) - অকাল কুষ্মাণ্ড ছেলেটা প্রতিবছর ফেল করে, তাকে দিয়ে কোনো কাজ হবে না।

২. অক্কা পাওয়া (মারা যাওয়া) - চোরটা দুদিনের জ্বরেই অক্কা পেয়েছে।

৩. অগস্ত্য যাত্রা (চির দিনের জন্য প্রস্থান) - বাবা-মার বকুনি খেয়ে ছেলেটা সেই যে বাড়ি থেকে পালাল, আর ফিরল না – কে জানত এই হবে তার অগস্ত্য যাত্রা।

৪. অন্ধের যষ্টি (একমাত্র অবলম্বন) – বুড়ি মায়ের অন্ধের যষ্টি সেই ছেলেটিও গতকাল সাপের কামড়ে মারা গেছে।

৫. অরণ্যে রোদন (নিষ্ফল আবেদন) – ঐ কৃপণ বুড়োর কাছে টাকা চাওয়া আর অরণ্যে রোদন একই কথা।

৬. অগাধ জলের মাছ (চতুর ব্যক্তি) – সে তো অগাধ জলের মাছ, তার মনের ফন্দি-ফিকির বুঝবে কি করে?

৭. অন্ধকারে ঢিল ছোড়া (না জেনে কিছু করা) – বিষয়টা আগে ভাল করে জেনে নাও, অন্ধকারে ঢিল ছোড়ার দরকার কি?

৮. অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী (অল্পবিদ্যার গর্ব) – অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী বলেই ফটিক মিয়া শিল্পী, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক কারো সমালোচনাই বাদ দেয় না।

৯. অর্ধচন্দ্র দান (গলাধাক্কা) – বেয়াদব লোকটাকে অর্ধচন্দ্র দিয়ে মজলিশ থেকে বিদায় করে দাও।

১০. অমাবস্যার চাঁদ (অদর্শনীয়) – তুমি যে অমাবস্যার চাঁদ হয়ে গেলে, তোমার আর দেখাই পাওয়া যায় না।

১১. অগ্নি পরীক্ষা (চরম পরীক্ষা) – জাতীয় জীবনে এ এক অগ্নি পরীক্ষা - এতে আমাদের উত্তীর্ণ হতেই হবে।

১২. আকাশ কুসুম (অসম্ভব কল্পনা) – ঘরে বসে আকাশ কুসুম কল্পনা করলে কিছু হবে না - চাই পরিশ্রম আর নিষ্ঠা।

১৩. আক্কেল সেলামি (বোকামির সেলামি) বিনা টিকিটে ট্রেনে চড়ে ৫০ টাকা আক্কেল সেলামি দিয়ে ফিরে এলাম।

১৪. আঙুল ফুলে কলাগাছ (হঠাৎ বড়লোক হওয়া) – কাঁচামালের ব্যবসা করে এখন আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে।

১৫. আদায়-কাচকলায় (শত্রুতা) – দু ভায়ের সম্পর্ক আদায়-কাচকলায়, কেউ কারো মুখ পর্যন্ত দেখে না।

১৬. আক্কেল গুড়ুম (হতবুদ্ধি) – তার মিথ্যা অভিযোগ শুনে তো আমার আক্কেল গুড়ুম।

১৭. আমড়া কাঠের ঢেঁকি (অপদার্থ) – সে একটা আমড়া কাঠের ঢেঁকি - তাকে কোনো দায়িত্ব দিয়ে লাভ নেই।

১৮. আকাশ ভেঙে পড়া (ভীষণ বিপদে পড়া) – চাকুরি হারিয়ে তার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে।

১৯. আঠার মাসে বছর (দীর্ঘসূতী)– তার আঠার মাসে বছর, কোনো কাজই সে সময়মত করতে পারে না।

২০. আলালের ঘরের দুলাল (অতি আদরে নষ্ট পুত্র) – রোদ-বাতাস সইতে পারে না, পরিশ্রম করতে পারে না এমন আলালের ঘরের দুলালের হাতে আমার ব্যবসার কাজকর্ম ছেড়ে দিতে পারি না।

২১. আষাঢ়ে গল্প (অসম্ভব কাহিনী) – তুমি খালি হাতে বাঘ মেরেছ -এটা আষাঢ়ে গল্প ছাড়া কিছুই নয়।

২২. ইঁচড়ে পাকা (অকালপক্ব) – ও ইঁচড়ে পাকা ছেলে- না হলে বাবা-মায়ের সঙ্গে এরকম তর্ক করে।

২৩. ইতর বিশেষ (পার্থক্য) – ছেলে-মেয়ের মধ্যে ইতর বিশেষ না করে দুজনেরই লেখাপড়ার সমান সুযোগ দাও।

২৪. উত্তম মধ্যম (প্রহার) – পুলিশে দিয়ে কি হবে, চোরটিকে উত্তম মধ্যম দিয়ে গাঁ থেকে বের করে দাও।

২৫. এক চোখা (পক্ষপাতিত্ব) – গাঁয়ের মোড়ল একচোখা, তার কাছে সুবিচার পাবে কি করে?

২৬. এলাহি কাণ্ড (বিরাট আয়োজন) – ছেলের জন্মদিনে এতবড় আয়োজন এ যে এক এলাহি কাণ্ড।

২৭. কলুর বলদ (একটানা খাটুনি) – সারাদিন সংসারে কলুর বলদের মতো খেটে মরছি – তবু কেউ দুটো ভাল কথা বলে না।

২৮. কথার কথা (গুরুত্বহীন কথা) – কাউকে আঘাত দেওয়ার জন্য একথা বলিনি এ নেহায়েতই কথার কথা।

২৯. কত ধানে কত চাল (হিসাব করে চলা) – তোমাকে তো উপার্জন করে সংসার চালাতে হয় না আমি উপার্জন করে সংসার চালাই - তাই জানি কত ধানে কত চাল।

৩০. কড়ায় গণ্ডায় (পুরোপুরি) – আগে কড়ায় গণ্ডায় পাওনা বুঝিয়ে দাও তারপরে তোমার অন্য কথা।

৩১. কেতাদুরস্ত (পরিপাটি) – করিম পোশাকে কেতাদুরস্ত হলে কি হবে লেখাপড়া তো কিছুই জানে না।

৩২. কাঠের পুতুল (নির্জীব) – ওই কাঠের পুতুল দিয়ে কিছু হবে না, এত ব্যবসা চালাতে হলে চটপটে বুদ্ধিমান ছেলে দরকার।

৩৩. কান পাতলা (বিশ্বাসপ্রবণ) – লোকটির ভয়ানক কান পাতলা, যে যা বলে তাই বিশ্বাস করে।

৩৪. কেঁচেগণ্ডুষ (পুনরায় আরম্ভ করা) – অঙ্ক সবই ভুলে বসে আছি, ছেলেকে পড়াতে যেয়ে আবার কেঁচেগণ্ডুষ করতে হচ্ছে।

৩৫. খয়ের খাঁ (চাটুকার) – তুমি তো বড় সাহেবের খয়ের খাঁ তুমি আমাদের আন্দোলনে আসবে না।

৩৬. গড্ডলিকা প্রবাহ (অন্ধ অনুকরণ) – আমি তোমাদের মতো গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিতে চাই না, নিজের মতো করে নিজে বাঁচতে চাই।

৩৭. গলগ্রহ (পরের বোঝা স্বরূপ) – আমি কারো গলগ্রহ নই, গায়ে খেটে নিজের অন্ন জোগাড় করি।

৩৮. গোবর গণেশ (মূর্খ) – ছেলেটা একেবারে গোবর গণেশ, বুদ্ধিশুদ্ধি বলতে কিছুই নেই।

৩৯. গোঁফ খেজুরে (অলস) – সে যা গোঁফ খেজুরে লোক, ঢাকনা খুলে হাঁড়ির ভাতটুকু নিয়েও খেতে পারবে না।

৪০. গোড়ায় গলদ (আরম্ভে ভুল) – অঙ্ক মিলবে কি করে, গোড়াতেই যে গলদ করে বসে আছ।

৪১. গুড়ে বালি (আশায় নৈরাশ্য)- ভেবেছিলাম এবার ভাল ফসল পাব কিন্তু সে গুড়ে বালি, বান সব ভাসিয়ে নিয়ে গেছে।

৪২. ঘোড়া রোগ (সাধ্যের অতিরিক্ত করা) - দুবেলা ভাত জোটে না, এদিকে প্রতি রাতে সিনেমা দেখার শখ এ ঘোড়া রোগ ছাড়া আর কি!

৪৩. চিনির বলদ (ভারবাহী কিন্তু লাভের অংশীদার নয়) – সংসারে দিনরাত খেটে মরছি কিন্তু চিনির বলদের মতো লাভের লাভ কিছুই পাই না।

৪৪. চোখের বালি (চক্ষুশূল) – ছেলেটা সৎমায়ের চোখের বালি দিনরাত গালিই শোনে।

৪৫. ছকড়া নকড়া (সস্তা দর) – বাজারে ইলিশ মাছের আমদানি বেশি, তাই ছকড়া নকড়া দরে বিক্রি হচ্ছে।

৪৬. ছেলের হাতের মোয়া (সহজলভ্য বস্তু)- একি ছেলের হাতের মোয়া যে চাইলেই পাবে, ভাল ফলাফল করতে চাইলে পরিশ্রম করে অনেক বেশি পড়তে হবে।

৪৭. জিলিপির প্যাচ (কুটিলতা) – ওর কথা বিশ্বাস করো না, বাইরে ওকে ভাল মানুষের মতো দেখালেও পেটের ভিতরে ওর জিলিপির প্যাচ।

৪৮. টনক নড়া (চৈতন্য লাভ করা) – একবার ফেল করে ওর টনক নড়েছে, এবার বছরের শুরুতেই লেখাপড়া আরম্ভ করেছে।

৪৯. ঠোঁট কাটা (বেহায়া) – ও ছেলের ঠোঁট কাটা, মুরুব্বির সামনেও বেফাঁস কথা বলে ফেলতে পারে।

৫০. তাসের ঘর (ক্ষণস্থায়ী) – ওদের মধ্যে এত দহরম মহরম কিন্তু সামান্য স্বার্থের টানাপোড়নেই বন্ধুত্ব তাসের ঘরের মতো ভেঙে গেল।

৫১. দহরম মহরম (ঘনিষ্ঠতা) – বড় সাহেবের সঙ্গে তোমার যে দহরম মহরম সহজেই তুমি কাজটা তার কাছ থেকে বাগিয়ে নিতে পারবে।

৫২. নয় ছয় (অপচয়)- দুদিনেই ছেলেটা পৈতৃক সম্পত্তি নয় ছয় করে উড়িয়ে দিল।

৫৩. পটল তোলা (মারা যাওয়া) – জনতার হাতে বেদম মার খেয়ে চোরটা গতরাতে পটল তুলেছে।

৫৪. বাঘের দুধ (সহজপ্রাপ্য নয় এমন বস্তু) – টাকায় কিনা পাওয়া যায় - চাইলে বাঘের দুধও পাওয়া যায়।

৫৫. মিছরির ছুরি (মুখে মধু অন্তরে বিষ) – ওর কথায় যত মধুই থাক ও মিছরির ছুরি, অন্তরে তার কথা বিধে যায়।

৫৬. মগের মুল্লুক (অরাজক দেশ) – একি মগের মুল্লুক পেয়েছ যা খুশি তাই করবে।

৫৭. রুই কাতলা (পদস্থ ব্যক্তি) – তিনি সমাজের একজন রুই-কাতলা তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে কি রক্ষা পাওয়া যাবে?

৫৮. শাঁখের করাত (উভয় সঙ্কট) – এদিকে বন্ধুদেরও বিপদে ফেলতে পারি না আবার শিক্ষকদেরকে মিথ্যা কথাও বলতে পারি না আমার অবস্থা শাঁখের করাতের মত।

৫৯. হাটে হাঁড়ি ভাঙা (গোপন কথা ফাঁস করা) – আমাকে জব্দ করার চেষ্টা করলে হাটে হাঁড়ি ভেঙে তোমার সব গোপন কথা ফাঁস করে দেব।

৬০. হাত টান (চুরির অভ্যাস) – টাকা পয়সা সাবধানে রাখ চাকরটার হাত টানের অভ্যাস আছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. নৈর্বিত্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। কেঁচোগণ্ডূষ' বাগধারার সঠিক অর্থ কোনটি?

ক. নির্জীব　　খ. চতুর

গ. পুনরায় আরম্ভ করা　　ঘ. ভুলে যাওয়া

২। পটল তোলা বাগধারার অর্থ-

ক. বেঁচে যাওয়া　　খ. মৃত্যুবরণ করা

গ. মূর্খ　　ঘ. অনির্দিষ্ট

৩। নিচের কোন বাক্যটিতে সঠিকভাবে বাগধারা ব্যবহৃত হয়েছে?

ক. আমি আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছি।

খ. আমি বাজার থেকে অগাধ জলের মাছ কিনব।

গ. কিছুই জানে না কিন্তু গর্বের শেষ নেই, একে বলে অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী।

ঘ. বুড়োটা ভারি ইঁচড়ে পাকা।

৪। নিচের বাগধারাগুলো দিয়ে সার্থক বাক্য রচনা করুন।

ক. ইতর বিশেষ ----------

খ. অর্ধচন্দ্র দান ----------

গ. কান পাতলা ----------

ঘ. ঘোড়া রোগ ----------

ঙ. ছকড়া নকড়া ----------

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

উত্তর

১। গ ২। খ ৩। গ

বাক্য সংক্ষেপণ

বাক্যকে সংক্ষিপ্ত করে প্রকাশের নামই বাক্য সংক্ষেপন। ভাষাকে সহজ, সুন্দর ও প্রকাশকে সাবলীল করার জন্য বাংলা ভাষায় বাক্য সংক্ষেপণ অত্যন্ত প্রচলিত একটি নিয়ম। সাধারণভাবে বাক্য সংক্ষেপণ সমাস, উপসর্গ ও প্রত্যয়ের সাহায্যে হয়ে থাকে। এরকম কিছু উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হল।

বাক্য সংক্ষেপণের উদাহরণ

অকালে পক্ক হয় যা – অকালপক্ব

অনুসন্ধান করিবার ইচ্ছা – অনুসন্ধিৎসা

অগ্রে বর্তমান থাকে যে – অগ্রবর্তী

অক্ষির সম্মুখে – প্রত্যক্ষ

অহঙ্কার করে যে – অহঙ্কারী

অভিজ্ঞতার অভাব – অনভিজ্ঞ

অনেকের মধ্যে একজন – অন্যতম

অনুতে (পশ্চাতে) জন্মেছে যে – অনুজ

আকাশে চরে যে – খেচর

আপনাকে কেন্দ্র করেই যার চিন্তা – আত্মকেন্দ্রিক

আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে যে – আস্তিক

ইতিহাস রচনা করেন যিনি – ঐতিহাসিক

ঈষৎ আমিষ গন্ধ যার – আঁষটে

উপকারীর উপকার স্বীকার করে যে – কৃতজ্ঞ

আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত – আদ্যন্ত

একই মাতার উদরে যার যাত – সহোদর

কবিতা লেখেন যিনি - কবি

কর্ম সম্পাদনে পরিশ্রমী – কর্মঠ

যাহা উড়িতেছে – উড্ডীয়মান

যাহা নিয়ত পরিবর্তিত হইতেছে – পরিবর্তনশীল

যাহার কোথাও কোনো ভয় নাই – অকুতোভয়

যা হতে পারে না – অসম্ভব

পা থেকে মাথা পর্যন্ত – আপাদমস্তক

যা বিশ্বাস করা যায় না – অবিশ্বাস্য

রব শুনে এসেছে যে – রবাহূত

যা মৃতের মতো –মৃতবৎ

যা সহজে লাভ করা যায় – সুলভ

যা যুক্তিসঙ্গত নয় – অযৌক্তিক

যা দেখা যায় না – অদৃশ্য

যা ক্রমশ বর্ধিত হচ্ছে – বর্ধিষ্ণু

খাইবার ইচ্ছা – ক্ষুধা

জীবন পর্যন্ত – আজীবন

পান করার ইচ্ছা – পিপাসা

মমতা নেই যার - নির্মম

যা পূর্বে কখনও দেখা যায়নি – অদৃষ্টপূর্ব

যা কষ্টে জয় করা যায় – দুর্জয়

যা জলে ও স্থলে চরে – উভচর

যা লেহন করে খেতে হয় – লেহ্য

যা বর্ণনা করা যায় না – অবর্ণনীয়

যা সারাদিন ব্যবহার করা হয় – আটপৌরে

যা পূর্বে ছিল এখন নাই – ভূতপূর্ব

যা পরিমাণ করা যায় না – অপরিমেয়

যে নারী প্রিয় বাক্য বলে – প্রিয়ংবদা

যিনি অধিক ব্যয় করেন না – মিতব্যয়ী

যা বলার যোগ্য নয় – অকথ্য

যা অতি দীর্ঘ নয় – নাতিদীর্ঘ

যে জামাই শ্বশুর বাড়িতে থাকে - ঘর জামাই

যে গাছ কোনো কাজে লাগে না – আগাছা

যে পুরুষ বিয়ে করেননি – অকৃতদার

যে ভবিষ্যৎ না ভেবেই কাজ করে – অবিমৃষ্যকারী

যিনি বক্তৃতা দানে পটু – বাগ্মী

হরিণের চামড়া – অজিন

অশ্বের ডাক – হ্রেষা

যার শেষ নাই – অশেষ

লজ্জা বেশি যার - লাজুক

লাজ্জা নেই যার - নির্লজ্জ, বেহায়া

শ্রদ্ধার যোগ্য - শ্রদ্ধেয়

শুভক্ষনে জন্ম যার - ক্ষনজন্মা

সবচেয়ে বড় - জেষ্ঠ্য

সবচেয়ে ছোট - কনিষ্ঠ

সকলের জন্য প্রযোজ্য - সার্বজনীন

সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ - সর্বশ্রেষ্ঠ

সেবা করেন যিনি - সেবক/সেবিকা

হিসাব করে চলে না যে - বেহিসাবি

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। সত্য হলে স এবং মিথ্যা হলে মি লিখুন

ক. যা অতি দীর্ঘ নয় –সংক্ষিপ্ত হলে হয় নাতিদীর্ঘ

খ. যিনি বক্তৃতা দানে পটু – বাক্যটি সংক্ষেপ করা যায় না

গ. যা যুক্তিসঙ্গত নয় – সংক্ষিপ্ত রূপ হবে অযৌক্তিক

ঘ. খাইবার ইচ্ছা – সংক্ষিপ্ত রূপ রান্নাঘর

ঙ. উড্ডীয়মান শব্দটির বিস্তারিত রূপ 'যাহা উড়িতেছে'।

২। এক কথায় প্রকাশ করুন

ক. অক্ষির সমীপে –

খ. ঈষৎ আমিষ গন্ধ যার –

গ. অনেকের মধ্যে একজন –

ঘ. যা হতে পারে না–

ঙ. যা কষ্টে জয় করা যায়–

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

উত্তর

১। ক. স খ. মি গ. স ঘ. মি ঙ. স

২। ক. প্রত্যক্ষ খ. আঁষটে গ. অন্যতম ঘ. অসম্ভব ঙ. দুর্জয়

বিরাম চিহ্ন

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

১. বিরাম চিহ্নের পরিচয় বর্ণনা করতে পারবেন।

২. বিরাম চিহ্নের সংজ্ঞা লিখতে পারবেন।

পাঠ

বিরাম শব্দের অর্থ বিন্যাস, যতি, বিরতি বা থেমে যাওয়া। আমরা সব সময় নানা প্রয়োজনে কথা বলি। কিন্তু আমরা অনবরত কথা বলে যাই না। এভাবে কথা বলা সম্ভবও নয়। সে জন্য কথা বলার সময় মাঝে মাঝে থামতে হয়। কখনো আমরা অল্পক্ষণের জন্য থামি, আবার একটু বেশি পরিমাণও থামি। কথা বলে আমরা আমাদের মনোভাব অন্যকে বোঝাতে চাই। না থামলে কথাগুলো অন্যের বোধগম্য হবে না। যেমন-

তুমি কথা দিয়েছিলে তুমি আমাদের বাড়িতে আসবে কিন্তু তুমি আসনি তুমি আসবে শুনে মা কী যে খুশি হয়েছিলেন তিনি তোমার জন্য কত নাস্তা তৈরি করেছিলেন সেমাই ফিরনি চপ বুটের হালুয়া আরো কত কি সালাম কলেজ কি বন্ধ হয়নি ফাঁক পেলে চলে এসো তুমি তো জানো মা তোমাকে কত স্নেহ করেন কী যে ভালো লাগত তুমি এলে।

– উপরের অংশটি আমাদের কারুর মুখের কথা। কথা হল মুখ থেকে বের হওয়া অর্থগ্রাহ্য ধ্বনিসমূহ। মুখে যখন বলি তখন আমরা একটানা গড় গড় করে বলি না, প্রয়োজন মতো থামি। আবার কণ্ঠের স্বরক্ষেপ করে মনের বিচিত্র ভাবও প্রকাশ করি। কখনো প্রশ্ন করি, কখনো বিস্ময় প্রকাশ করি। এভাবে শ্রোতা আমাদের মনোভাব বুঝতে পারে। বক্তা ও শ্রোতার ভাব বিনিময়ের মধ্য দিয়ে সমাজের মানুষের ভাষা তৈরি হয়। মুখের ভাষার লেখ্য রূপও অর্থগ্রাহ্য হবে। সে জন্য বলার সময় আমরা যেভাবে থামি বা স্বরক্ষেপ দিই সেইরকম করে লেখার ভাষাতেও সেগুলো দিতে হয়। এগুলো হল কিছু চিহ্ন, যেমন- দাঁড়ি (।), কমা(,), সেমিকোলন (;), প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?), বিস্ময় বোধক চিহ্ন (!) ইত্যাদি। এগুলোকেই বিরাম চিহ্ন বা যতি চিহ্ন বলা হয়।

আগের গদ্য অংশটিতে কোথায়ও বিরাম চিহ্ন নেই। ফলে ঐ অংশটি পড়া মুশকিল। বিরাম চিহ্ন ব্যবহার করলেই অংশটি পড়ুয়ার কাছে পূর্ণভাবে স্পষ্ট হবে। –

তুমি কথা দিয়েছিলে তুমি আমাদের বাড়িতে আসবে, কিন্তু তুমি আসনি। তুমি আসবে শুনে মা কী যে খুশি হয়েছিলেন। তিনি তোমার জন্য কত নাস্তা তৈরি করেছিলেন। সেমাই, ফিরনি, চপ, বুটের হালুয়া, আরো কত কি। সালাম, কলেজ কি বন্ধ হয় নি? ফাঁক পেলে চলে এসো। তুমি তো জানো, মা তোমাকে কত স্নেহ করেন। কী যে ভালো লাগত তুমি এলে।

দেখুন, দাঁড়ি (।), কমা (,) ইত্যাদি চিহ্ন ব্যবহার করার কারণে অংশটি আমাদের কাছে কেমন স্বচ্ছ হয়ে গেল। সুতরাং বাক্যের অর্থগ্রাহ্যতার জন্য বিরাম চিহ্ন ব্যবহার আবশ্যিক। এটি বাংলা লেখনরীতির অনিবার্য নিয়ম।

বিরাম চিহ্নের সংজ্ঞা

অর্থগ্রাহ্যতা বা জিজ্ঞাসা, বিস্ময় ইত্যাদি মনোভাব প্রকাশের জন্য বাক্যে যে সব বিরতি চিহ্ন বা মনোভাব জ্ঞাপন চিহ্ন ব্যবহৃত হয় সেগুলোকে বিরাম চিহ্ন বলে।

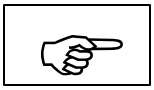

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বিরাম চিহ্ন কোনগুলো? বিরাম চিহ্ন কেন ব্যবহার করা হয়?

২. বিরাম চিহ্নের সংজ্ঞা লিখুন।

৩. মুখের ভাষার লেখ্যরূপ কীভাবে অর্থগ্রাহ্য হয়?

পাঠের সাহায্য নিয়ে উত্তরগুলো নিজে নিজে লিখুন।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

১. বিরাম চিহ্ন ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জানতে পারবেন।

২. বিরাম চিহ্ন প্রয়োগের গুরুত্ব বুঝতে পারবেন।

পাঠ

লেখার ভাষা মুখের ভাষার প্রতিরূপ। আগে বলা হয়েছে যে, আমরা হড়হড় করে বলি না, প্রয়োজন মতো থামি। হড়হড় করে কথা বলতে থাকলে দম ফুরিয়ে যায়। তখন নতুন দম নিয়ে কথা চালিয়ে যেতে হয়। এর থেকে বুঝতে পারি আমাদের কথা বলার রীতি নিয়মের সঙ্গে আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস জড়িত। আমরা ক্ষণে ক্ষণে শ্বাস নিই, আবার শ্বাস ফেলেও দিই। এই শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে মিলিয়েই আমাদের কথা বলার ধরন গড়ে উঠেছে। এই শ্বাস-প্রশ্বাসের কথা মনে রেখে লিখিত ভাষায় দাঁড়ি, কমা ইত্যাদি বিরাম চিহ্ন বা যতি চিহ্ন প্রয়োগ করতে হয়।

সুতরাং এ কথা বলা যেতে পারে যে, শ্বাস যতির কারণে লিখিত ভাষায় বিরাম চিহ্ন ব্যবহারের প্রয়োজন হয়েছে।

এই দৃষ্টান্তটি লক্ষ্য করুন-

পথে যেতে যেতে আমি এমনই ক্লান্ত হয়ে পড়লাম যে, আমার পক্ষে আর হাঁটা সম্ভব ছিল না।

এই বাক্যে একটি মাত্র কমা দিতে হয়েছে বিরতি বোঝানোর জন্য। এই বিরাম চিহ্ন শ্বাস যতি নির্দেশ করে।

কিন্তু শ্বাস যতি বোঝানো বিরাম চিহ্নের প্রধান কাজ নয়। বিরাম চিহ্ন ব্যবহারের প্রধান লক্ষ্য বাক্যের অর্থ সুস্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন করা। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে শ্বাস যতির চেয়ে অর্থ যতির গুরুত্ব বেশি। লিখিত ভাষাকে বিরাম চিহ্ন দিয়ে বিভক্ত করলেই কেবল ভাষা সুবোধ্য হয়ে ওঠে এবং বাক্য অর্থ সংগতি লাভ করে। তখন বাক্য পড়তে আমাদের কোনো অসুবিধা হয় না এবং বক্তব্য সহজে আমরা বুঝে ফেলি। প্রকৃতপক্ষে, লিখিত ভাষার অর্থ বোঝার জন্য ঠিক ঠিক বিরাম চিহ্ন ব্যবহার খুবই দরকারি। নিচের দৃষ্টান্তটি লক্ষ্য করুন :

গরিব ঘরের সুন্দরী মেয়ে, কিন্তু সাজসজ্জার অভাবে মেয়েটিকে তেমন দেখায় না। মেয়েটির অলঙ্কার নেই, প্রসাধন নেই, ভালো শাড়িও নেই। একবার এক পাত্রের ধনী বাবা মেয়েটিকে দেখতে এলেন। তখন মেয়ের মা আর কী করবেন। তাকে তাঁর পুরোনো একখানা কাপড় পরিয়ে দিলেন, চুল আঁচড়ে বেনী করে দিলেন, আর কপালে দিলেন ছোট্ট একটি টিপ, তাতেই মেয়েটি অপরূপা হয়ে উঠল।

যথোপযুক্ত বিরাম চিহ্ন প্রয়োগের জন্য এই অংশটি চমৎকার অর্থগ্রাহ্য হয়েছে। কোথাও কোনো অস্পষ্টতা নেই। দাঁড়ি, কমা ব্যবহারের এই হল গুরুত্ব। ঠিক জায়গায় বিরাম চিহ্ন ব্যবহৃত না হলে বাক্য পড়তেও অসুবিধা, সুতরাং এই কথা বলা যেতে পারে যে,

বিরাম চিহ্ন বা যতিচিহ্ন ব্যবহারের প্রধান কাজ ভাষার বা বাক্যের অর্থগ্রাহ্যতা সৃষ্টি করা।

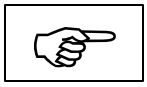

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূল প্রশ্ন

১. বিরাম চিহ্ন ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অল্প কিছু লিখুন।

২. শ্বাস যতি ও অর্থযতি বুঝিয়ে দিন। বিরাম চিহ্ন ব্যবহারের প্রধান কাজ কোনটি?

পাঠের সাহায্য নিয়ে উত্তরগুলো নিজে নিজে লিখুন।

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

* বাংলা ভাষায় বিরাম চিহ্ন ব্যবহারের ইতিহাস জানতে পারবেন।

পাঠ

বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস এক হাজার বছরের কিছু বেশি। কিন্তু বাংলা ভাষায় সুষ্ঠুভাবে বিরামচিহ্ন ব্যবহার শুরু হয়েছে দেড়শ দুইশ বছর আগে। প্রকৃতপক্ষে বাংলা গদ্য ভাষার ব্যাপক ব্যবহারের সূত্রে বিরাম চিহ্ন প্রয়োগের নিয়মনীতি প্রতিষ্ঠত হয়েছে। মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্য কবিতায় লেখা। কবিতাতে বিরাম চিহ্ন ব্যবহারের তেমন আয়োজনও ছিল না, বিরাম চিহ্নের তত বেশি প্রয়োজনও হত না। কবিতার প্রতি চরণের মধ্যখানে একটি কমা (,), চরণের শেষে একটি দাঁড়ি (।) দেওয়া বিধেয় ছিল। পরের চরণের শেষে দুই দাঁড়ি (॥) দিতে হত। যেমন-

অতি বড় বৃদ্ধ পতি, সিদ্ধিতে নিপুণ
কোন গুণ নাই তার, কপালে আগুন।

বাংলা ভাষার মধ্যযুগের শেষ হয় আঠার শতকে। উনিশ শতকে গদ্যের উদ্ভব হয়েছে। গদ্য কাজের ভাষা। জীবনের নানা প্রয়োজনে তখন থেকে গদ্যের ব্যবহার হচ্ছে। গদ্যের জন্য বিরাম চিহ্ন ব্যবহারের গুরুতর প্রয়োজন দেখা দিল। বাংলা গদ্যের সাহিত্যিক লিখিত রূপ প্রথম পাওয়া গেল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্য পুস্তকগুলোতে। কয়েকজন ভালো গদ্য লেখকেরও দেখা পাওয়া গেল। যেমন রাম রাম বসু ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। এঁদের পর রাজা রামমোহন রায়, অক্ষয় কুমার দত্ত প্রমুখ গদ্য লেখকদের আবির্ভাব ঘটলো। কিন্তু এঁরা কেউ বিরাম চিহ্ন সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করতে পারলেন না। তবে এঁদের কাছাকাছি সময়ের স্মরণীয় লেখক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) বাংলা গদ্যে বিরাম চিহ্ন ব্যবহারের নৈপুণ্য দেখালেন। রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বাংলা গদ্যের জনক বলেছেন। আসলে 'বিদ্যাসাগরই বাংলা গদ্যকে যথার্থভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি গদ্য লেখার নিয়মকানুন আবিষ্কার করেন। গদ্য পদ্যের মতো ছন্দোবদ্ধ রচনা নয়, কিন্তু গদ্যেরও ছন্দ আছে। বিরামচিহ্ন ঠিকভাবে ব্যবহার করে বিদ্যাসাগর গদ্যের ছন্দ বুঝিয়ে দিলেন। আর গদ্যভাষাকে সুস্পষ্ট করার পথও তিনি দেখিয়ে দিলেন। দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন ইত্যাদি তিনি এমনভাবে ব্যবহার করলেন যাতে গদ্য পড়তে আমাদের কোনো অসুবিধা না হয়। বেতাল পঞ্চবিংশতি, শকুন্তলা, সীতার বনবাস, ভ্রান্তি বিলাস ইত্যাদি তাঁর রচনা। এই রচনাগুলোর গদ্যভাষা খুব সুন্দর, তবে এই ভাষা আরো সুন্দর হয়েছে বিরামচিহ্ন ব্যবহারের গুণে।

বিদ্যাসাগর ইংরেজি রচনারীতির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। ইংরেজি গদ্যের বিরাম চিহ্ন ব্যবহারের অনুসরণে তিনি বাংলা গদ্যে এগুলো ব্যবহার করেন। বিদ্যাসাগরের পরে বাংলা সাহিত্যে আরও বড় বড় গদ্য লেখকের জন্ম হয়েছে। যেমন- বঙ্কিম চন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, মীর মশাররফ হোসেন, কাজী আবদুল ওদুদ, অন্নদাশঙ্কর রায়, বুদ্ধদেব বসু, সৈয়দ মুজতবা আলী প্রমুখ। এঁদের হাতে বাংলা গদ্যে বিরাম চিহ্ন ব্যবহারের নিয়ম-কানুন আরো সুদৃঢ় যেমন হয়েছে, তেমনি বিচিত্রও হয়েছে। বাংলা লিখিত ভাষায় এখন বিরাম চিহ্ন নিয়ে কেউ ভাবে না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের আমলে এ নিয়ে প্রচুর চিন্তা-ভাবনা করতে হয়েছিল।

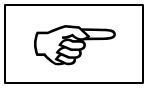

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৩

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলা ভাষায় বিরাম চিহ্ন ব্যবহারের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

২. বাংলা ভাষায় বিরাম চিহ্ন ব্যবহারে বিদ্যাসাগরের অবদান বর্ণনা করুন।

৩. বাংলা ভাষায় বিরাম চিহ্ন ব্যবহারের প্রয়োজন দেখা দিল কোন সময় থেকে? এ সম্পর্কে লিখুন।

পাঠের সাহায্য নিয়ে উত্তরগুলো নিজে নিজে লিখুন।

পাঠ ৪

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

বিরাম চিহ্ন ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন।

ভূমিকা

বিভিন্ন বিরাম চিহ্নের সঠিক ব্যবহার নির্ভর করে এর প্রয়োগের চর্চার উপর। তাই নিচের ব্যবহার বিধি যেমন জানতে হবে তেমনি নিজে নিজে তা চর্চা করতে হবে।

১. দাঁড়ি বা পূর্ণছেদ (।)

বাক্যের বক্তব্য শেষ হলে দাঁড়ি বা পূর্ণছেদ বসে। যেমন- করিম পড়ে।

(ক) বাংলাদেশ আমার মাতৃভূমি।

(খ) পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে।

(গ) আমার মায়ের মতো আর কেই নেই।

(ঘ) জহির ফুটবল খেলে।

(ঙ) অভি গান গায়।

২. কমা [,]

বাক্যের মধ্যে স্বল্পতম সময়ের বিরতির জন্য কমা [,] ব্যবহার করা হয়। যেমন-

(ক) বাক্যে একই পদের একাধিক শব্দ থাকলে কমা ব্যবহৃত হয়। যেমন- রিমু, ঝিমু, এষা সবাই কলেজে গেছে।

(খ) সে, তুমি, আমি, তিনজনেই যাব।

(গ) ঢাকা গেলাম, ঘুরলাম, দেখলাম, ফিরে এলাম।

(ঘ) বলেছি, বকেছি, এখন হাল ছেড়ে।

(ঙ) অমিত, আমার কলমটা নিয়ে এসো।

(চ) হেড মাস্টার বললেন, "তোমার এ ফলাফল আশা করিনি।"

(ছ) ডাঃ ওয়াহিদ রহমান, এম,বি,বি,এস।

৩. সেমিকোলন [;]

কমার চেয়ে একটু বেশি ও দাঁড়ির চেয়ে কম থামতে হলে সেমিকোলন ব্যবহার করতে হয়। যেমন -

(ক) লোকটি ভাল; তবে একগুয়ে স্বভাবের।

(খ) এবার বর্ষা হয়েছে সময়মত; তাই ফসল হবে ভাল।

(গ) নিষ্ঠাবান শিক্ষকের অভাব; সবাই শিক্ষা নিয়ে ব্যবসা করছে।

(ঘ) আগে চাই মাতৃভাষার পত্তন; পরে ইংরেজি শেখার ব্যবস্থা।

৪. কোলন ও কোলন ড্যাশ [:] [: -]

সাধারণত উদ্ধৃতি ও দৃষ্টান্ত বোঝানোর জন্য কোলনের ব্যবহার হয়। যেমন-

(ক) মেলায় দারুণ ভিড় : পুতুল নাচের রমরমা ব্যবসা

(খ) কারক ছয় প্রকার। যথা : - কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ।

৫. জিজ্ঞাসা চিহ্ন [?]

প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা বুঝালে জিজ্ঞাসাবোধক চিহ্ন [?] বসে। যেমন-

(ক) তোমার নাম কি? বাড়ি কোথায়?

(খ) একি সেই ডাকাত? যাকে ধরার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে?

বিস্ময়সূচক বাক্যের পরেও জিজ্ঞাসা চিহ্ন বসে। যেমন - একি! এক ঝুড়ি আম সকাল থেকে সাবাড় করে ফেলেছে?

৬. বিস্ময়সূচক চিহ্ন [!]

আনন্দ, বিষাদ, দুঃখ, ভয়, ঘৃণা বুঝাতে বাক্যের শেষে বিস্ময়সূচক চিহ্ন বসে।

(ক) ও! মরি! মরি! কি সুন্দর দৃশ্য!

(খ) হায়! আমার দুঃখ ভরা কপাল।

৭. ড্যাস [-]

দুটি বাক্যের মধ্যে সংযোগ ও গতি সঞ্চারে [-] ব্যবহৃত হয়। যেমন -

(ক) "চল তোকে ফেলে রেখে আসি - কাপুরুষ।

(খ) লোকটির চারটি ছেলে - সবগুলো গুণধর, কেউ লেখাপড়া করে না।

উদাহরণ দিতে গিয়ে ড্যাশ চিহ্ন ব্যবহার হয়। যেমন- সমাস ছয় প্রকার- দ্বন্দ্ব, কর্মধারয়, তৎপুরুষ, বহুব্রীহি, দ্বিগু ও অব্যয়ীভাব।

৮. লোপ চিহ্ন [']

শব্দ বা পদের মধ্যস্থ কোন অক্ষর লোপ পেলে লোপচিহ্ন বসে। যেমন-

(ক) যাব 'খন

(খ) দু'বেলা ভাতই জোটেনা।

(গ) রামে'র ভাই লক্ষণ।

৯. উদ্ধৃতি চিহ্ন [" "]

বক্তার বক্তব্য তুলে ধরতে হলে উদ্ধৃতি চিহ্নের ব্যবহার হয়। যেমন-

(ক) ভাগিনা বলিল, "মহারাজ পাখিটার শিক্ষা পুরা হইয়াছে।"

(খ) অন্য রচনা থেকে উদ্ধৃত করতে চাইলে-

"যাহা পাই তাহা ভুল করে চাই" – রবীন্দ্রনাথ

১০. হাইফেন [-]

দুই বা তার চেয়ে বেশি পদের মধ্যে সংযোগ বা সমাস বোঝাতে হাইফেন [–] ব্যবহৃত হয়। যেমন-

(ক) ঘরে-ঘরে জ্বর-জ্বালাতন লেগেই আছে।

(খ) কত নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, বন-বনানী দেখেছি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সত্য/মিথ্যা নির্ণয় করুন-

ক. কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে বাক্যের শেষে দাঁড়ি বসে।

খ. বাংলা ভাষায় বিস্ময়বোধক চিহ্নের ব্যবহার নেই।

গ. বাক্যে গতি সঞ্চারের জন্য ড্যাশ ব্যবহৃত হয়।

ঘ. অন্যের রচনা উদ্ধৃত করলে উদ্ধৃতি চিহ্ন ব্যবহার করা বিধেয়।

ঙ. প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা বোঝালে শেষে জিজ্ঞাসা বোধক (?) চিহ্ন বসে।

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

উত্তর : ক. মিথ্যা খ. মিথ্যা গ. সত্য ঘ. সত্য ঙ. সত্য

২। বিরাম চিহ্নের ব্যবহার করুন।

ক. আমরা তিন বাল্যসঙ্গী যে ঘরে শয়ন করিতাম তাহার পাশের ঘরের দেয়ালে একটি আস্ত নরকঙ্কাল ঝুলানো থাকিত রাত্রে বাতাসে তাহার হাড়গুলো খটখট শব্দ করিয়া পড়িত দিনের বেলায় আমাদিগকে সেই হাড় পাড়িতে হইত।

খ. যে ভাবে বড় ছেলেটা ছোঁ মারিয়া শ্লেট লইয়া গেল এবং যেভাবে বিপন্ন মুখে সামনের ছেলে দুটি পায়ে পায়ে গুরু মশায়ের কাছে যাইতেছিল তাহাতে হঠাৎ অপুর বড় হাসি পাইল সে ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল পরে খানিকটা হাসি চাপিয়া রাখিয়া আবার ফিক ফিক করিয়া হাসিয়া উঠিল।

পাঠের সাহায্য নিয়ে উত্তরগুলো নিজে নিজে লিখুন।

ভাব-সম্প্রসারণ
ও
সারাংশ

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

১. অন্তর্নিহিত ভাবকে সম্প্রসারিত করতে পারবেন।

২. যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে গভীর ও গূঢ় ভাবকে বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

৩. মূল বক্তব্য ও মর্মকথাকে নিজের ভাষায় বিস্তারিতভাবে লিখতে পারবেন।

ক্ষুদ্রাকারে রচিত কোন ভাবের গূঢ় অর্থ বোঝানোর জন্যে বিস্তারিতভাবে যে ব্যাখ্যা লেখা হয় তাকে ভাব-সম্প্রসারণ বলে।

অনেক ছোট কথার মধ্যে বড় কথার ভাব লুকিয়ে থাকে। বিশেষ করে কবি-সাহিত্যিকদের গদ্য ও কবিতায় এমন কিছু তাৎপর্যময় গভীর উক্তি থাকে যা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দাবি রাখে। বাক্যের ভেতরের এই ইঙ্গিতময় সূক্ষ্মভাব ও মর্মকথা সহজ-সরল ভাষায় বিস্তৃত আকারে প্রকাশ করার নামই ভাবসম্প্রসারণ।

ভাব-সম্প্রসারণের নিয়ম

১. উদ্ধৃত অংশটি বার বার পড়ে মূল ভাবটি বুঝে নিতে হবে।

২. যুক্তি ও উদাহরণ সহকারে অন্তর্নিহিত ভাবটি বিশদভাবে আলোচনা করতে হবে।

৩. বক্তব্য যাতে মূল ভাব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

৪. এক কথার পুনরাবৃত্তি এবং বক্তব্য যাতে একঘেয়েমিপূর্ণ ও রসহীন না হয় সেদিকে মনোযোগী হতে হবে।

৫. ভাব-সম্প্রসারণের ভাষা হবে সহজ, সরল ও আকর্ষণীয়। মূল ভাব বোঝানোর জন্যে সার্থক দৃষ্টান্ত থাকা দরকার।

৬. মূল অংশ অপেক্ষা ভাবের সম্প্রসারণ দীর্ঘতর হবে।

ভাব-সম্প্রসারণের নমুনা

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড

একটি জাতির উন্নতির পেছনে শিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম। শিক্ষা হল আলোর মতো। আলো যেমন অন্ধকার দূর করে, শিক্ষা তেমনি মনের অন্ধকার ঘুঁচিয়ে মানুষকে আলোকিত করে তোলে। জাতীয় উন্নতির পূর্ব শর্ত হল শিক্ষা। শিক্ষা না পেলে সমাজে কুসংস্কার, অনাচার, ক্লেদ বৃদ্ধি পেয়ে জাতি অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। শিক্ষা-দীক্ষায় অনগ্রসর জাতি কখনও মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। তাই শিক্ষাকে জাতির মেরুদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা যায়। শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে চীনা দার্শনিক

কুয়ানৎসু যে মতামত দিয়েছেন তা প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেন, 'যদি এক বছরের পরিকল্পনায় ফল পেতে চাও শস্য বপন করো, যদি দশকের পরিকল্পনায় ফল পেতে চাও তবে বৃক্ষ রোপণ করো, কিন্তু যদি সমগ্র জীবনের জন্য পরিকল্পনা করে ফল পেতে চাও তবে মানুষের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করো।'

শিক্ষা ব্যতীত ব্যক্তির জীবন কখনও বিকশিত হতে পারে না। ব্যক্তিজীবনে নিরক্ষরতা অভিশাপ। একজন অশিক্ষিত মানুষ সমাজ ও জাতির জন্যে বোঝাস্বরূপ। অশিক্ষা-কুশিক্ষা দেশকে ক্রমাগত অন্ধকারে তলিয়ে দেয়। তাই যে জাতির শিক্ষিতের হার যত বেশি সে জাতি তত উন্নত। আজকের উন্নত বিশ্বের দেশগুলো অশিক্ষার অভিশাপ থেকেই কেবল মুক্তি পায়নি, ধনে-জ্ঞানে-বিজ্ঞানে আজ তারা উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে গেছে। জাতীয় জীবনে শিক্ষা এতটা অপরিহার্য বলেই শিক্ষাকে জাতির মেরুদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মেরুদণ্ড ছাড়া যেমন মানুষ দাঁড়াতে পারে না, তেমনি শিক্ষা ব্যতিরেকে জাতির অস্তিত্ব বিপন্ন ও অন্ধকারময় হয়ে পড়ে।

ভাব-সম্প্রসারণের কতিপয় উদাহরণ

১. নানান দেশের নানা ভাষা
   বিনা স্বদেশী ভাষা, পুরে কি আশা?
২. চরিত্র মানুষের অমূল্য সম্পদ।
৩. সাহিত্য জাতির দর্পণ স্বরূপ।
৪. পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি।
৫. গ্রন্থগত বিদ্যা আর পর হস্তে ধন
   নহে বিদ্যা নহে ধন, হলে প্রয়োজন।
৬. ভোগে নয়, ত্যাগেই মনুষ্যত্বের বিকাশ।
৭. পথের প্রান্তে আমার তীর্থ নয়
   পথের দুধারে আছে মোর দেবালয়।
৮. স্বদেশের উপকারে নাই যার মন
   কে বলে মানুষ তারে? পশু সেই জন।
৯. বই কিনে কেউ দেউলে হয় না।
১০. সাধুতাই সর্বোৎকৃষ্ট নীতি।

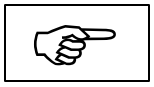

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১

নৈর্বিত্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১. ভাব-সম্প্রসারণে উদ্ধৃত অংশের মূল ভাব
   ক. বজায় থাকবে খ. বজায় থাকবে না
২. ভাব-সম্প্রসারণের ভাষা
   ক. সহজ, সরল হবে খ. সহজ, সরল হবে না
৩. মূল অংশ অপেক্ষা ভাবের সম্প্রসারণ
   ক. দীর্ঘ হবে খ. দীর্ঘ হবে না
৪. ব্যাখ্যা বক্তব্যের মূল ভাব থেকে
   ক. বিচ্ছিন্ন হবে খ. বিচ্ছিন্ন হবে না
৫. ভাব-সম্প্রসারণের ব্যাখ্যায়
   ক. পুনরাবৃত্তি ঘটবে খ. পুনরাবৃত্তি ঘটবে না
৬. বক্তব্যে উপমা, দৃষ্টান্ত
   ক. থাকবে খ. থাকবে না

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার পড়ুন ও নির্দেশ মত কাজ করুন।

উত্তর

১. ক, ২. ক ৩. ক, ৪. খ ৫. খ ৬. ক

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

১. ছোট আকারে বড় ভাব প্রকাশ করতে পারবেন।

২. আবেগবহুল ভাষা বাদ দিয়ে সরাসরি মূল বক্তব্য সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপনের সুযোগ পাবেন।

একটি রচনা নানা কারণে দীর্ঘ হতে পারে। বিষয়ের কারণে সেখানে যুক্ত হতে পারে উদাহরণ, উপমা ও দৃষ্টান্তের বাহুল্য। ঘটনার ঘনঘটাও বিচিত্র নয়।। বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতায় এসব কিছুই হয়ত মানিয়ে যায়। কিন্তু সারাংশ রচনার ক্ষেত্রে এসব বাহুল্য একেবারে পরিতাজ্য। সেখানে অতিরিক্ত অলঙ্কার বাদ দিয়ে সহজ সরল ভাষায় বক্তব্য তুলে ধরতে হবে। মোট কথা, কোনো লেখা ছোট আকারে আকর্ষণীয় ভাষায় প্রকাশ করার নামই সারাংশ বা সারমর্ম। কবিতার ক্ষেত্রে এই সংক্ষিপ্তকরণকে বলা হয় সারমর্ম এবং গদ্যের ক্ষেত্রে একে সারাংশ হিসেবে অভিহিত করা হয়।

কোনো গদ্য বা কবিতা রচনায় যেসব যুক্তি, দৃষ্টান্ত, উপমা ও অলঙ্কার থাকে তা বাদ দিয়ে সহজ ও সরল ভাষায় বিষয়টি সংক্ষেপে প্রকাশ করার নামই সারাংশ বা সারমর্ম।

সারাংশ বা সারমর্ম লেখার নিয়ম

১. নির্ধারিত অংশটি বার বার পড়ে মূল বক্তব্য অনুধাবন করতে হবে।

২. মূল অংশে যেসব অপ্রয়োজনীয় উপমা, অলঙ্কার, দৃষ্টান্ত আছে সারাংশে তা বাদ দিয়ে আসল কথাটা লিখতে হবে।

৩. একই কথার পুনরাবৃত্তি করা যাবে না। তেমনি প্রয়োজনীয় অংশ বাদ দেয়া যাবে না।

৪. সারাংশ খুব ছোট কিংবা বড় হবে না। মূল অংশের চেয়ে তা অবশ্যই আকারে ছোট হবে।

৫. বক্তব্যের বর্ণনায় বিশেষণ, ক্রিয়াপদ, অলঙ্কার, উপমা, রূপক ইত্যাদি অবান্তর। বাহুল্য বাদ দিয়ে মূল বিষয়টি সরাসরি লিখতে হবে।

৬. মূল বিষয়ের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ কোনো বিষয় সারাংশে অবতারণা করা যাবে না। অনুমান নির্ভর কোনো ব্যাখ্যা বাঞ্ছনীয় নয়।

৭. সারমর্ম কিংবা সারাংশ রচনার ভাষা মূলের অনুগামী হওয়া প্রয়োজন। সহজ-সরল মৌলিক ভাষায় বিষয়টি এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে যাতে সবার সহজবোধ্য হয়।

৮. উদ্ধৃত রচনায় একাধিক বিষয় থাকলে তা সংক্ষেপে উল্লেখ করতে হবে এবং মূল বিষয়টি থেকে যাতে রচিত অংশটি সরে না আসে সেদিকে সজাগ থাকতে হবে।

৯. শব্দ ও বাক্য প্রয়োগে সংযম অবলম্বন করতে হবে। একাধিক বিশেষণ প্রয়োগ বাঞ্ছনীয় নয়।

১০.কোনো সাংকেতিক বিষয় থাকলে তার তত্ত্ব বের করতে হবে। ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য থাকলে দুই পক্ষের বক্তব্য আলাদাভাবে প্রকাশ করতে হবে।

সারমর্ম লেখার নমূনা

বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর সবার আমি ছাত্র
নানাভাবে নতুন জিনিস শিখছি দিবারাত্র
এই পৃথিবীর বিরাট খাতায় পাঠ্য যেসব পাতায় পাতায়
শিখছি সেসব কৌতূহলে সন্দেহ নাই মাত্র।

সারমর্ম : বিশ্ব প্রকৃতি নানা বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ এক বিশাল পাঠশালার মতো। এই বিশ্ব প্রকৃতির পাঠশালা থেকে পাঠ গ্রহণ করে একজন মানুষ নিজেকে অতি সহজে সুশিক্ষিত ও পরিপূর্ণ করে গড়ে তুলতে পারে।

সারমর্মের কয়েকটি উদাহরণ

১. আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী পরে
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

২. বহুদিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা,
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুপা ফেলিয়া
একটি ধানের শীষের উপর
একটি শিশির বিন্দু।

৩. বিপদে মোরে রক্ষা করো, এ নহে মোর প্রার্থনা
বিপদে আমি না যেন করি ভয়
দুঃখ তাপে ব্যথিত চিত্তে নাই বা দিলে সান্ত্বনা
দুঃখ যেন করিতে পারি জয়।

সারাংশ লেখার নমুনা

মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ প্রাণী। জগতের অন্যান্য প্রাণীর সহিত মানুষের পার্থক্য- মানুষ বিবেক ও বুদ্ধির অধিকারী। এই বিবেক, বুদ্ধি ও জ্ঞান নাই বলিয়া আর সকল প্রাণী মানুষ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের উৎকর্ষ সাধন করিয়া মানুষ জগতের বুকে অক্ষয়কীর্তি স্থাপন করিয়াছে, জগতের কল্যাণ সাধন করিতেছে, পশুবল ও অর্থবল মানুষকে বড় বা মহৎ করিতে পারে না। মানুষ বড় হয় জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের বিকাশে। জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের প্রকৃত বিকাশে জাতির জীবন উন্নত হয়। প্রকৃত মানুষই জাতীয় জীবনের প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন আনয়নে সক্ষম।

সারাংশ : সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ প্রাণী হিসেবে জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের গুণে মানুষ জগতে যে অমরকীর্তি গড়ে তুলেছে পশুবল ও অর্থবল দিয়ে তা কখনও অর্জন করা সম্ভব নয়।

সারাংশের কয়েকটি উদাহরণ

১. জীবনের কল্যাণের জন্য, মানুষের সুখের জন্য এ জগতে যিনি যত কথা বলিয়া থাকেন– তাহাই সাহিত্য। বাতাসের উপর চিন্তা ও কথা স্থায়ী হইতে পারে না, মানব জাতি তাই অক্ষর আবিষ্কার করিয়াছে। মানুষের মূল্যবান কথা, উৎকৃষ্ট চিন্তাগুলি কোন যুগে পাথরে, কোন যুগে গাছের পাতায় এবং বর্তমান কাগজে লিখিয়া রাখা হইয়া থাকে। যে নিতান্তই হতভাগা, সে-ই সাহিত্যকে অনাদর করিয়া থাকে। সাহিত্যে মানুষের সকল আকাঙ্ক্ষার মীমাংসা হয়। তোমার আত্মা হইতে যেমন তুমি বিচ্ছিন্ন হইতে পার না, সাহিত্যকেও তুমি তেমনি অস্বীকার করিতে পার না– উহাতে তোমার মৃত্যু– তোমার দুঃখ ও সমান হয়।

২. কোন সভ্য জাতিকে অসভ্য করার ইচ্ছা যদি তোমার থাকে তাহলে তাদের সব বই ধ্বংস কর এবং সকল পণ্ডিতকে হত্যা কর, তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। লেখক, সাহিত্যিক ও পণ্ডিতরাই জাতির আত্মা। এই আত্মাকে যারা অবহেলা করে তারা বাঁচে না। দেশকে বা জাতিকে উন্নত করতে ইচ্ছা করলে সাহিত্যের সাহায্যে তা করতে হবে। মানব মঙ্গলের জন্য যত অনুষ্ঠান আছে, তার মধ্যে এটাই প্রধানত সম্পূর্ণ। জাতির ভেতর সাহিত্যের ধারা সৃষ্টি কর, আর কিছুরই আবশ্যক নেই।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্বিত্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১. সারাংশ/সারমর্মে মূলের অপ্রয়োজনীয় দৃষ্টান্ত উপমা -
   ক. থাকবে খ. থাকবে না
২. একই কথার পুনরাবৃত্তি -
   ক. হবে খ. হবে না
৩. সারাংশ মূলের চেয়ে -
   ক. বড় হবে খ. ছোট হবে
৪. সারাংশের ভাষা মূল রচনার -
   ক. অনুগামী হবে খ. হবে না
৫. বক্তব্যে একাধিক বিশেষণ -
   ক. বাঞ্ছনীয় খ. বাঞ্ছনীয় নয়
৬. সাংকেতিক বা রূপক ভাষা থাকলে তার তত্ত্ব -
   ক. উন্মোচিত করতে হবে খ. উন্মোচিত করতে হবে না
৭. শব্দ ও বাক্য প্রয়োগে সংযমী -
   ক. হতে হবে খ. হবে না

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

উত্তর

১. খ ২. খ ৩. খ ৪. ক ৫. খ ৬. ক ৭. ক

পত্র লিখন

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

* পত্র লেখার গুরুত্ব ও নিয়মকানুন সম্পর্কে জানতে পারবেন।
* পত্রের বিষয়বস্তুর বিভিন্নতা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

নানা প্রয়োজনে আমাদের পত্র লিখতে হয়। পত্রের মাধ্যমে সাধারণত মনের ভাবের আদান-প্রদান ঘটে। তবে এটা লেখার কিছু বিশেষ রীতি আছে। এর বিষয়বস্তুও বহু ধরনের। মূলত ব্যক্তিগত, সাময়িক ও ব্যবহারিক- এই তিন পর্যায়ে চিঠিপত্রকে ভাগ করা যায়। পত্রাদি মারফত লেখকের শিক্ষা-দীক্ষা ও রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। ব্যক্তিগত পত্রাদি সাধারণত আত্মীয়স্বজন ও পরিচিত জনদের উদ্দেশ্যে লেখা হয়ে থাকে। ব্যবহারিক পত্রাদি সাধারণত আবেদন-নিবেদন, অভাব-অভিযোগ, চাকরি-বাকরি ও ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদি কেন্দ্র করে রচিত হয়। কারও শুভাগমন ও বিদায় উপলক্ষে যে অভিনন্দন পত্র ও মানপত্র রচিত হয় তাও পত্রের মর্যাদা পায়। এছাড়া বিভিন্ন সমস্যাদি প্রকাশের জন্যও পত্র লেখা হয়।

কোনো ব্যক্তির কাছে মনের ভাব প্রকাশ করে কোনো বিষয় নিয়ে লেখাকেই পত্র লিখন বলে।

পত্র লেখার ক্ষেত্রে যে বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে

ক. পত্রের ভাষা হবে সহজ-সরল।

খ. কঠিন ভাষারীতি পরিত্যাগ করা উচিত।

গ. বিষয় অনুযায়ী পত্রের প্রচলিত নিয়ম রীতি মানা দরকার।

৪. হাতের লেখা পরিষ্কার ও স্পষ্ট হওয়া উচিত।

৫. যথাস্থানে নাম, ঠিকানা লিখতে হবে।

যে সব বিষয় পত্রে অন্তর্ভুক্ত থাকবে

ক. পত্র লেখার স্থান।

খ. পত্র প্রেরণের তারিখ।

গ. সম্বোধন।

ঘ. পত্রের বক্তব্য বিষয়।

ঙ. পত্র লেখকের নাম ও স্বাক্ষর।

চ. খামের ওপর প্রাপকের নাম ও ঠিকানা।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

* ব্যক্তিগত পত্র কি সে বিষয়ে জানতে পারবেন।
* ব্যক্তিগত পত্র লেখার নিয়মকানুন জানতে পারবেন।

ব্যক্তিগতপত্র

একান্ত ব্যক্তিগত কিংবা পারিবারিক বিষয়াদি নিয়ে যে পত্র লেখা হয় তাকে ব্যক্তিগত পত্র বলে। বিষয়বস্তু অনুযায়ী এই পত্রের আকার ছোট বড় হতে পারে।

ব্যক্তিগতপত্রের নিয়ম

১. পত্রের ডানদিকের শীর্ষে পত্র প্রেরণের স্থান ও তারিখ লিখতে হবে।

২. পত্রের বাঁ-দিকে একটু নিচুতে প্রাপকের বয়স ও মর্যাদানুযায়ী সম্বোধনসূচক শব্দ যেমন- মান্যবরেষু, স্নেহাস্পদেষু, প্রীতিভাজনেষু, পাক জনাবেষু, কল্যাণীয়াসু, কিংবা প্রাপকের নাম, যথা- প্রিয় কামাল অথবা শুধু কামাল লেখা যেতে পারে।

৩. চিঠির গুরুত্ব এবং বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মূল বক্তব্য লিখতে হবে। এটাই চিঠির গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

৪. চিঠির শেষে পত্র প্রেরকের নাম কিংবা স্বাক্ষর থাকবে। অপরিচিত কিংবা স্বল্প পরিচিত হলে পুরো নাম লেখা বাঞ্ছনীয়।

৫. খামের ওপর ডানদিকে প্রাপকের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট অক্ষরে লিখতে হবে। প্রেরকের নাম ও ঠিকানা থাকবে খামের বাঁ-দিকে।

ব্যক্তিগত পত্রের নমুনা

সুন্দরবন গমন উপলক্ষে ভ্রমণসঙ্গী হবার অনুরোধ জানিয়ে বন্ধুকে একটি পত্র লেখ।

খিলগাঁও
০২/০৪/২০১২

প্রিয় শোয়েব,

প্রীতি নিও। তোমার চিঠি পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। পরীক্ষা শেষে এবারের দীর্ঘ ছুটিটা কিভাবে কাটাবো তুমি জানতে চেয়েছ। তুমি জেনে খুশি হবে যে, এ মাসের ২৫ তারিখ আমরা সুন্দরবন বেড়াতে যাব বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এর আগে আমরা কখনও সুন্দরবন যাইনি। মামার মুখে অনেক গল্প শুনেছি সুন্দরবন সম্পর্কে। বাঘ, হরিণ, বানর, কুমির, সাপ কত কি জীবজন্তু আছে সেখানে। সব শুনে আমার তো বুক ঢিব ঢিব করছে। তবে বাবা-মাও সঙ্গে যাচ্ছেন এই যা রক্ষে। খুলনা থেকে লঞ্চ নিয়ে আমরা যাব। মামা বলেছেন নীলকমল, দুবলা ঘুরিয়ে আনবেন। দুবলায় অনেক মাছ পাওয়া যায়। খুব বড় রাসমেলা হয় সেখানে, শোনো নি?

আমার খুব ইচ্ছে তুমিও আমাদের সঙ্গে যাবে। তুমি এলে দুজনে মিলে বই, ক্যামেরা, দূরবীন, গিটার, রেকর্ডার, ক্যাসেট, ছবি আঁকার সরঞ্জাম সব গুছিয়ে নেব। তুমি যথাসময়ে অবশ্যই ঢাকা পৌঁছবে। এ ব্যাপারে তোমার মতামত দ্রুত জানা দরকার।

আমরা সবাই ভালো আছি। সাক্ষাতে বিস্তারিত কথা হবে। আজ এখানে শেষ করছি।

ইতি
প্রীতিমুগ্ধ

রাজন

ডাক টিকেট

প্রেরক	**প্রাপক**
রাজন	সোহেল মাহমুদ
খিলগাঁও	কলেজ রোড,
ঢাকা	রংপুর।

ব্যক্তিগত পত্রের কয়েকটি উদাহরণ

১. একুশের বই মেলা সম্পর্কে বন্ধুকে একটি পত্র লেখ।

২. তোমার দেখা একটি কৃষি প্রদর্শনীর বিবরণ দিয়ে বন্ধুকে একটি পত্র লেখ।

৩. তোমার পরীক্ষা কেমন হচ্ছে তা জানিয়ে মায়ের কাছে একখানা পত্র লেখ।

৪. বিজ্ঞান পড়ার উৎসাহ দিয়ে তোমার ছোট ভাইকে একটি চিঠি লেখ।

৫. তোমার জীবনের লক্ষ্য কি তা জানিয়ে বাবার কাছে একটি চিঠি লেখ।

৬. এবারে পয়লা বৈশাখ কেমন উদ্‌যাপন করলে তা জানিয়ে প্রবাসী বন্ধুকে একখানা পত্র লেখ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১ + ২

নৈর্বিত্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. কারও শুভাগমন উপলক্ষে কোন পত্র লেখা হয়?

ক. ব্যক্তিগত পত্র　　খ. আবেদনপত্র

গ. সামাজিক পত্র　　ঘ. মানপত্র

২. বন্ধুকে কি ধরনের পত্র লেখা হয়?

ক. ব্যবহারিক পত্র　　খ. মানপত্র

গ. ব্যক্তিগত পত্র　　ঘ. বাণিজ্যিক পত্র

৩. যে স্থান থেকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে তার উল্লেখ থাকবে-

ক. পত্রের মধ্য অংশে　　খ. পত্রের সম্বোধনে

গ. পত্রের ওপরে ডান কোন　　ঘ. পত্রের সবশেষে

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

উত্তর

১. ঘ　　২. গ　　৩. গ

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

১. দরখাস্ত কি সে বিষয়ে জানতে পারবেন।

২. দরখাস্ত লেখার নিয়ম সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাবেন।

দরখাস্ত

কোনো প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন-নিবেদন করে মূলত দরখাস্ত লেখা হয়ে থাকে। বিভিন্ন পেশার ব্যক্তিবর্গ স্ব স্ব কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি-দাওয়া, ছুটি-ছাটা ও চাকরি-বাকরি নিয়ে দরখাস্ত লিখতে পারেন। দরখাস্তের ভাষায় শিষ্টতা ও সৌজন্য প্রকাশ বাঞ্ছনীয়।

নানা কারণে আবেদন জানিয়ে যে পত্র লেখা হয় তাকেই দরখাস্ত বলে।

দরখাস্ত লেখার নিয়ম

১. দরখাস্তের উপরে বামদিকে তারিখ লিখতে হবে।

২. দরখাস্তের শুরুতে প্রাপকের পদ-মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা লিখতে হবে।

৩. বক্তব্যের বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করতে হবে।

৪. পরে সম্ভাষণ যেমন- জনাব, মহোদয় ...।

৫. সৌজন্য প্রকাশসহ প্রার্থিত বিষয়ে বর্ণনা, সমর্থনে যুক্তি।

৬. পরবর্তী অংশে প্রার্থনা মঞ্জুরের জন্যে আবেদন।

৭. সবশেষে শিষ্টতার সঙ্গে প্রেরকের স্বাক্ষরসহ নাম। যেমন আপনার অনুগত, একান্ত বিশ্বস্ত ইত্যাদি।

৮. নামের বাঁ দিকে যেখানে পত্র লেখা শেষ হয়েছে সেইস্থানের নাম লিখতে হবে।

৯. খামের উপর ডানদিকে প্রাপকের নাম ও ঠিকানা এবং পেছন দিকে প্রেরকের নামসহ ঠিকানা লিখতে হবে।

দরখাস্তের নমুনা

বিদ্যালয়ে অনুপস্থিতির জন্যে ছুটির আবেদনপত্র।

তারিখ : ০৪ মার্চ, ২০১২

বরাবর
প্রধান শিক্ষক
মতিঝিল মডেল হাই স্কুল
ঢাকা।

বিষয় : ছুটির আবেদন।

মহোদয়,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমি আকস্মিকভাবে জ্বরে আক্রান্ত হওয়ায় গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হতে পারিনি।

এমতাবস্থায় আমাকে উপর্যুক্ত দিনের ছুটি মঞ্জুর করলে বাধিত হবো।

বিনীত

আপনার অনুগত ছাত্র

রাজন সামি

দশম শ্রেণী

বাণিজ্য ক্রমিক নং ৭

দরখাস্তের কয়েকটি উদাহরণ

১. প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক পদে নিয়োগের আবেদনপত্র লিখুন।

২. বাড়িতে নতুন বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য অনুরোধ জানিয়ে একটি পত্র রচনা করুন।

৩. গ্রামে পাঠাগার প্রতিষ্ঠার জন্য জেলা প্রশাসকের কাছে একটি আবেদনপত্র লিখুন।

৪. ন্যায্য মূল্যে সার সরবরাহের অনুরোধ জানিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে একটি আবেদনপত্র রচনা করুন।

৫. বিনা বেতনে পড়ার অনুমতি চেয়ে প্রধান শিক্ষকের কাছে একটি আবেদন পত্র লিখুন।

৬. ক্রিকেট ফাইনাল ম্যাচ দেখা উপলক্ষ্যে ছুটির জন্য আবেদন করুন।

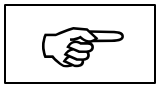

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্বিত্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১. দরখাস্তে সংক্ষেপে পত্রের বিষয় উল্লেখ

ক. থাকবে　　খ. থাকবে না

২. দরখাস্তের শুরুতে প্রাপকের পদমর্যাদা ও ঠিকানা -

ক. থাকা দরকার　　খ. দরকার নেই

৩. স্নেহের সম্ভাষণ দিয়ে দরখাস্ত

ক. শুরু হবে　　খ. শুরু হবে না

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

উত্তর

১. ক　২. ক　৩. খ

পাঠ ৪

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

১. মানপত্র কি সে সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

২. মানপত্র কি করে লিখতে হয় তা জানতে পারবেন।

মানপত্র

কাউকে সংবর্ধনা দানের জন্যে প্রশংসাসূচক অভিনন্দনপত্র বা মানপত্র দেয়া হয়। মানপত্রে ব্যক্তির গুণাবলী ও প্রশংসা স্থান পায়। দেশ-বিদেশ থেকে উচ্চতর সম্মান, আন্তর্জাতিক খ্যাতি অথবা নিজের এলাকায় বিশেষ কৃতিত্ব অর্জনের জন্যে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মান জানাতে মানপত্র প্রদান করা হয়। মানপত্র সংবর্ধনা সভায় পাঠ করা হয় এবং অভিনন্দিত ব্যক্তিকে তা আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়।

আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদত্ত সম্মানপত্রকে মানপত্র বা অভিনন্দনপত্র বলা হয়।

মানপত্র লেখার নিয়ম

১. মানপত্রের ভাষা শিল্পসম্মত হওয়া দরকার।

২. অভিনন্দিত ব্যক্তির গুণাবলী ও মহত্ত্ব নানান বিশেষণে প্রতিফলিত হয় মানপত্রের ভাষায়।

৩. মানপত্রে আপনি বা তুমি দুধরনের সম্বোধন থাকতে পারে।

৪. অভিনন্দিত ব্যক্তির নাম ও পরিচিতি দিয়ে মানপত্র শুরু করতে হয়। যেমন- মল্লিকের বড় হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক জনাব মুরাদ মাহমুদের বিদায় উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি বা দুটি কথা।

৫. নতুন সম্বোধন করে এক একটি অনুচ্ছেদ লেখা হয়। যেমন- হে কৃতী সন্তান, হে দরদী প্রভৃতি।

৬. সবশেষে থাকবে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাদের নাম ও পরিচয়।

৭. এরই বাঁয়ে বসবে স্থানের নাম ও তারিখ।

মানপত্রের নমুনা

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিদায় উপলক্ষে একটি মানপত্র রচনা কর।

মল্লিকেরবেড় হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক জনাব মুরাদ মাহমুদের বিদায় উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি

হে বিদায়ী সুহৃদ,

দীর্ঘদিন আমাদের সঙ্গে সুখে-দুঃখে কাটিয়ে অকস্মাৎ তুমি এমনিভাবে চলে যাবে তা কখনও ভাবতে পারিনি। উচ্চতর দায়িত্ব পালনে তুমি আরো বড় কর্মক্ষেত্রে যাচ্ছো এটা জেনেও আজ আমাদের হৃদয় সত্যি ব্যথিত। বিদায় বেলা তোমার এই বেদনার সঙ্গে আমাদের হৃদয়ও বেদনায় অভিভূত। অজস্র স্মৃতির ভিড়ে আজ সেই বেদনা প্রকাশের ভাষাও যেন হারিয়ে গেছে। তুমি আমাদের বেদনাহত হৃদয়ের শ্রদ্ধার্ঘ্য গ্রহণ কর।

হে শিক্ষা গুরু,

একজন ন্যায়পরায়ণ আদর্শবান মহৎ শিক্ষকের মতো তুমি নিরলসভাবে শিক্ষার আলো জ্বালিয়েছ আমাদের মাঝে। তোমার আলোক-শিক্ষা অন্তরে জ্বেলে অনেকেই আজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সমাজ জীবনে। শিক্ষা বিস্তারে তোমার এই নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, শ্রম আজ প্রবাদের মতো ছড়িয়ে আছে এ অঞ্চলের আনাচে কানাচে। মহান শিক্ষাগুরু জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের মতো তোমার এই বিপুল কর্মপ্রেরণা চিরদিন আমাদের প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

হে কর্মবীর,

শুধু লেখাপড়া নয়, সত্য ও সুন্দরের সাধনায় জীবনের প্রতিটা ধাপে একজন শিক্ষার্থী যাতে সাফল্য অর্জন করতে পারে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি ছিল তোমার। তাই পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলা, বিতর্ক, পাঠাগার, স্কাউটিং ও সাংস্কৃতিক চর্চার বিকাশে তুমি রেখেছিলে অগ্রণী ভূমিকা। এই বিদ্যালয়ের আজকের সমৃদ্ধি ও সমুন্নত ঐতিহ্য তোমার নেতৃত্বের ফসল। ত্যাগ, অধ্যবসায় ও কর্মনিষ্ঠার যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তুমি স্থাপন করেছ তা চিরদিন অনুপ্রেরণা জোগাবে। তোমার বৈদগ্ধ সহজ-সরল ব্যবহার, নিয়মানুবর্তিতা, সার্থক শিক্ষা পদ্ধতি আমাদের হৃদয়ে অমলিন স্মৃতি হয়ে থাকবে।

হে বন্ধু,

আনুষ্ঠনিকভাবে তোমাকে বিদায় দিলেও আমাদের মনের মণিকোঠায় তুমি চির অম্লান। তোমার পথ নির্দেশনা হবে আমাদের জীবন পথের পাথেয়। আগামী দিনগুলোতে তোমার অকৃত্রিম স্নেহাশিস থেকে যেন তোমার এই বিদ্যাপীঠের ছাত্র-ছাত্রীরা কখনও বঞ্চিত না হয়। আমাদের আচরণে কখনও তোমার মনে ক্ষোভের কারণ ঘটলে আজ বিদায় বেলা তার মার্জনা চাইছি।

সবশেষে তোমার সুস্থ কর্মময় জীবন কামনা করি। শুভ হোক তোমার আগামী দিনের যাত্রাপথ।

তোমার স্নেহধন্য

মল্লিকেরবেড় হাই স্কুলের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ

মানপত্রের কয়েকটি উদাহরণ

১. বিদায়ী ছাত্রছাত্রীদের বিদায় উপলক্ষে মানপত্র।

২. নবাগত ছাত্রদের সংবর্ধনা জানিয়ে মানপত্র।

৩. নতুন প্রধান শিক্ষকের আগমন উপলক্ষে মানপত্র।

৪. তোমার বিদ্যালয়ে একজন খ্যাতনামা কবির আগমন উপলক্ষে একখানা মানপত্র রচনা কর।

৫. টুর্নামেন্ট বিজয়ী ক্রিকেট ক্লাবকে সংবর্ধনা জানিয়ে মানপত্র।

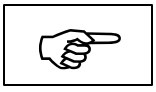

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৪

নৈর্বিত্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১. আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদত্ত সম্মানপত্রকে কি বলে?

ক. ব্যক্তিগতপত্র　　খ. মানপত্র

গ. আবেদনপত্র　　ঘ. নিমন্ত্রণপত্র

২. মানপত্রে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির কোন বিষয়টি প্রকাশ করতে হবে?

ক. দোষ, ত্রুটি　　খ. ব্যর্থতায় ফিরিস্তি

গ. গুণাবলী ও মহত্ত্ব　　ঘ. বিদ্রুপ ও কটাক্ষ

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

উত্তর

১. খ　　২. গ

পাঠ ৫

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

১. সংবাদপত্রে প্রকাশের পত্র কি রকম হবে সে বিষয়ে জানতে পারবেন।

২. সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য সংশ্লিষ্ট পত্র কিভাবে লিখতে হয় সে সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্যে পত্র

সংবাদপত্রে চিঠিপত্র কলামে ব্যক্তিগত কিংবা সমষ্টিগত সমস্যা নিয়ে পত্র লেখা যায়। এই চিঠির দায়দায়িত্ব সম্পূর্ণ পত্র লেখকের। এতে পত্রিকা কর্তৃপক্ষকে কোন দায়িত্ব বহন করতে হয় না। চিঠিতে লেখকের নাম ও ঠিকানা উল্লেখ থাকে। পত্র লেখক নাম গোপন রাখতে ইচ্ছুক হলে সম্পাদককে জানাতে হয়। নাম ও ঠিকানাবিহীন চিঠি সাধারণত প্রকাশের রেওয়াজ নেই।

সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্যে পত্রের নিয়ম

১. এ ধরনের পত্রে দুটি অংশ থাকে।

২. একটি অংশ সম্পাদকের কাছে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকাশের অনুরোধ জানিয়ে লেখা।

৩. দ্বিতীয় অংশে শিরোনামসহ মূল ঘটনার বিবরণ থাকবে।

৪. পত্রের ভাষা সহজ-সরল ও সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

পত্রের নমুনা

মশার উপদ্রব নিবারণের জন্যে কর্তৃপক্ষের সহায়তা কামনা করে সংবাদপত্রে প্রকাশার্থে একখানা পত্র রচনা কর।

তারিখ : ২০/০৩/২০১২ ইং

সম্পাদক,
দৈনিক ইত্তেফাক
১, নং রামকৃষ্ণ মিশন রোড, ঢাকা।

বিষয় ঃ সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য পত্র।

মহোদয়,

আপনার পত্রিকায় চিঠিপত্র কলামে মশার উপদ্রব সংক্রান্ত পত্রটি ছাপানোর বিনীত অনুরোধ করছি।

নিবেদন

রাজ সামি
১৬৪ উত্তর গোড়ান
ঢাকা ১২১৯

মশার উপদ্রবে জনজীবন অতিষ্ঠ

রাজধানীর গোড়ান, সিপাইবাগ ও খিলগাঁও এলাকায় মশার উপদ্রবে জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। সন্ধ্যা নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে পঙ্গপালের মতো মশার হামলা শুরু হয়। এতে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায় খুবই বিঘ্ন ঘটছে। বিশেষ করে পরিক্ষার্থীরা রাত জেগে লেখাপড়া করতে পারছে না।

দুঃখের বিষয় মশার অত্যাচার সহ্যসীমার বাইরে চলে গেলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কোনো তৎপরতা নেই। এ ব্যাপারে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্যে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

এলাকাবাসীর পক্ষে

রাজন সামি
১৬৪ উত্তর গোড়ান
ঢাকা-১২১৯

উদাহরণ

১. তোমার এলাকায় পানীয় জলের অভাবের কথা জানিয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশের জন্যে একটি পত্র লেখ।

২. ডাকঘর স্থাপনের জন্যে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে পত্রিকায় প্রকাশের জন্যে একটি পত্র লেখ।

৩. শিক্ষাঙ্গন সন্ত্রাসমুক্ত করার সপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্যে একখানি পত্র রচনা কর।

৪. তোমার এলাকায় যানবাহন সমস্যার কথা জানিয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্যে পত্র লেখ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৫

নৈর্বিত্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১. সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্যে পত্রের অংশ থাকে?

ক. একটি　　খ. দুইটি

গ. তিনটি　　ঘ. চারটি

২. এই ধনের পত্রের ভাষা হবে -

ক. কঠিন　　খ. অলঙ্কার বহুল

গ. সহজ-সরল　　ঘ. কাব্যময়

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

উত্তর

১. খ.　২. গ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১. তুমি সম্প্রতি পড়েছ এরকম একটি বই সম্পর্কে তোমার মতামত জানিয়ে বন্ধুকে পত্র লেখ।

২. কক্সবাজার ভ্রমণের অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়ে তোমার বন্ধুকে একটি পত্র লেখ।

৩. তোমার এলাকায় একটি পাঠাগার প্রতিষ্ঠার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বন্ধুকে একটি পত্র রচনা কর।

৪. বিদ্যালয়ে শিক্ষক পদের জন্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে একটি দরখাস্ত লেখ।

৫. বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ দেয়ার জন্যে প্রধান শিক্ষকের কাছে আবেদনপত্র লেখ।

৬. তোমার বিদ্যালয়ে একজন খ্যাতনামা বিজ্ঞানীকে সংবর্ধনা জানানোর জন্যে একখানা মানপত্র রচনা কর।

৭. তোমার বিদ্যালয়ে শিক্ষা বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার আগমন উপলক্ষে একটি মানপত্র রচনা কর।

৮. সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহারের যুক্তি দেখিয়ে দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশের জন্যে একটি পত্র লেখ।

চূড়ান্ত মূল্যায়নের উত্তরগুলো পাঠের সাহায্য নিয়ে নিজে নিজে লিখুন।

প্রবন্ধ রচনা

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

১. প্রবন্ধ রচনা ও তার শ্রেণী সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাবেন।

২. নিজ বক্তব্য সুশৃঙ্খল ও বিস্তৃতভাবে লিখতে পারবেন।

৩. মর্মার্থ ও বিষয়বস্তু অনুযায়ী প্রবন্ধ রচনার কৌশল নির্ণয় করতে পারবেন।

প্রবন্ধ সাহিত্যের অন্যতম শাখা। কল্পনা ও বুদ্ধিবৃত্তির ওপর ভিত্তি করে লেখক কোনো বিষয় সম্বন্ধে সচেতনভাবে যে নাতিদীর্ঘ সাহিত্য সৃষ্টি করেন তাকেই প্রবন্ধ বলে।

'প্রবন্ধ' শব্দটি এসেছে সংস্কৃত ভাষা থেকে। এর উৎপত্তিগত অর্থ প্রকৃষ্ট বন্ধন। বর্তমানে কেবল গদ্যে রচিত ভাব, কল্পনা আর তথ্য সমৃদ্ধ মননশীল রচনাকেই প্রবন্ধ বলা হয়ে থাকে। প্রবন্ধ রচনার মধ্যে লেখকের ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাস আর লাগামহীন চিন্তার কোনো সুযোগ নেই। উচ্চারণ, ভাব ও ভাষা- এই তিনটিই প্রবন্ধের প্রাণ। প্রত্যেক প্রবন্ধে কিছু প্রতিপাদ্য বিষয় থাকে। যথার্থ তথ্য প্রমাণ, যুক্তি, নিরাবেগ ভাষা আর সংযত চিন্তার প্রয়োগে সেই প্রতিপাদ্য বিষয়কে রূপায়ণ করাই প্রবন্ধের লক্ষ্য।

যে কোনো বিষয় নিয়ে বিস্তৃত অথচ পরিমিত আলোচনা অপূর্ব রচনাশৈলী আর ভাষাগত দক্ষতার নিপুণভাবে বর্ণনা করাই হল প্রবন্ধ।

প্রবন্ধের শ্রেণীবিভাগ

প্রবন্ধকে প্রধানত দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন-

১. তন্ময় বা বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ।

২. মন্ময় বা ব্যক্তিগত প্রবন্ধ।

যে প্রবন্ধে বিষয়বস্তুর প্রাধান্য থাকে তাকে বস্তুনিষ্ঠ বা তন্ময় প্রবন্ধ বলে। লেখকের পাণ্ডিত্য, জ্ঞানের গভীরতা ও অনন্যসাধারণ চিন্তাশীলতা এ জাতীয় প্রবন্ধে প্রকাশ পায়। মূলত বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধই প্রবন্ধ নামে পরিচিত। অপরদিকে লেখক ব্যক্তিগত প্রবন্ধে হাস্যরস ও আনন্দ উচ্ছ্বাসের মাধ্যমে পাঠকের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান।

বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধকে কয়েকটি উপবিভাগে ভাগ করা যায় :

১. বিবৃতিমূলক প্রবন্ধ (কাহিনীর বিবরণ বিস্তৃত থাকে)।

২. ব্যাখ্যামূলক (মত ও তত্ত্ব আলোচনা এই প্রবন্ধের আসল উদ্দেশ্য)।

৩. বর্ণনামূলক (বিষয়বস্তুর বর্ণনা পুঙ্খানুপুঙ্খ হয়ে থাকে)।

৪. বিতর্কমূলক (মতবাদের বিশ্লেষণ এবং পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি)।

৫. চিন্তামূলক (বিশেষ দৃষ্টিকোন থেকে বিষয়ের পরিচিতি নির্ণয়)।

৬. তথ্যমূলক (বিবিধ তথ্যের মাধ্যমে রচিত প্রবন্ধ)।

৭. নীতি কথামূলক (প্রচলিত নীতিকথা এতে স্থান পায়)।

প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে অনুসরণীয়

১. মূল বক্তব্য স্থির করে উপকরণ, তথ্যাদি ও সংকেতসূত্র প্রস্তুত।

২. প্রবন্ধের তিনটি অংশ। সূচনায় বিষয়বস্তুর আভাস, মূল বক্তব্যে পক্ষে ও বিপক্ষে মতামত এবং উপসংহারে থাকবে সিদ্ধান্ত।

৩. এক একটি ভাব অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সন্নিবেশিত করে সহজ, সরল ভাষায় সংক্ষেপে প্রকাশ করতে হবে। প্রতিটি অনুচ্ছেদে একটা শিরোনাম থাকবে।

৪. অনুচ্ছেদগুলোর মধ্যে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্য পরিত্যাগ করতে হবে।

৫. রচনার শুরুতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদগুলো লিখতে হবে।

৬. বিষয়ওয়ারি যুক্তি ও তথ্যের প্রতিফলন ঘটাতে হবে। পরস্পর বিরোধী যুক্তি ও ভাব রচনায় স্থান পাবে না।

৭. সাধু ও চলিত ভাষায় মিশ্রণ পরিত্যাগ করতে হবে। কঠিন, দুর্বোধ্য শব্দ, দীর্ঘ ও সমাসযুক্ত পদ এড়িয়ে যাওয়া বাঞ্ছনীয়।

৮. প্রবন্ধ খুব বেশি বড় বা ছোট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বক্তব্য পূর্ণতার দিকে এগিয়ে নেয়া দরকার।

বৈশিষ্ট্য

প্রবন্ধের চারটি বৈশিষ্ট্য : সংক্ষিপ্ত বক্তব্য, গঠনভঙ্গির ঐক্য, চিন্তার স্বচ্ছতা ও বক্তব্যের যথাযথ বিন্যাস যাতে রচনায় বহাল থাকে তা লক্ষ্য রাখতে হবে।

প্রবন্ধের নমুনা

১. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস;

২. বাংলা নববর্ষ;

৩. সময়ের মূল্য;

৪. আমার প্রিয় কবি;

৫. বাংলাদেশের পাখি;

৬. এসো দেশ গড়ি;

৭. বৃক্ষরোপন অভিযান;

৮. তোমার প্রিয় উপন্যাস;

৯. বই মেলা;

১০.পরিবেশ দূষণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. নৈর্বিত্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১. ‘প্রবন্ধ’ শব্দের উৎপত্তি -
ক. বাংলা থেকে   খ. সংস্কৃত থেকে

২. বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ হবে -
ক. পাণ্ডিত্যপূর্ণ   খ. হালকা মেজাজের

৩. ব্যক্তিগত প্রবন্ধের অপর নাম
ক. তন্ময় প্রবন্ধ   খ. মন্ময় প্রবন্ধ

৪. বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ কয়টি উপবিভাগে ভাগ করা যায়
ক. চারটি   খ. তিনটি
গ. সাতটি   ঘ. আটটি

৫. প্রবন্ধের কলেবর হবে -
ক. খুব বড়   খ. খুব
গ. মাঝামাঝি   ঘ. খুব বড়ও না খুব ছোটও না

৬. প্রবন্ধের ভাষা -
ক. বিষয়ের অনুসারী হবে   খ. বিষয়ের অনুসারী হবে না

৭. প্রবন্ধের মোট অংশ -
ক. দশটি   খ. আটটি
গ. তিনটি   ঘ. ছয়টি

৮. গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদগুলো লিখতে হবে -
ক. প্রথম দিকে   খ. শেষ দিকে

৯. প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য কয়টি -
ক. আটটি   খ. চারটি
গ. নয়টি   ঘ. দশটি

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

উত্তর

১. খ   ২. ক   ৩. খ   ৪. গ   ৫. ঘ   ৬. ক   ৭. গ   ৮. ক   ৯. খ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. প্রবন্ধ কাকে বলে? প্রবন্ধে ভাব ও ভাষার ভূমিকা কী?
২. বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ কাকে বলে? বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধকে কয়টি উপবিভাগে ভাগ করা যায়?
৩. প্রবন্ধ রচনার লিখন পদ্ধতি বর্ণনা করুন।
৪. প্রবন্ধের চারটি বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

প্রবন্ধ

দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান

ভূমিকা : দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের প্রভাব অপরিসীম। বলা যেতে পারে বিজ্ঞান আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে পুরোপুরিভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে। বিজ্ঞান ছাড়া বর্তমান দিনে এক পা ও অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়।

বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা : প্রাচীনকালে মানুষ ছিল প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল। তাদের জীবন ছিল আটপৌরে প্রাচীন ধাঁচে গড়া। দিন দিন মানুষ সভ্যতাকে জয় করল। অসীম মেধা আর জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে অধিকার করল নিত্য-নতুন কৌশল। এক সময় যা একান্তই ছিল অবাস্তব, কল্পনার অতীত, তাই পরিণত হল স্বপ্নে। লেখকরা যা বহু আগে ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন বইয়ের পাতায়, মানুষ তার বিবেক বুদ্ধি দিয়ে একদিন তা কব্জা করল অভাবনীয় সাফল্যে। এভাবে নিত্য-নতুন গবেষণা আর আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে মানুষ বিজ্ঞানকে নিয়ে এসেছে হাতের মুঠোয়। জ্ঞান ও বুদ্ধি বলে শাসন করছে বিশ্বকে। প্রয়োজনে ভৃত্যের মতো সে বিজ্ঞানকে হুকুম করছে, খাটাচ্ছে। মোট কথা, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষের যতটুকু অগ্রগতি, সাফল্য, সবই বিজ্ঞানের অবদান।

বিজ্ঞানের অবদান : দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে বিজ্ঞান মিশে আছে আঙ্গাঙ্গিভাবে। মানুষ আজ যা কিছু ভোগ করছে তার বেশিরভাগই বিজ্ঞানের উপহার। বিদ্যুৎ দিয়ে আবিষ্কার হয়েছে বিজলি বাতি। ব্যবহার হচ্ছে বৈদ্যুতিক পাখা, টিভি, রেফ্রিজারেটর, এয়ারকুলার, ওয়াশিং মেশিন, ইস্ত্রি, ওয়াটার পাম্প, ইলেকট্রিক কুকার, হিটার ইত্যাদি কত কি। টেলিফোন, ঘড়ি, গ্যাস, সেভিং মেশিন, পোশাক, খাদ্য ইত্যাদি যাবতীয় ভোগ্য পণ্য আমাদের হাতের নাগালে না থাকলে জীবন অচল হয়ে পড়ে। ঘর থেকে বের হলেই সাইকেল, মোটর গাড়ি, রেল, বিমান, লিফট, ফ্যাক্স, টেলিগ্রাম, মোবাইল ফোন, কম্পিউটার, টাইপ মেশিন, ফটোকপিয়ার, ইন্টারনেট প্রভৃতি আমূল বদলে দিয়েছে আমাদের জীবন প্রণালীকে। সংবাদপত্র নানা দেশের টাটকা খবর প্রতিদিন পৌঁছে দিচ্ছে আমাদের দোরগোড়ায়। আনন্দ ও জ্ঞানের উপকরণ নিয়ে টেলিভিশন এসেছে সবার গৃহকোণে। বিশ্বের অপর প্রান্তের খবর মুহূর্তেই ভেসে আসছে টেলিভিশনের পর্দায়। সেলুলার টেলিফোন যোগাযোগের ক্ষেত্রে ঘটিয়েছে বিস্ময়কর বিপ্লব। অপরদিকে বইপত্র আমাদের জ্ঞানের পরিধিই কেবল বাড়ায়নি, বিনোদনের খোরাকও জোগাচ্ছে প্রচুর। এছাড়া, নানারকম দুরারোগ্য রোগের চিকিৎসা সম্ভবপর হয়েছে বিজ্ঞানের কল্যাণে। আবিষ্কার হয়েছে নতুন নতুন ওষুধ আর যন্ত্রপাতি। এর ফলে বহু রোগ-যন্ত্রণা আর দুঃখ-বেদনা থেকে নিরাময় পেয়েছে রোগীরা। উপশম হয়েছে চরম যন্ত্রণাময় অভিশপ্ত জীবনের।

বিজ্ঞানের প্রভাব : বিশ্বময় মানুষ আজ জ্ঞানচর্চা আর বিদ্যার্জনের নেশায় মেতে উঠেছে। আমাদের আরাম-আয়েশ আর প্রয়োজনের জন্য যা যা দরকার সবই করেছে বিজ্ঞান। চাষাবাদ থেকে শুরু করে শিল্প, কল-কারখানা, খাদ্য, প্রসাধন, ভোগ্য পণ্য সবই আমরা গ্রহণ করেছি বিজ্ঞান থেকে। বিজ্ঞান মানুষের মন থেকে হটিয়ে দিয়েছে অন্ধ কুসংস্কার। তৈরি করেছে মুক্ত চিন্তার আলোকিত মানুষ।

উপসংহার : আমাদের প্রতিদিনের কর্মে, চিন্তায়, বিশ্বাসে যতই আমরা বিজ্ঞানকে আঁকড়ে ধরতে পারব, ততই আমরা এগিয়ে যাব সামনের দিকে। বিজ্ঞানই কেবল আমাদের পর্বত-পরিমাণ অজ্ঞতা দূর করে অগ্রসর জীবনের দিকে এগিয়ে দিতে পারে।

ছাত্রজীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য

ভূমিকা : অধ্যয়নই ছাত্রজীবনের তপস্যা। এই তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করতে হলে গভীর সাধনার প্রয়োজন। ছাত্রজীবন হল কর্মজীবনের প্রস্তুতিকাল। ভবিষ্যৎ জীবনের সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করে ছাত্রজীবনের প্রস্তুতির উপর। এই সময় যে যেমন বীজ বপন করবে সে তেমনি ফল ভোগ করবে। যে কারণে এই সময়টা হেলাফেলায় নষ্ট না করে ছাত্রজীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেষ্ট হওয়া উচিত।

ছাত্রজীবনের কর্তব্য : ছাত্রসমাজ দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার। যোগ্যতর নাগরিক হিসেবে তারা ভবিষ্যতে দেশ ও জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করবে। জাতীয় জীবনের সবক্ষেত্রে পালন করবে নেতৃত্বের ভূমিকা। ছাত্রসমাজের অন্যতম

কর্তব্য হল শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত স্বচ্ছল সমৃদ্ধ একটি নির্মল সমাজ গঠন করা। ছেলেবেলা থেকে এই দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তুতি নিতে হবে। এ জন্য তাদের হতে হবে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে উন্নত, অটুট স্বাস্থ্য ও নির্ভীক সাহসের অধিকারী। আদর্শ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে হলে পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও, আত্মোন্নয়ন ও গঠনমূলক পুস্তকাদি নিয়মিত পাঠ করা দরকার। একজন ছাত্রকে অবশ্য স্বাবলম্বী, ন্যায় পরায়ণ, পিতামাতার আজ্ঞাবহ, সেবাপরায়ণ ও ধৈর্যগুণের অধিকারী হতে হবে।

ভবিষ্যৎ-পদক্ষেপ : বর্তমান সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে হারে দুর্নীতি, অবক্ষয়, সন্ত্রাস, রাহাজানি আর মানবিক মূল্যবোধের পতন ঘটেছে তা মোকাবেলার জন্য আমাদের তরুণ ছাত্র সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। ইদানীং ছাত্রদের ভেতর নকল করার যে প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে তা প্রতিরোধের মাধ্যমে সমূলে ধ্বংস করতে না পারলে তরুণ প্রজন্মের মানসিক পতন অনিবার্য হয়ে উঠবে।

উপসংহার : ছাত্রজীবন হল জীবন গড়ার সময়। আত্মোন্নতির পাশাপাশি সমাজ ও দেশের কল্যাণ সাধনই তার প্রধান ব্রত হওয়া উচিত। একজন ছাত্র এই লক্ষ্য নিয়ে স্বীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করলে সাফল্যের গৌরব মুকুট তার আয়ত্তে আসবে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা

ভূমিকা : শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। আগামী দিনের নাগরিক। এই শিশুদের উন্নতি ও সমৃদ্ধির ওপর জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল। অথচ আমাদের শিশুদের বড় একটি অংশ শিক্ষা-দীক্ষা থেকে বঞ্চিত। আজকের শিশুরা যদি যথার্থ শিক্ষা না পায় তা সমাজের জন্য এক কালো অধ্যায় ডেকে আনবে। আগামীতে নিরক্ষরতার কবলে নিমজ্জিত হবে গোটা দেশ। তাই কোনো শিশু যাতে দারিদ্র্য বা অন্য পারিপার্শ্বিক সমস্যার কারণে স্কুল থেকে নাম প্রত্যাহার করে না নিতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে কঠোরভাবে। একটা কথা মনে রাখা দরকার, নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে গেলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা একান্তই অপরিহার্য।

কর্মসূচি গ্রহণ : বর্তমানে দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় ৪১ হাজার। এই সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প হলেও নেহায়েত কম নয়। কেবল স্কুলের সংখ্যা বাড়লেই যে শিক্ষার হার বাড়বে এমন কথা নেই। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপযোগী প্রায় ৩০ ভাগ ছেলেমেয়ে কোনো স্কুলে যায় না। যারাও বা কোনোভাবে নামটা স্কুলে টিকিয়ে রেখেছে তাদের একটি বড় অংশ তৃতীয় শ্রেণীতে ওঠার আগেই কেটে পড়ে। যে ৭০ ভাগ ছেলেমেয়ে স্কুলে ভর্তি হয় তাদের সংখ্যা ৯০ লক্ষ। এদের মধ্যে ২২ লক্ষ শিশু বিভিন্ন শ্রেণী থেকে লেখাপড়া গুটিয়ে চলে যায় স্কুল ছেড়ে। বলতে গেলে এদের পুরোটা প্রায় নিরক্ষর থেকে যায়। ফলে এরা জাতির জন্য সম্পদ না হয়ে বোঝা হয়ে চেপে বসছে সমাজের বুকে। এজন্য ছেলেমেয়েরা যাতে স্কুলে যায় সে ব্যাপারে বাবা মাকে সচেতন করতে হবে। উপরন্তু খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচি জোরদার করার পাশাপাশি শিক্ষা সামগ্রী বিনামূল্যে সরবরাহের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। এ লক্ষে লেখাপড়ার পাশাপাশি উপার্জনের ব্যবস্থা পাকাপাকি করার জন্য অবৈতনিক নৈশ স্কুল চালু করা দরকার।

পাঠ পরিকল্পনা : বর্তমান সময়ের নিরিখে প্রাথমিক শিক্ষা পদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। গাদা-গাদা বই কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের মাথায় না চাপিয়ে পাঠ্য তালিকা এমন মনোগ্রাহী করে উপস্থাপন করা উচিত যা তাদের আগ্রহী করে তোলে। এ ব্যাপারে প্রয়োজন হলে পাঠ্যপুস্তক আকর্ষণীয় কাগজে সুশোভনভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে। এছাড়া, শিক্ষকদের পাঠ পদ্ধতি আরো অত্যাধুনিক ও আন্তরিকতাপূর্ণ হওয়া বাঞ্চনীয়।

উপসংহার : প্রাথমিক শিক্ষা হল দেশের আসল ভিত্তি। দেশের জন্য এর চেয়ে বড় বিনিয়োগ আর নেই। আমাদের শিশুরা ভবিষ্যতে যাতে নিরক্ষর জনগোষ্ঠীতে পরিণত না হয় এ ব্যাপারে সজাগ হতে হবে সবাইকে। সরকার শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

অধ্যবসায়

ভূমিকা : বিশেষ কোনো ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের জন্য নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার নামই অধ্যবসায়। অধ্যবসায় হল সাফল্য লাভের গোপন চাবিকাঠি। প্রতিটি অর্জনের জন্য চাই ক্লান্তিহীন পরিশ্রম আর সাধনা। অধ্যবসায় ব্যতীত সাফল্য লাভের কোনো সংক্ষিপ্ত পথ নেই। পৃথিবীর ইতিহাসে যাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা তারা সবাই ছিলেন অসাধারণ অধ্যবসায়ী। একমাত্র অধ্যবসায়ী ব্যক্তিরাই জীবনের সবক্ষেত্রে সফল হয়েছেন, ছিনিয়ে নিয়েছেন গৌরবময় বিজয়ের মুকুট আরোহণ করেছেন খ্যাতি আর সুনামের উচ্চ শিখরে।

অধ্যবসায়ের গুরুত্ব : জীবনের সবক্ষেত্রে রয়েছে অধ্যবসায়ের প্রয়োজনীয়তা। মানবজীবনে বাধা বিপত্তি অপরিহার্য। এই বাধাকে অতিক্রমের জন্য চাই অসীম মনোবল। চাই একাগ্র নিষ্ঠা। ব্যর্থতাটা মনে করতে হবে সাফল্যের প্রথম সোপান। ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে 'Failure is :he pillar of success' সংসারে বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করার শক্তি যার বেশি, সাফল্যও তার তত বেশি। পরিশ্রমী, সংগ্রামী ও দৃঢ় চিত্তের ব্যক্তিরাই জীবন যুদ্ধে জয়লাভ করে থাকে। এই সংসারে যত মহাকীর্তির স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার মূলে আছে মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রম আর অধ্যবসায়।

প্রতিভা ও অধ্যবসায় : অনেকের ধারণা প্রতিভা ব্যতীত কোনো সাফল্য লাভই সম্ভব নয়। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। বহু বিখ্যাত লোক জীবনের প্রথম ধাপে প্রতিভাবান ছিলেন না। ভলতেয়ার বলেছেন, 'প্রতিভা বলে কিছু নেই। পরিশ্রম আর সাধনা করে যাও তাহলে প্রতিভাকে অগ্রাহ্য করতে পারবে।' নিউটনও প্রতিভার চেয়ে অধ্যবসায়কে বড় করে দেখেছেন। অতএব প্রতিভা নয় অধ্যবসায়ই হল জীবনে সাফল্য লাভের মূল মন্ত্র। বার বার ব্যর্থ হবার পর স্কটল্যাণ্ডের রাজা রবার্ট ব্রুস যেভাবে বিজয় অর্জন করেন আজও তা একটি বড় দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। নেপোলিয়নও তাঁর ভাগ্যের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন অধ্যবসায়ের গুণে।

উপসংহার : ছাত্রজীবন থেকে অধ্যবসায়ের দুর্মর আকাঙ্খা মনে লালন করা দরকার। পরিশ্রম আর অধ্যবসায় ছাড়া পরীক্ষায় যেমন ভাল ফলাফল অর্জন সম্ভব নয়, তেমনি সফল পূর্ণাঙ্গ মানুষ হওয়াও বেশ কঠিন। তাই একবার বিফল হলে চলবে না। সকল ব্যর্থতাকে ভুলে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে নব উদ্যমে। কবি তাই বলেছেন-

"একবার না পারিলে দেখ শতবার
সকলে পারিবে যাহা তুমিও পারিবে তাহা
পারিবে না একথাটি বলিও না আর।"

শ্রমের মর্যাদা

ভূমিকা : পরিশ্রমই সাফল্যের চাবিকাঠি। পরিশ্রম ব্যতীত কোনো কিছু লাভ করা যায় না। কর্মই মানুষের চালিকা শক্তি। অফুরন্ত কর্মপ্রেরণায় উদ্দীপ্ত হলে মানুষকে তার ভাগ্য গড়ে নিতে হয়। কারণ জীবন ফুলশয্যা নয়। জীবন মানেই সংগ্রাম। এ সংগ্রাম কর্মপ্রতিষ্ঠার, প্রতিপত্তির। কাজেই জীবনে উন্নতি করতে হলে কঠোর পরিশ্রম অপরিহার্য। একজন মনীষী বলেছেন, 'ক্ষণস্থায়ী জীবনটাকে পরিশ্রম দ্বারা যত বেশি পারা যায় কাজে লাগাও।'

শ্রমের মূল্য : ব্যক্তি ও মুষ্টিগত সকল উন্নতির মূলে রয়েছে শ্রম ও অধ্যবসায়। যে জাতি যত পরিশ্রমী সে জাতি তত উন্নত। কার্লাইল শারীরিক পরিশ্রমকে পবিত্র বলে অভিহিত করেছেন। পাশ্চাত্যে যে কোনো শ্রমকে বিশেষ সম্মানের চোখে দেখা হয়। জগতে যে সব মনীষী মহাপুরুষ কর্মের মাধ্যমে দেশ ও জাতির উন্নতি সাধন করেছেন তারা সবাই ছিলেন পরিশ্রমী। পৃথিবীতে যে সব অমর কীর্তি স্থাপিত হয়েছে তার পেছনে রয়েছে মানুষের গভীর শ্রম ও অধ্যবসায়।

শ্রমের মর্যাদা : শ্রম হল মানুষের গৌরব ও মর্যাদার বস্তু। পাশ্চাত্যে শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা পেলেও আমাদের দেশে এ সম্পর্কে রয়েছে প্রচুর ভ্রান্ত ধারণা। গরিব দেশের মানুষ হয়েও কায়িক পরিশ্রমকে এদেশে অত্যন্ত হেয় চোখে দেখা হয়।

অথচ দেশে বেকার সমস্যা প্রচণ্ড আকার ধারণ করেছে। দৈহিক সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বহু লোক কর্মহীন বসে আছে হাত পা গুটিয়ে। শ্রমের প্রতি এদেশের মানুষের এরকম নৈতিক মনোভাব অবশ্যই পাল্টাতে হবে। প্রতিটি নর-নারীর হাতকে পরিণত করতে হবে কর্মীর হাতিয়ার হিসেবে। কেননা হাতে কাজ করা অগৌরবের নয়, অগৌরব হয় মিথ্যা, মূর্খতা, নীচতায়। কারো শ্রমের মর্যাদা কম নয়। শ্রমকে গৌরবময় করতে হলে শ্রমিককে মর্যাদা দিতে হবে সবার আগে।

শ্রমের মূল্যায়ন : পরিশ্রম ছাড়া নিজের ভাগ্য পরিবর্তন করা যায় না। কর্মহীন মানুষ সমাজ ও দেশের জন্য বোঝার সামিল। বিশ্বের বহু দেশ ধ্বংসাবস্থা থেকে শুধু পরিশ্রম করে নিজেদের ভাগ্য ফিরিয়ে নিয়েছে। অন্যান্য জাতির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আমাদেরও কায়িক শ্রমের মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠত করতে হবে।

উপসংহার : ঠুনকো আভিজাত্য আর মিথ্যা অহংকারে ডুবে না থেকে পরিশ্রমকে যত দ্রুত আমাদের কর্মে, চিন্তায় ও বিশ্বাসে মর্যাদার বস্তুতে পরিণত করা যায় ততই মঙ্গল।

পরিবেশ দূষণ

ভূমিকা : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে মানুষের অগ্রযাত্রা সমাজের জন্য যেমন মঙ্গল বয়ে এনেছে অপরদিকে তা মানুষের অস্তিত্বের ক্ষেত্রে চরম হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাটি, পানি ও বায়ুর ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে গিয়ে মানুষ যে ধ্বংস ডেকে আনছে প্রকৃতি তার প্রতিশোধ নিচ্ছে নিষ্ঠুর হাতে। বিশ্ব পরিবেশ বিষাক্ত হবার কারণে গোটা জীব-জগতের অস্তিত্বই আজ বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

পরিবেশ দূষণের কারণ : জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে প্রকৃতির ওপর মানুষের চাপ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। বন কেটে বসত করতে গিয়ে বনজ সম্পদ আজ উজাড় হবার পথে। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে উদ্ভিদ আর প্রাণিজগত। মানুষের নিক্ষিপ্ত আবর্জনা ও অপব্যবহারের ফলে পানি দূষণ ঘটেছে ব্যাপক হারে। এছাড়া, শক্তি উৎপাদনের সাথে নির্গত হয় মানুষের স্বাস্থ্য ও পরিবেশ দূষণের নানা উপকরণ। একইভাবে সীসা, পারদ, সালফার ডাই অক্সাইড, কার্বন ডাই অক্সাইড থেকে ঘটছে মারাত্মক বায়ু দূষণ। গাড়ি থেকে নির্গত পেট্রোল আর গ্যাসের কালো ধোঁয়া, শব্দ এই দূষণের মাত্রাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। এর হাত থেকে সহজে নিস্তার নেই। মাথা ধরা, শ্বাস কষ্ট, হাঁপানি, ব্রংকাইটিস, ফুসফুস ক্যান্সারসহ নানা জটিল রোগ এ জাতীয় দূষণের অন্যতম কারণ।

কৃত্রিম ও পারিপার্শ্বিক দূষণ : কৃত্রিম দূষণ যেমন- কীটনাশক, সার, গুঁড়ো সাবান, প্রসাধন সামগ্রি ও প্লাস্টিকের উপকরণাদিসহ কলকারখানার বর্জ্য পরিবেশকে নরক করে তুলেছে। এছাড়া, নিত্যদিন মানুষের নিক্ষিপ্ত ময়লা-আবর্জনা এই সংকটকে আরো উসকে দিয়েছে। ময়লা-আবর্জনা থেকে সৃষ্ট দূষণের ফলে শ্বাসতন্ত্রের সংক্রামক, হাঁপানি, কাশি ও ক্যান্সারের মতো জটিল রোগ তৈরি হতে পারে। অপরদিকে দূষিত পানি-বাহিত রোগ যেমন জণ্ডিস, ডায়রিয়া, রক্ত আমাশয়, কলেরা ও কৃমিজাত রোগের বিস্তার ঘটছে আশংকাজনক হারে।

পরিবেশ দূষণের প্রভাব : এটম বোমা নিক্ষেপে হিরোশিমা নাগাশাকিতে যে চরম বিপর্যয় ডেকে এনেছিল তার মাশুল এখনও গুনে চলেছে সেখানের মানুষ। একইভাবে ভূপাল ও চেরানোবিলে যে মারাত্মক তেজোস্ক্রিয় দূষণ ঘটেছিল তাতে ব্যাপক প্রাণহানি শুধু ঘটেনি, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও হয়েছিল ব্যাপকভাবে। ভিয়েতনামে নিক্ষিপ্ত নাপাম বোমার প্রতিক্রিয়ায় এখনও জন্ম নিচ্ছে বহু বিকলাঙ্গ শিশু। এছাড়া, পারমাণবিক যুদ্ধ ও অস্ত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে এই বিশ্ব ক্রমাগত মানুষের বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠেছে।

শব্দ দূষণ : আমাদের দেশে শব্দ দূষণের ঘটনাটি নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। যানবাহনের বিকট শব্দ, কলকারখানার যান্ত্রিক আওয়াজ, মাইকের চিৎকার প্রভৃতি সহনশীলতার মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। শব্দ দূষণের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। এর ফলে মানসিক বিপর্যয়, রক্তচাপ, স্নায়ুর অস্থিরতা দেখা দিতে পারে।

উপসংহার : পরিবেশ দূষণের ফলে বিশ্ব আজ আতঙ্কগ্রস্ত। এই পৃথিবীকে বাসযোগ্য রাখতে হলে প্রকৃতি ও প্রাণিজগৎকে ধ্বংসের হাত থেকে নিরাপদ রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। এ লক্ষ্য সামনে রেখে প্রতিবছর ৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হচ্ছে। আমাদের সামগ্রিক চেষ্টায় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ পৃথিবী গড়ে তুলতে হবে।

পিতামাতার প্রতি কর্তব্য

ভূমিকা : সন্তানের কাছে পিতামাতার স্থান অনেক উঁচুতে। সংস্কৃতিতে বহুল প্রচলিত একটা উক্তি আছে- 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।' হাদিস শরীফে বলা হয়েছে - 'জননীর পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত'। পৃথিবীর সব ধর্মে বা নীতি শাস্ত্রে পিতামাতার স্তুতি ও মহত্ত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। মাতাপিতার তুল্য গুরুজন আর কেউ নেই। তাদের সন্তুষ্টি বিধান করা প্রত্যেকের অবশ্য কর্তব্য।

পিতামাতার স্থান : সন্তানের কাছে স্রষ্টার পরেই পিতামাতার আসন। মা অতি কষ্টে দশ মাস সন্তানকে নিজ গর্ভে ধারণ করেন। ভূমিষ্ঠ হবার পরও মায়ের কোলই হয়ে ওঠে সন্তানের বড় আশ্রয়স্থল। শত বিপদে-আপদেও বাবা-মা অতি যত্নে সন্তানকে লালন-পালন করেন। রোগে, শোকে, বিপদে আগলে রাখেন প্রিয় সন্তানকে। তাদের থাকা-খাওয়া, লেখাপড়া, পোশাক, চিকিৎসা ইত্যাদি সব দায়িত্বই মাথায় তুলে নেন বাবা-মা। সন্তানের মঙ্গল কামনায় অনেকেই জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছেন। সম্রাট বাবর পুত্র হুমায়ুনের জীবন রক্ষার জন্য নিজ জীবন উৎসর্গের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা বর্তমান যুগে খুবই বিরল ঘটনা। এমন পিতামাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না।

পিতামাতার প্রতি কর্তব্য : সন্তান যতই বড় হোক না কেন পিতামাতার কাছে সে ছেলেবেলার ছোট্ট সন্তান মাত্র। বৃদ্ধ বয়সে বাবা-মা যখন অসুস্থ কিংবা অচল হয়ে পড়েন তখন সন্তানের উচিত বাবা-মার যথার্থ যত্ন ও সেবা করা। পৃথিবীর ইতিহাসে যাঁরা দুনিয়াজোড়া খ্যাতি পেয়েছেন তারা সবাই পিতামাতার ভক্ত ছিলেন। হাজী মোহাম্মদ মহসিন, জর্জ ওয়াশিংটন, আব্দুল কাদের জিলানি, আলেকজাণ্ডার ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মাতৃভক্তির নমুনা আজও চির অমলিন হয়ে আছে।

উপসংহার : পিতামাতার প্রতি আনুগত্য সন্তানের চরিত্রকে মহীয়ান করে তোলে। যে পিতামাতার কারণে সন্তান পৃথিবীর রূপ, রস, সৌন্দর্য উপভোগ করছে, তার চেয়ে আপনজন আর কেউ হতে পারে না। যে কারণে একজন আদর্শ সন্তান হিসেবে পিতামাতার আদেশ-নির্দেশ পালন করা একান্ত কর্তব্য। এছাড়া, তাঁদের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের পাশাপাশি কটু ও কর্কশ ব্যবহার পরিহার করা উচিত। আজকের সন্তান ভবিষ্যতে একদিন পিতা-মাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন - এই সত্যটি সবসময় মনে রাখা দরকার।

সংবাদপত্র

ভূমিকা : বর্তমান যুগে সংবাদপত্র জীবনের এক অপরিহার্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সভ্যতার আর দশটা উপাদানের মতো সংবাদপত্রও জীবনের বড় এক অবলম্বন। দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় এর গুরুত্ব অপরিসীম। সংবাদপত্র হল সারা বিশ্বের দর্পণ স্বরূপ। বিশাল পৃথিবীকে আমাদের হাতের মুঠোয় তুলে ধরার দায়িত্ব নিয়েছে সংবাদপত্র।

সংবাদপত্রের উৎপত্তি : সর্বপ্রথম ভেনাসে সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছিল বলে জানা যায়। একাদশ শতাব্দীতে চীনেও এক ধরনের সংবাদপত্র মুদ্রিত হত। খ্রিস্টান মিশনারিরা, বাংলা ভাষায় যে পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশ করেন তার নাম সমাচার দর্পণ। এদেশে সবচেয়ে পুরানো দৈনিকের নাম আজাদ। বর্তমানে দেশে সংবাদপত্রের সংখ্যা অনেক। রাজধানী ছাড়াও বিভিন্ন মফস্বল শহর থেকেও এখন নিয়মিত পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

সংবাদপত্র পাঠের প্রয়োজনীয়তা : সংবাদপত্রে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর সংবাদ, প্রতিবেদন, মন্তব্য ও নিবন্ধাদি প্রকাশিত হয় বলেই বিচিত্র স্বাদ লাভ করা যায়। এতে জ্ঞান আহরণের পথ প্রশস্ত হয়। আগে বিশ্ব পরিভ্রমণ করে মানুষ যে জ্ঞান সঞ্চয় করত আজ অনায়াসে ঘরে বসেই তা চলে আসছে হাতের মুঠোয়। রাজনীতি, খেলাধুলা, সিনেমা, থিয়েটার, টেলিভিশন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, বাজারদর ও শেয়ার মার্কেট ছাড়াও নানা ধরনের দেশী-বিদেশী খবরে ঠাসা থাকে বলেই সব শ্রেণীর পাঠকেরা কৌতূহল নিবৃত্তি করে থাকে।

সংবাদপত্রের প্রভাব : দেশ-বিদেশের সংবাদ সংস্থা থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়। এছাড়া, নিজস্ব উদ্যোগেও স্থানীয়ভাবে সংবাদাদি সংগ্রহের ব্যবস্থা আছে। জাতীয় জীবনে এইসব সংবাদের প্রভাব অসীম। প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার আছে সংবাদপত্রের মাধ্যমে তার মতামত প্রকাশ করা। সমাজ সংস্কার, সমাজ সেবা ও জনমত গঠনে সংবাদ-পত্রের ভূমিকা সুদূরপ্রসারী। সরকারের সঙ্গে জনগণের সংযোগ সাধন করে সংবাদপত্র। অনেক সময় পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের

জন্যে বিতর্কিত হয়ে ওঠে সংবাদপত্রের ভূমিকা। এই ধরনের প্রবণতা হলুদ সাংবাদিকতার নামান্তর। দেশ ও জাতির পক্ষে এটা বিপজ্জনকও বটে।

উপসংহার : সংবাদপত্র জনগণের সেবক। বিভিন্ন মত ও রুচির জনমত গঠনের জন্য এর গুরুত্ব অসীম। যে কোনো সভ্য দেশে সংবাদপত্র আলোকবর্তিকা স্বরূপ। এর মাধ্যমে জনগণ সঠিক পথে চলার নির্দেশ খুঁজে পেতে পারে।

সময়ের মূল্য

ভূমিকা : সময়কে স্রোতের সঙ্গে তুলনা করা হয়। কেননা সময় ও স্রোত কারো জন্য অপেক্ষা করে না। জীবনে সময়ের মূল্য অনেক। যারা সময়কে যথাযথভাবে সদ্ব্যবহার করতে পারে তাদের জীবন পরিপূর্ণ ও সফল হয়ে ওঠে। এজন্য বলা হয় : 'Time is gold. You utilise :ime, it will give you gold.'

সময়ের মূল্য : মানব জীবন ক্ষণস্থায়ী কিন্তু তার গৌরব চিরস্থায়ী। জীবন থেকে কুড়িয়ে পাওয়া এই মূল্যবান সময়টুকু আমরা যেন হেলায় নষ্ট না করি। এ ব্যাপারে ছেলেবেলা থেকেই সজাগ হওয়া দরকার। ভবিষ্যতের জন্য কোনো কাজ তুলে না রেখে প্রতিদিনের কাজ রুটিন মাফিক শেষ করতে হবে। কিন্তু অনেকেই সময় সচেতন নয় বলেই সময়ের যথাযথ ব্যবহার জানে না। অনেক মূল্যবান সময় অকারণে হেসে খেলে উড়িয়ে দেয়। অথচ পাশ্চাত্যের জনগণ সময় সম্পর্কে অধিকতর সচেতন বলেই ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে অভাবনীয় সাফল্যের অধিকারী হতে পেরেছে।

সময়ের সদ্ব্যবহার : মানুষের জীবন অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সময়ের সমষ্টি। এই সংক্ষিপ্ত জীবনে একজন মানুষকে অনেক কাজ করতে হয়। সমাজের বুকে নিজেকে প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি দেশ ও দশের জন্য কিছু করাই একজন মানুষের বড় স্বপ্ন। কিন্তু এই কাজগুলো সময় মতো না করতে পারলে জীবন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। অনেক সাধারণ মানুষ সময়ের সদ্ব্যবহার করে জীবনে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। আবার অনেক প্রতিভাবানও হেলাফেলায় সময়কে নষ্ট করে জীবনে ব্যর্থ হয়েছেন। তাই সময় ফুরোবার আগে সময়ের যথাযথ ব্যবহার করা উচিত।

সময় সচেতনতা : আমাদের দেশের লোকজন কর্তব্যকর্মে যেমন উদাসীন সময়ের সদ্ব্যবহারের ক্ষেত্রেও তদ্রূপ। জীবনের প্রতি পদে তারা ঢিলেঢালা ভাবে চলতে অভ্যস্ত। সময়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে এগিয়ে যাওয়ার মানসিকতা একেবারেই নেই। এই সময় সচেতনতার অভাবে ব্যক্তির যেমন উন্নতি ঘটছে না, দেশও তেমনি বঞ্চিত হচ্ছে তাদের প্রকৃত সেবা থেকে। আসলে সময়কে ফাঁকি দেবার অর্থই হল নিজেকে ফাঁকি দেয়া। অনেক ক্ষতির মধ্য দিয়ে এর মাশুল আমাদের গুনতে হচ্ছে কড়ায়গণ্ডায়।

উপসংহার : জীবন সংগ্রামে যাঁরা সফল হয়েছেন তাঁরা সবাই ছিলেন সময় সচেতন। মনীষীদের জীবন পাঠ করলে এই সত্য সহজে অনুধাবন করতে পারি। সময়ের মূল্য দিয়েই তাঁরা জীবনকে প্রাচুর্যময় করেছেন। অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন ভবিষ্যতের মানুষের জন্য। আমরাও যেন সময়ের হাত ধরে সেই আলোর পথের দিশারী হতে পারি সেই লক্ষে এগিয়ে যেতে হবে।

বইমেলা

ভূমিকা : বইয়ের মতো বড় বন্ধু আর নেই। বই কিনে কেউ কখনও দেউলে হয় না। অথচ বই কেনার রেওয়াজ আজও আমাদের এখানে তেমনভাবে চালু হয়নি। এর পেছনে কারণও আছে যথেষ্ট। ছাত্রজীবনে বইয়ের সঙ্গে যে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে পরবর্তী কালে কর্মজীবনে এসে তা অনেকটা আলগা হয়ে যায়। বলতে গেলে এভাবে অলক্ষ্যেই একজন পাঠকের মৃত্যু ঘটে। বইয়ের সঙ্গে পাঠকের এই যোগাযোগহীনতার কারণে পাঠকের মেধা ও মননের বিকাশ ঘটে না। বই মানুষের চেতনা ও শক্তিকে জাগ্রত করে, আলোকিত করে- বই মেলা পাঠকের নাগালের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ের নতুন নতুন বই পৌঁছে দিয়ে জ্ঞানের প্রবাহকে সচল রাখে।

বই মেলার সূচনা : ১৪৬২ খ্রিস্টাব্দে বই মেলার সূচনা হয় জার্মানির ফ্রাংকফুর্টে। লিপজিগ হচ্ছে বই মেলার প্রাচীনতম স্থান। ফ্রাংকফুর্টে বসে বিশ্বের সবচেয়ে বড় বইমেলা। বিশ্বের অন্যান্য বড় শহরে এখন নিয়মিতভাবে বই মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। স্বাধীনতার পর গ্রন্থবর্ষ উপলক্ষে প্রথম ঢাকায় বই মেলা আয়োজন করা হয়। প্রতিবছর বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে

একুশের বই মেলা বসছে। ঢাকা বই মেলার উদ্যোক্তা জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র। এছাড়া প্রকাশনা সংস্থাসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে দেশের আনাচে কানাচে বইমেলা আয়োজন অনেকটা রেওয়াজে পরিণত হয়েছে।

বই মেলার আয়োজন : বড় ধরনের বই মেলার জন্য খোলা ময়দানই উপযুক্ত জায়গা। এখানে প্যাভিলিয়ন, স্টল, রেস্তোরাঁ, শিশু কর্নার, লেখককুঞ্জ, সেমিনারসহ আনুষাঙ্গিক সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু ছোট পরিসরের মেলাগুলো বেশিরভাগই হয়ে থাকে অভ্যন্তরীণ পরিবেশে। প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের নতুন বইয়ের সম্ভার নিয়ে স্টল খোলে বই মেলায়। এক একটি প্রতিষ্ঠানের প্রবণতা থাকে বিশেষ ধরনের বই প্রকাশের। ফলে ক্রেতারা তাদের অভিরুচি ও প্রয়োজন অনুযায়ী বই কিনতে পারেন।

বইমেলা ও পাঠক : বইমেলার মাধ্যমে সরাসরি যোগাযোগ হয় বলে প্রকাশক ও ক্রেতার মধ্যে একটা যোগসুত্র তৈরি হয়। বইমেলা হয়ে ওঠে লেখক, প্রকাশক, শিল্পী ও পাঠকের মিলন-মেলা। পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা ও মত বিনিময়ের ফলে তাদের ভেতর সৌহার্দ্য সম্প্রীতি গড়ে ওঠে। মেলায় ঘুরে ঘুরে বই কেনা, আড্ডা, বিতর্ক, আলোচনা, গান-বাজনা, আবৃত্তি - সব মিলিয়ে একটা আনন্দময় পরিবেশ তৈরি হয়। অনেক সময় টিকেট কেটে মেলায় প্রবেশ করতে হয় বলে অবাঞ্ছিত লোকদের ভিড় কম থাকে। তাছাড়া মেলায় বিশেষ কমিশনে বই বিক্রি হয় বলে পাঠক নতুন বই কিনতে আগ্রহ বোধ করেন।

উপসংহার : বই মেলার বড় বৈশিষ্ট্য হল পাঠক মেলায় এসে হরেক রকম নতুন বই দেখার সুযোগ পান। এর ফলে তাদের পাঠ স্পৃহার পাশাপাশি জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখায় কৌতূহল বৃদ্ধি পায়। এভাবে সাধারণ জনগণকে বই পাঠে উদ্বুদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে বইয়ের জগতে এক ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে বই মেলা। এর সুফল লেখক, প্রকাশক, পাঠক - সবাই সমানভাবে ভোগ করছেন।

অনুবাদ

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

১. এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় রূপান্তরিত করার পদ্ধতি বুঝতে পারবেন।

২. কোন ভাষায় অনুবাদ করলে অনুবাদের ভাষা প্রাঞ্জল ও মাধুর্যপূর্ণ হবে তার কৌশল জানতে পারবেন।

কোনো রচনা এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় রূপান্তরিত করাকে অনুবাদ বলে। বিদেশী বিভিন্ন ভাষা হতে বাংলায় অনুবাদ করা যায় এবং বাংলা থেকেও অন্য ভাষায় অনুবাদ করা সম্ভব। তাই এক কথায় অনুবাদ হল ভাষান্তর। এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় নিয়ে যাওয়া। কিন্তু এই নিয়ে যাওয়াটি সবক্ষেত্রে সহজ নয়। কোনো বিষয়কে রূপান্তরিত করতে হলে উভয় ভাষায় গঠন কৌশল, রীতি প্রভৃতি সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। প্রত্যেক ভাষারই নিজস্ব গঠনভঙ্গি, প্রকাশরীতি ও বৈশিষ্ট্য আছে। অনুবাদে সে বৈশিষ্ট্যের যথাযথ প্রতিফলন দরকার। মোট কথা, অনুবাদে মূল সুরটি কিছুতেই বিকৃত করা যাবে না। অনুবাদ হল এক ধরনের শিল্প। অনুবাদ কর্মে যদি ভাষায় মুন্সিয়ানা আর মূলের রূপ, রস, স্বাদ ও সৌন্দর্য অক্ষুণ্ন থাকে তবে অনায়াসে তা শিল্পকে ছুঁয়ে যেতে পারে।

অনুবাদ মূলত দুই প্রকার :

১. আক্ষরিক অনুবাদ

২. ভাবানুবাদ

আক্ষরিক অনুবাদ ও ভাবানুবাদের কোনো সঠিক নিয়ম নেই। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনুবাদ আক্ষরিক কিংবা ভাবানুবাদ হয় এটা নির্ভর করে অনুবাদের বিষয়ের ওপর। মোট কথা যে পদ্ধতিতে অনুবাদ করলে ভাষা মূলের কাছাকাছি, সহজ- সরল আর প্রাঞ্জল হয় সেদিকে দৃষ্টি রেখে অনুবাদ করা বাঞ্ছনীয়।

অনুবাদের লক্ষণীয় বিষয়সমূহ

১. অনুবাদের অংশটি বার বার পড়ে ভেতরের ভাবটুকু ভালভাবে বুঝে নিতে হবে।

২. মূল বাক্যে যে ক্রিয়া ও বাচ্য থাকে অনুবাদেও সেই বাচ্য ও ক্রিয়াপদ নির্দেশ করতে হবে।

৩. কঠিন ভাষা এড়িয়ে সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় অনুবাদ করা উচিত।

৪. ভাষার সৌন্দর্য রক্ষার জন্যে মূলের বড় বাক্যকে ভেঙে ছোট ছোট করে অনুবাদ করা উচিত।

৫. পরিভাষা দুর্বোধ্য হলে মূল শব্দটি ব্যবহার করা চলে।

৬. মূল অংশের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উক্তি অনুবাদের ক্ষেত্রেও একইভাবে রূপান্তরিত হবে।

৭. মূল রচনার ভাষা রীতি অনুবাদেও প্রতিফলিত হওয়া দরকার।

৮. ইংরেজি নামগুলো ইংরেজি নামরূপেই অনুবাদ করতে হবে।

৯. অনুবাদ কালে কোনো বাক্যের ব্যাখ্যা অপ্রয়োজনীয়। ভাষার চেয়ে ভাবের দিকে লক্ষ্য রাখা জরুরি।

১০.অনুবাদ এক ধরনের শিল্প। এর ভাব ও ভাষায় সামঞ্জস্য থাকতে হবে।

অনুবাদের দৃষ্টান্ত

১. Nizam-ul-Mulk was very fond of reading. He owned a great number of books and from these books he continually increased his knowledge of the world. He said to himself, If the young peoples of my country learned to read, they would learn how to live a good life. this would bring happiness to them and to their friends

অনুবাদ : নিযাম-উল-মূলক পড়াশোনা খুব পছন্দ করতেন। তাঁর প্রচুর বই ছিল। এসব বই থেকে তিনি ক্রমাগত বিশ্বের জ্ঞান বৃদ্ধি করতেন। তিনি নিজে বলতেন, 'যদি আমার দেশের তরুণ পড়তে শিখত, তাহলে ভাল জীবন যাপন সম্পর্কে শিখতে পারত। এতে তাদের নিজের ও বন্ধুদের জীবনে সুখ আনতে পারত।

২. He who loves his country is a patriot. the patriots love their own country more than their own life. they are ready to sacrifice their lives for the welfare of the country. Everyone respects them. they remain alive even after their death.

অনুবাদ : যে দেশকে ভালবাসে সে দেশপ্রেমিক। দেশপ্রেমিকেরা নিজের জীবনের চেয়ে নিজের দেশকে ভালবাসে। তাঁরা দেশের মঙ্গলের জন্যে জীবন দিতে প্রস্তুত। তাদের সবাই সম্মান করে। মৃত্যুর পরও তারা বেঁচে থাকে।

অনুবাদের উদাহরণ

1. Cricket is a popular game. the game has achieved popularity in Bangladesh too like the other countries of the world. Bangladesh has been trying to achieve a success in the cricket for long. We are happy that our country earns the capability to join the world cup tournament by winning the last ICC trophy.
2. Bangladesh is a land of rivers. the rivers fall into the Bay of Bengal. Many towns, ports and villages stand on both sides of these rivers. In the rainy season, these rivers assume a terrible look but in the winter they remain quite callus.
3. Students should abide by the rules of health. they will get up early in the morning. they must be industrious. Industry is at the root of all prepares. An idle man cannot make any progress in life.
4. Always speak the truth. Never tell a lie. Nobody believes a liar. Even if he speaks the truth he is considered to be a liar. Nobody in the world is unfortunate as he.

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. নৈর্বিত্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১. অনুবাদে মূলের ভাব -

ক. থাকবে খ. থাকবে না

২. অনুবাদ হবে -

ক. কঠিন খ. প্রাঞ্জল

৩. মূল বাক্যের ক্রিয়া ও বাচ্য অনুবাদে -

ক. থাকবে খ. থাকবে না

৪. মূল রচনার ভাষা-রীতি অনুবাদে প্রতিফলিত -

ক. হবে খ. হবে না

৫. মূলের বড় বাক্য অনুবাদে -

ক. বড় হওয়া উচিত খ. ছোট হওয়া উচিত

৬. অনুবাদে কোন বাক্যের ব্যাখ্যা -

ক. প্রয়োজনীয় খ. অপ্রয়োজনীয়

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

উত্তর

১. ক ২. খ ৩. ক ৪. ক ৫. ক ৬. খ

নমুনা প্রশ্ন

বিষয় : বাংলা দ্বিতীয় পত্র

রচনামূলক ৫০ + নৈর্ব্যক্তিক ৫০ = ১০০

সময় : ৩ ঘণ্টা

কোর্স কোড : SSC-2601

রচনামূলক অংশ

১। অনুবাদ করুন : ৫

Walking is best suited to all kinds of health. Both the young and the old can walk and help their body function as long as they live. On the other hand, gymnastic exercise are best suited to young people only.

অথবা

The morning of March 15 was clear and bright. the end of the 1920 winter seemed near. On a farm in the northern part of the united states, Snow was almost gone from the fields. The farmer, william Miner, felt cheerful as he finished his work and went into his house in the middle of the day.

২। মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতি কেমন হয়েছে তা জানিয়ে পিতার নিকট একটি পত্র লিখুন। ১০

অথবা

সহকারী শিক্ষকের জন্য আবেদন জানিয়ে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট দরখাস্ত রচনা করুন।

অথবা

আপনার এলাকায় পানীয় জলের অভাব মিটানোর প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়ে সংবাদপত্রে একটি পত্র লিখুন।

৩। সারাংশ লিখুন : ৫

বাল্যকাল হইতে আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই। কেবল যাহা কিছু নিতান্ত আবশ্যক, তাহাই কণ্ঠস্থ করিতেছি। তেমন করিয়া কোন মতে কাজ চলে মাত্র, কিন্তু মনের বিকাশ লাভ হয় না। হাওয়া খাইলে পেট ভরে না, আহার করিলে পেট ভরে কিন্তু আহারটি রীতিমত হজম করিবার জন্য হাওয়ার দরকার তেমনি একটি শিক্ষা পুস্তককে রীতিমত হজম করিতে অনেকগুলি অপাঠ্য পুস্তকের সাহায্য আবশ্যক। ইহাতে আনন্দের সহিত পড়িতে পারিবার শক্তি অলক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। গ্রহণ শক্তি, ধারণা শক্তি, চিন্তা শক্তি বেশ সহজে এবং স্বাভাবিক নিয়মে ফললাভ করে।

অথবা

বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু!
দেশে দেশে কত-না নগর রাজধানী
মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু।
কতনা অজানা জীবন কত-না অপরিচিত তরু
মন মোর জুড়ে থাকে অতি ক্ষুদ্র তারি এক কোণ।
সেই ক্ষোভে পড়ি গ্রন্থ ভ্রমণবৃত্তান্ত আছে যাহে
অক্ষয় উৎসাহে
যেথা পাই চিত্রময়ী বর্ণনার বাণী
কুড়াইয়া আনি।
জ্ঞানের দীনতা এই আপনার মনে
পূরণ করিয়া লই যত পারি ভিক্ষালব্ধ ধনে।

৪। ভাব-স্প্রসারণ করুন : ১০

দুর্জন বিদ্বান হলেও পরিত্যাজ্য। সর্পের মস্তকে মণি থাকলেও সে কি ভয়ঙ্কর নহে?

অথবা

আমার এঘর ভাঙ্গিয়াছে যেবা আমি বাঁধি তার ঘর,
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।

৫। যে কোন বিষয়ে একটি রচনা লিখুন : ২০

(ক) দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান;
(খ) শ্রমের মর্যাদা;
(গ) সংবাদপত্র;
(ঘ) একটি নৌকা ভ্রমণের অভিজ্ঞতা;
(ঙ) বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যা।

নৈর্বিক্তিক অংশ

(রচনামূলক খাতাতেই নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে)

নমুনা হিসেবে ৭টি নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন দেওয়া হলো।

ক. সঠিক উত্তরটি লিখুন ৫০×১=৫০

১। বর্তমানে পৃথিবীতে কত ভাষা প্রচলিত আছে?

ক. এক হাজারের বেশি খ. দুই হাজারের বেশি
গ. আড়াই হাজারের বেশি গ. পাঁচ হাজারের বেশি

২। কোনটি বাক-প্রত্যঙ্গ?

ক. হাত খ. পা
গ. মাথা ঘ. জিহ্বা

৩। 'কুড়ি' কোন শব্দ?

ক. দেশী শব্দ খ. বিদেশী শব্দ
গ. তৎসম শব্দ ঘ. তদ্ভব শব্দ

৪। কোন শব্দটি জাপানি?

ক. চা খ. লুঙ্গি
গ. রিক্সা ঘ. খদ্দর

৫। Oxygen এর পারিভাষিক শব্দ কোনটি?

ক. উদযান খ. অম্লজান
গ. বায়বীয় গ. বিমানবিদ্যা

৬। প্রত্যেক ভাষারই তিনটি মৌলিক অংশ থাকে। সেগুলো হচ্ছে -

ক. ধ্বনি, শব্দ ও ছন্দ খ. ধ্বনি, ছন্দ ও পদক্রম
গ. শব্দ, ধ্বনি ও বাগধারা ঘ. ধ্বনি, শব্দ ও বাক্য

৭। ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান প্রযোজ্য-

ক. ইংরেজি শব্দে খ. তৎসম শব্দে
গ. তদ্ভব শব্দে ঘ. দেশী শব্দে

বিষয় : বাংলা দ্বিতীয় পত্র (আবশ্যিক)

কোর্স কোড : SSC-2601

মানবন্টন

পূর্ণমান - ১০০

ক. নৈর্ব্যক্তিক - ৫০

বিশেষ দ্রষ্টব্য : নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষায় সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। বিকল্প প্রশ্ন থাকবে না।

১। ব্যাকরণ থেকে মোট ৪০টি প্রশ্ন থাকবে	৪০×১= ৪০
২। অনুবাদ থেকে মোট ৫টি প্রশ্ন থাকবে	৫×১= ৫
৩। পত্র লিখন থেকে মোট ৫টি প্রশ্ন থাকবে	৫×১= ৫
	মোট = ৫০

খ. রচনামূলক প্রশ্ন - ৫০ নম্বর

১। অনুবাদ :	৫×১= ৫
২টি ইংরেজি অনুচ্ছেদ দেওয়া থাকবে যে কোন ১টির অনুবাদ করতে হবে।	
২। পত্র লিখন :	১০×১= ১০
৩টি প্রশ্ন থাকবে। যে কোন ১টির উত্তর দিতে হবে।	
৩। সারাংশ/সারমর্ম :	৫×১= ৫
২টি সাধারণ প্রশ্ন থাকবে। যে কোন ১টির উত্তর দিতে হবে।	
৪। ভাব-সম্প্রসারণ :	১০×১= ১০
২টি অংশ দেওয়া থাকবে। যে কোন ১টির উত্তর দিতে হবে।	
৫। প্রবন্ধ রচনা :	২০×১= ২০
৫টি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনার উল্লেখ থাকবে। যে কোন ১টি বিষয়ে রচনা লিখতে হবে।	
	মোট = ৫০